প্রশিক্ষণ সহায়িকা
নতুন অভিমুখ

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্
সর্বশিক্ষা অভিযান বিভাগ
ডিরোজিও ভবন, বিধাননগর
কলকাতা ৭০০ ০৯১

প্রশিক্ষণ সহায়িকা

নতুন অভিমুখ

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্
সর্বশিক্ষা অভিযান বিভাগ
ডিরোজিও ভবন, বিধাননগর
কলকাতা ৭০০ ০৯১

প্রথম পরিমার্জিত সংস্করণ
প্রকাশ ঃ ৫ই সেপ্টেম্বর , ২০০৫

পরিমার্জিত ২য় সংস্করণ
১৫ই জানুয়ারী , ২০০৭
পুনর্মুদ্রণ - ১৫ জুলাই, ২০০৭

প্রকাশক ঃ

শ্রী স্বপনকুমার সরকার

সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদ

৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট

কোলকাতা - ৭০০ ০১৬

মুদ্রাকর ঃ

দীপ্তি প্রকাশন

৯৪ বি, ডঃ জি. এস. বোস রোড

কোলকাতা - ৭০০ ০৩৯

ঃঃ বিষয় সূচি ঃঃ

নিবেদন

২০০৫ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ পুরানো পাঠ্যক্রম পরিবর্তন করে নতুন পাঠ্যক্রম চালু করেছে এবং আগামী ২০০৭ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র (গণিত বাদে) এই পাঠ্যক্রমকে ভিত্তি করেই রচিত হবে। পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন বলতে শুধু পুরাতন কিছু রচনার বদলে নতুন কয়েকটি রচনার অন্তর্ভুক্তিকে বোঝায় না। এর সঙ্গে আরও অনেকগুলি বিষয় সম্পৃক্ত আছে।

প্রথমত, বিষয়বস্তু। অনেকদিনের পুরানো পাঠ্যক্রমের কোনো কোনো বিষয় এখন প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। অন্যদিকে নতুন নতুন আরও কিছু বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে।

দ্বিতীয়ত, শিখন- শেখানোর পদ্ধতি। সকলের জন্য শিক্ষা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী বহুমুখী সামাজিক বিন্যাস ও সামর্থ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিবিড় অংশগ্রহণমূলক শিখন-পদ্ধতির অনুসরণ একান্ত আবশ্যিক হয়ে উঠেছে। শিখন- শেখানোর এই ব্যতিহারী (reciprocal) পদ্ধতিতে শিক্ষক-শিক্ষিকারাই প্রকৃতপক্ষে নেতৃত্ব দিতে পারেন। এই কাজের জন্য তাঁদের ব্যাপক আত্মপ্রস্তুতি প্রয়োজন। পাঠ্যক্রমের পরিবর্তনের সঙ্গে এই বিষয়টি সমান জরুরি। সেই চাহিদা পূরণের জন্য মাধ্যমিকের সমস্ত আবশ্যিক বিষয়গুলির নির্দেশিকা প্রকাশিত হয়েছে। সেই নির্দেশিকা অনুযায়ী রাজ্যব্যাপী নিবিড় অভিমুখীকরণের কাজ চলেছে। প্রথম পর্যায়ে বাংলা, ইংরাজি ও গণিত নির্দেশিকা 'হাতবই' প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীতে ইতিহাস, ভূগোল, জীবনবিজ্ঞান ও ভৌতবিজ্ঞান বিষয়ে নির্দেশিকা প্রকাশিত হল। এই সঙ্গে প্রশিক্ষণ সহায়িকা নতুন অভিমুখ পুস্তিকাটি পরিমার্জন করে প্রকাশিত হল।

আশা করি আমাদের এই উদ্যোগ পরিস্থিতির চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সহায়তায়ই এটি সম্ভব হবে বলে পর্ষদ্ আশা রাখে।

সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্

প্রথম প্রকাশ উপলক্ষ্যে

মুখবন্ধ

বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষার অধিকারকে সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের গুরুত্ব সর্বাধিক। সেইজন্য সময়ের চাহিদা অনুযায়ী বাস্তব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচির পর্যালোচনা ও পুনরালোচনার প্রক্রিয়ার সঙ্গো শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের প্রতিনিয়ত সংযুক্ত রেখে অভিমুখনের গতিশীল বিন্যাস - পশ্চিমবঙ্গা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের একটি আবশ্যিক ইতি কর্তব্য।

১৯৮৯ সালে পশ্চিমবঙ্গা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ ব্যাপক এবং নিবিড় অভিমুখীকরণের কর্মসূচি সাফল্যের সঙ্গো সম্পন্ন করতে পেরেছিল — এবং সেই কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য তৎকালীন ' প্রশিক্ষণ সহায়িকা' পুস্তকটি রচিত হয়েছিল।

' সকলের জন্য শিক্ষার ' লক্ষ্যকে আন্তরিকভাবে রূপায়ণের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ 'সর্বশিক্ষা অভিযান' প্রকল্পকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে একটি পৃথক বিভাগের সূচনা করে। ইতোমধ্যে এই বিভাগের উদ্যোগে রাজ্যব্যাপী বিদ্যালয় প্রধান, পরিচালন সমিতির সদস্য এবং শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের সামগ্রিক অংশগ্রহণমূলক অভিমুখীকরণ কর্মশালা পরিচালনার জন্য ভিত্তিপত্র কর্মশালার মাধ্যমে রচিত হয় এবং মুখ্য সম্পন্ন ব্যক্তি ও সম্পন্ন ব্যক্তি গড়ে তোলার কাজ সফলভাবে করা সম্ভব হয়। অতি সম্প্রতি 'জীবন শৈলী শিক্ষা' বিষয়ে অনুরূপ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমান আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে সকল শিশুর শিক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান যে প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করতে হবে তা হ'ল বহুছাত্রছাত্রী সমন্বিত বৃহদায়তন শ্রেণি কক্ষ। সেই উপযোগী শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক অংশগ্রহণমূলক শিখন পদ্ধতির প্রকরণ বিষয়ে নিবিড় অভিমুখীকরণ একান্ত জরুরী। সেইসঙ্গো বর্তমান পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পাঠ্যসূচির পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। সেইজন্য বিষয় ভিত্তিক অভিমুখনের ব্যাপক কর্মসূচি একটি আবশ্যিক কর্তব্য রূপে পর্ষদের কাছে প্রতিভাত হ'য়েছে। পর্ষদের সর্বশিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে প্রশিক্ষণ সহায়িকা - নতুন অভিমুখ ও প্রথম পর্যায়ে বাংলা, ইংরেজি ও অঙ্ক তিনটি বিষয়ের খসড়া 'সহায়িকা' প্রকাশিত হ'ল — যা রাজ্যস্তরে চারদিনব্যাপী বিষয়ভিত্তিক কর্মশালার মাধ্যমে চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে এবং মুখ্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের ব্যাপক ও নিবিড় অভিমুখনের কাজে প্রেষণা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। অন্যান্য বিষয় সমূহের ভিত্তিপত্র রচনার কাজও শুরু হয়েছে। পর্ষদ্ ভরসা রাখে বর্তমান পরিস্থিতির এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গোর সচেতন শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী সমাজ নিজেদের 'সম্পন্ন' করে গড়ে তুলবেন এবং শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সফল করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করবেন।

এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গো যুক্ত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন।

২৮ মার্চ, ২০০৫

সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্
ডিরোজিও ভবন, বিধাননগর,
কলকাতা - ৭০০ ০৯১

বর্তমান কর্মসূচির পটভূমিকা

সমাজ গঠনের কাজে শিক্ষার নির্ধারক ভূমিকা সম্পর্কে আমরা সকলেই অবহিত আছি। বর্তমান সমাজকে জ্ঞান ভিত্তিক বলে অভিহিত করা হয়েছে। সমাজের অগ্রগতি ঘটাতে শিক্ষার গুরুত্ববৃদ্ধি পাচ্ছে। উচ্চমানের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বেশি করে অনুভূত হচ্ছে। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে শিক্ষার মান যত উন্নত হবে তার লক্ষ্য অর্জনও ততই সহজ ও সুনিশ্চিত হবে। সুতরাং শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত সকলেরই শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে সচেতন ও যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু শিক্ষার মান প্রত্যক্ষ ভাবে পরিমাপযোগ্য নয়। তাকে বিচার করার কোনো নির্দিষ্ট মাপকাঠি নেই। সহজ কথায়, শিক্ষার গুণগত মান বোঝা যায় উদ্দেশ্য পূরণে তার সার্থকতার মাত্রা দিয়ে। বিদ্যালয়স্তরে শিক্ষার সর্বজনগ্রাহ্য উদ্দেশ্য হল একটি বহুত্ববাদী, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও বিজ্ঞান-মনস্ক সমাজের উপযুক্ত মূল্যবোধ-সম্পন্ন নাগরিক গড়ে তোলা, ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত অর্থে মানুষ করা।

তবে এই লক্ষ্য অর্জন করার প্রয়াসে বিদ্যালয়ের সুযোগ নিরঙ্কুশ নয়। সমাজের সামগ্রিক পরিবেশ শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব গঠনে গভীর প্রভাব ফেলে। সুতরাং শিক্ষাব্যবস্থা তার উদ্দেশ্য পূরণে কতটা সফল হ'ল বাস্তব ফল থেকে তার নিঃশর্ত মূল্যায়ন করা কঠিন কাজ। শুধু পরীক্ষার নম্বর দেখে এই বিচার করা যায় না। তবু পরীক্ষাকেই যদি মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করা হয় তবে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় শিক্ষার মান যে যথেষ্ট উঁচু তার প্রমান পাওয়া গেছে ১৯৯০ সালে এন. সি. ই. আর. টি. আয়োজিত একটি সর্বভারতীয় পরীক্ষার মাধ্যমে। সারা দেশের ছাব্বিশটি মধ্যশিক্ষা পর্যদ্ ও পঁচিশটি উচ্চ মাধ্যমিক সংসদের অনুমোদিত বিদ্যালয় থেকে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির কিছু ছাত্র-ছাত্রীকে বেছে নিয়ে একটি অভিন্ন পরীক্ষায় বসানো হয়। মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে পরীক্ষা নেওয়া হয় তিনটি বিষয়ে — সমাজবিদ্যা, গণিত ও বিজ্ঞান। উচ্চ মাধ্যমিকে বিষয়গুলি ছিল গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, জীববিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র পদার্থবিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও বাণিজ্য। বলে রাখা দরকার সে নমুনা (Sample) বিদ্যালয় বেছে নেওয়া এবং সেখানকার পরীক্ষার্থীদের নির্বাচন করা সম্পূর্ণ ভাবেই এন, সি. ই. আর. টি.-র এক্তিয়ারে রাখা হয়েছিল। পরীক্ষার প্রশ্ন হয়েছিল কেন্দ্রীয় পর্ষদের পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে।১৯৯১ সালে এই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হলে দেখা যায় মাধ্যমিকস্তরে গড় সাফল্যের নিরিখে এ রাজ্যের ছেলেমেয়েদের স্থান ছিল সমাজ বিদ্যায় দ্বিতীয়, গণিত ও বিজ্ঞানে তৃতীয়। উচ্চ মাধ্যমিকের বিষয়গুলিতে আমাদের রাজ্যের স্থান ছিল গণিতে ও ভূগোলে দ্বিতীয়, ইতিহাসে তৃতীয়, জীববিদ্যায় চতুর্থ, রসায়ন শাস্ত্রে ও অর্থ নীতিতে পঞ্চম, রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও বানিজ্যে অষ্টম, পদার্থবিদ্যায় ত্রয়োদশ। লক্ষনীয় যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বোর্ড এবং কয়েকটি ছোট রাজ্যই পশ্চিমবঙ্গের ওপরে স্থান পেয়েছিল। এই চিত্র দেখে আমরা আশ্বস্ত হতে পারি, কিন্তু আত্মসন্তুষ্টিতে নিশ্চেষ্ট থাকতে পারি না। পরিস্থিতি পাল্টাচ্ছে সমাজে নতুন চাহিদা দেখা দিচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষার মান উন্নত করার এবং উন্নত রাখার নিরন্তর প্রচেষ্টা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে।

আগেই বলা হয়েছে, শিক্ষার মান আমরা পরিমাপ করতে পারি না। কিন্তু যে-সব উপাদানের ওপর মান নির্ভর করে সেগুলি আমাদের অজানা নয়। বিদ্যালয় শিক্ষার মূল লক্ষ্যের অনুসারী পাঠক্রম, বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বয়স এবং বৌদ্ধিক পরিণমনের উপযোগী বিজ্ঞানসম্মত পাঠ্যসূচি এবং যথাযথ মান-এর পাঠ্যপুস্তক

— এগুলিই অত্যাবশ্যক উপাদান। এই প্রস্তুতিকে অবলম্বন করে চলে শ্রেণিকক্ষে পঠন-পাঠন এবং মূল্যবান পরিপূরক হিসেবে ব্যাপক সুপরিকল্পিত সহপাঠক্রমিক কর্মকান্ড। এর সঙ্গে আছে পড়ুয়াদের অগ্রগতি যাচাই করার জন্য মূল্যায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি, দুর্বল শিক্ষার্থীদের ঘাটতি পূরণের চেষ্টা।

শিক্ষার প্রয়োজন জাতির অগ্রগতির জন্য, নাগরিকদের জীবনযাত্রার গুণমান (quality of life) উন্নয়নের জন্য। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা, প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নির্মাণ করা, পর্যাপ্ত অর্থসম্পদের যোগান দেওয়া — এসব রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সে কারণেই সরকারী স্তরে শিক্ষানীতি রচিত হয়, শিক্ষামন্ত্রক ও প্রশাসনিক সংস্থা থাকে, তাদের বাজেটবরাদ্দ থাকে। ওপরে আলোচিত শিক্ষা-প্রয়াস কতদূর ফলপ্রসূ হবে তা সামগ্রিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। শিক্ষার প্রসার এবং গুণগত মানোন্নয়নের জন্য যদি যথেষ্ট সম্পদ পাওয়া যায়, পরিকাঠামোর ঘাটতি যদি না থাকে, সামাজিক পরিবেশের প্রাসঙ্গিক উপাদানগুলি অনুকূল বা ইতিবাচক হয়, তাহলে শিক্ষাব্যবস্থা পূর্ণ সাফল্যের দিকে যেতে পারে। আর এই সব প্রয়োজনীয় উপাদানে যদি অপূর্ণতা ও অসঙ্গতি থাকে সেই অনুপাতে শিক্ষার সাফল্যও অনিবার্যভাবেই ব্যাহত হয়। এই প্রসঙ্গে শিক্ষার সংখ্যাগত সম্প্রসারণ ও গুণগত মানোন্নয়নের মধ্যে সম্পর্কটি বিশেষ বিবেচনার দাবী রাখে। সর্বজনীন শিক্ষার বিস্তারে আমাদের দেশের পশ্চাৎপদতা সুবিদিত। স্বাধীনতার ৫৭ বছর পরেও আমাদের দেশে কয়েক কোটি বালক-বালিকা শিক্ষার অঙ্গনে প্রবেশ করার সুযোগ পায় নি। সম্প্রতি সংবিধান সংশোধন করে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। ফলে সকলের কাছে শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেওয়াটা রাষ্ট্রের মৌলিক সাংবিধানিক দায়িত্বের রূপ পেয়েছে। দেশের প্রত্যেক শিশু-কিশোরকে — বিশেষত বঞ্চিত অংশকে — বিদ্যালয়ে নিয়ে আসা অতীব ব্যয়সাপেক্ষ কাজ। অধ্যাপক তাপস মজুমদারের নেতৃত্বে গঠিত বিশেষজ্ঞ দল হিসেব করে দেখিয়েছেন, দেশের সব ছেলেমেয়ের জন্য মাধ্যমিক মান পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হলে দশম পরিকল্পনা কালে ১২৯৬০ মিলিয়ন টাকা প্রয়োজন। কোনো কোনো দায়িত্বশীল মহল থেকে বলা হচ্ছে — এই বিশাল পরিমান অর্থ সংগ্রহ করা রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা বিশ্বাস করি এই অসহায় পরিস্থিতি অনিবার্য ছিল না। দশকের পর দশক শিক্ষাকে উপেক্ষা করা হয়েছে, প্রয়োজনীয় অগ্রাধিকার দেওয়া হয় নি। এই বিপন্নতা সেই ধারাবাহিক অবহেলার পরিণতি। অধ্যাপক অমর্ত্য সেন এবং আরো অনেক চিন্তাবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীর মতে সর্বজনীন শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা রাষ্ট্রের পক্ষে অসম্ভব নয়।

একই সঙ্গে শিক্ষার উৎকর্ষের প্রশ্নটিও সমান মনোযোগের দাবী রাখে। সূচনাতেই বলা হয়েছে শিক্ষার উন্নত মান সর্বদাই কাম্য। তবে বর্তমান যুগের তীব্র প্রতিযোগিতামূলক জ্ঞানভিত্তিক সমাজে উৎকর্ষের প্রশ্নটিতে বাড়তি গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। নতুন পরিস্থিতিতে সমাজে নানাবিধ দ্বন্দ্ব দেখা দিচ্ছে। একদিকে প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতি, অন্যদিকে মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। আত্মকেন্দ্রিক ভোগবাসনা, সাংস্কৃতিক আগ্রাসনজনিত রুচিবিকার প্রভৃতির অভিঘাতে তরুণ সম্প্রদায়কে বিপথগামী করার বাতাবরণ রচিত হয়েছে। এই পরিবেশে মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত নাগরিক গড়ে তোলার কর্তব্যটি জটিল ও দুরূহ হয়ে যাচ্ছে। এই কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে যথাযথ মান-এর শিক্ষাদান বিশেষ ব্যয়বহুল কাজ। বিদ্যালয়ে এবং প্রশাসনিক সংস্থাসমূহে উন্নত পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করতে হবে। সব শিক্ষার্থীর মনে বিজ্ঞানচেতনা, পরিবেশ সচেতনতা সঞ্চারিত করা আজকের শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। বীক্ষণাগারে হাতে-কলমে কাজ করা, ক্ষেত্রসমীক্ষা করা, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, শিবিরজীবন যাপন প্রভৃতির পর্যাপ্ত সুযোগ গ্রাম-শহর নির্বিশেষে সব ছাত্র-ছাত্রীকে

দেওয়া প্রয়োজন। দেশের শ্রেষ্ঠ মেধার মানুষদের শিক্ষকতার ব্রতে আকৃষ্ট করার উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও মর্যাদার ব্যবস্থা করা দরকার। সব মিলিয়ে শিক্ষার যথাযথ মান সুনিশ্চিত করতে হলে যে পূর্বসর্তগুলি পূরণ করতেই হবে তার জন্য প্রভূত অর্থব্যয় আবশ্যক।

সংখ্যার প্রসার এবং উৎকর্ষসাধন — দুটি লক্ষ্যই অর্জন করা দরকার। পর্যাপ্ত অর্থের যোগান থাকলে এই দুই লক্ষ্যের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকে না। বরং শিক্ষার প্রসার মানোন্নয়নের সহায়ক হওয়াই স্বাভাবিক। শিক্ষার পরিধি যত ব্যাপ্ত হবে ততই নতুন মেধা ও বৌদ্ধিক সক্ষমতার উন্মেষ ঘটবে, নতুন প্রতিভার সন্ধান পাওয়া যাবে, তাদের পরিচালিত করে মূল্যবান সম্পদে পরিণত করা যাবে। ফলে সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে। কিন্তু যথেষ্ট অর্থ যদি ব্যয় করা না হয় তবে এই দুটি দাবী পরস্পরের বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। সীমিত সম্পদ নতুন সুযোগ সৃষ্টির কাজে ব্যয় হয়ে গেলে মানোন্নয়ন সম্ভব হবে না। উপরন্তু পরিকাঠামো দুর্বল হবে, সরঞ্জাম ও উপকরণ পাওয়া যাবে না, হাতে-কলমে বিজ্ঞান শেখার যন্ত্রপাতির কথা স্বপ্নই থেকে যাবে, গ্রন্থগারে বই মিলবে না, শিক্ষকদের যোগ্যতার প্রশ্নে আপস করতে হবে। সস্তা বিকল্প ব্যবস্থা প্রবর্তন করে শিক্ষার মান নামিয়ে আনতে হবে। পক্ষান্তরে এই সীমিত অর্থ যদি শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যয় করা হয় তবে সম্প্রসারণের রসদ পাওয়া যাবে না, শিক্ষা বঞ্চিত মানুষের সংখ্যা আরো বাড়বে।

আমরা এখন এই সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। আমাদের রাজ্যে সঠিকভাবেই জনশিক্ষার প্রসারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ফল স্বরূপ সাধারণ মানুষের মনে লেখা পড়া শেখার আগ্রহ জন্মেছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যায় বিরাট স্ফীতি ঘটেছে। এই জোয়ারের স্রোতে যোগ দিচ্ছে পিছিয়ে পড়া পরিবারের প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়ারা যাদের গৃহে শিক্ষার সহায়ক পরিবেশ আদৌ নেই। এটা এ রাজ্যের এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য। আমরা আনন্দিত। কিন্তু এর ফলে পরিকাঠামোর ওপর অস্বাভাবিক চাপ পড়ছে, গুণমান রক্ষার ক্ষেত্রে গভীর সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষাপ্রয়াস যথাযথভাবে পরিচালিত করা ক্রমশঃ কঠিনতর হয়ে উঠছে।

যুগের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে নতুন ভাবনা-চিন্তা আসে। পাঠক্রম-পাঠ্যসূচির পর্যালোচনা ও পরিমার্জন প্রয়োজন হয়, পরীক্ষা সংস্কারের প্রশ্ন ওঠে। সেই লক্ষ্যে কিছু পদক্ষেপ মাঝে মাঝেই নেওয়া হয়। কর্মশালা, আলোচনা সভা, অভিমুখীকরণ কর্মসূচি ইত্যাদি প্রায়শই অনুষ্ঠিত হয়। তবে কখনো কখনো সামগ্রিক পরিস্থিতিতে নতুন বাঁক আসে। তখন বড়মাপের কর্মসূচি গ্রহণ করতে হয়।

এমনই একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল গত শতাব্দীর ৮০-র দশকের মাঝামাঝি সময়ে। ভারত সরকার আর্থিক ক্ষেত্রে নতুন নীতি গ্রহণ করলেন। তার অনুগামী শিক্ষানীতিও ঘোষিত হ'ল যার সুস্পষ্ট অভিমুখ ছিল জনশিক্ষার পরিবর্তে অভিজাতমুখী শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং কালক্রমে বেসরকারীকরণের সূত্রে শিক্ষার বানিজ্যিকীকরণ। এই নীতি নিয়ে তখন অনেক বিতর্ক হয়েছিল। আমাদের রাজ্যে এই নীতির জনবিরোধী দিকগুলি নিয়ে মানুষকে অবহিত ও সচেতন করার জন্য ব্যাপকভাবে সভা-সমাবেশ, আলোচনা, প্রকাশনা হয়েছিল। বিশ্বের উন্নত দেশগুলি তাদের পরিকাঠামোর কল্যাণে যে ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে সুফল পেয়েছে আমাদের দেশে তারই কিছু উপাদান আমদানী করার ঝোঁক এই নীতিতে প্রতিফলিত হ'ল। এই নতুন শিক্ষাদর্শে দেশের শিক্ষককূলকে দীক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জাতীয় পরিষদ (এন. সি. ই. আর. টি.) দেশ জুড়ে অভিমুখীকরণের কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং সেজন্য কিছু অর্থ বরাদ্দ করে। দেশের সব

রাজ্যকে তারা এই প্রকল্প রূপায়ণ করতে বলে এবং আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করে। এন্. সি. ই. আর. টি কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য ও চিন্তা অনুযায়ী এই কর্মসূচির জন্য কিছু দিক-নির্দেশ করে এবং পদ্ধতিগত রূপরেখাও জানিয়ে দেয়। এর মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের বিষয়টিকে স্থগিত রেখে মানোন্নয়নের প্রসঙ্গকে সামনে আনা হ'ল। প্রচলিত রীতি অনুসারে কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রকল্প ও অর্থ রাজ্য সরকারের কাছেই আসে। সরকারী দপ্তরই এই প্রকল্প বাস্তবায়িত করবে এমন চিন্তা আধিকারিক মহলে দানা বেঁধেছিল। কিন্তু এই স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ্ শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে তার ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। পর্ষদের পরিকল্পনা ও নেতৃত্বে শিক্ষক সংগঠনগুলির সক্রিয় সহযোগিতা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত অঞ্চলে এই বিশাল কর্মযজ্ঞ চালু করা হয় ১৯৮৯ সালের মে মাসে। সব বিদ্যালয়ের সব শিক্ষক-শিক্ষিকা টানা দশদিন পরম নিষ্ঠায় ও উৎসাহে এই কর্মশালার কাজে মেতে রইলেন। কেন্দ্রীয় সংস্থার আর্থিক বরাদ্দ ছিল মাত্র ২৫ শতাংশ শিক্ষকের জন্য। সেই টাকার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে পর্ষদ ১০০ শতাংশ শিক্ষককে এই কর্মসূচিতে টেনে আনল। ফলে অংশগ্রহণকারীদের নিয়মানুযায়ী রাহা খরচ দেওয়া গেল না। কোনো কোনো মহল থেকে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল, এমন ব্যবস্থায় শিক্ষককূলের সাড়া পাওয়া যাবে না। ঘটনা কিন্তু এই প্রচারকে সম্পূর্ণ অমূলক বলে প্রমাণ করল। স্থির লক্ষ্য ও অদম্য ইচ্ছাশক্তি নিয়ে সব বয়সের শিক্ষক-শিক্ষিকারা অকুন্ঠ চিত্তে এই কর্মসূচিকে অভাবিত সাফল্যে উন্নীত করলেন। এই সম্মিলিত উদ্যোগ ও অক্লান্ত পরিশ্রম থেকে পাওয়া গেল শিক্ষাসম্ভারের বহুমূল্য ফসল, সৃষ্টি হ'ল অনুকূল মানসিকতা। পঠন-পাঠনের মানের প্রভূত উন্নতিসাধনের জমি প্রস্তুত হয়ে গেল। পরে নানাবিধ প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতার জন্য এই বিরাট সম্ভাবনাকে বাস্তবে ফলপ্রসূ করার ক্ষেত্রে রয়ে গেল দুঃখজনক অপূর্ণতা।

বিগত ১৫ বছরে বিশ্বের চিত্রটা অনেক পাল্টে গেছে। ঘটে গেছে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তির প্রভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে বিরাট অদল বদল ঘটে যাচ্ছে। নীতিবোধের বিপর্যয় সর্বস্তরে উদ্বেগ সৃষ্টি করছে। এই প্রসঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্বের কথা বারংবার উচ্চারিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনের মূল অভিমুখ নিয়ে কিছু আলোচনা করা যায়।

(ক) **আর্ন্তজাতিক পরিস্থিতি** — বিশ্বায়নের ধাক্কায় বিশ্বব্যবস্থার পাল্লাটি ধনী দেশগুলির পক্ষে ঝুঁকে পড়ছে। দুর্দশা বাড়ছে অনগ্রসর ও উন্নয়নশীল দেশগুলির। ২০০২ সালের বিশ্ব মানবোন্নয়ন প্রতিবেদনে প্রকাশ পেয়েছে, বিশ্বায়নের এক দশকে পৃথিবীতে সম্পদ ও আয় বন্টনের বৈষম্য নজিরবিহীন স্তরে পৌঁছেছে। ধনী দেশের সঙ্গে দরিদ্র দেশগুলির ব্যবধান যেমন বেড়েছে, সব দেশের অভ্যন্তরে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য গভীরতর হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তির বিপুল উৎপাদন ক্ষমতা ভোগ্যপণ্য ও পরিষেবাসম্ভারে বর্ণময় বিলাসী জীবনযাত্রার সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছে। 'বিজ্ঞাপনে মুখ ঢেকে' দেওয়া ব্যাপক সম্প্রচার সেই রঙীন জীবনের স্বপ্নকে সঞ্চারিত করে দিচ্ছে সব শ্রেণির মানুষের মধ্যে। অথচ প্রযুক্তির এই বিরাট শক্তিকে সার্বিক মানবকল্যাণের কাজে না লাগিয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে মুনাফাস্ফীতির লক্ষ্যে। ফলে আমরা পৌঁছেছি কর্মসংস্থানহীন বিকাশের যুগে। (Age of jobless growth)। শিক্ষান্তে রোজগারের অনিশ্চয়তার অভিশাপ তরুণসমাজকে অস্থির ও বিক্ষুব্ধ করে তুলছে। যে সমাজ তাদের সামনে কোনো আশার আলো দেখাতে পারছে না সেই সমাজের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা হারিয়ে যাচ্ছে। ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনযাপনও বিরাট সংখ্যক মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। পরিণামে দেখা যাচ্ছে ধ্বংসাত্মক প্রতিযোগিতা এবং তাতে জয়ী হবার জন্য আত্মসর্বস্ব জীবনদর্শন।

সমাজের এই গভীর অবক্ষয় এবং জীবনের বিকৃত লক্ষ্য অনিবার্যভাবেই শিক্ষাব্যবস্থাকে বিঘ্নিত করছে, লক্ষ্যচ্যুত করছে। সব মানুষের জন্য সাধারণ শিক্ষা উৎপাদন ব্যবস্থার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে। অত্যুচ্চ মানের বিশেষ কিছু কারিগরী ও বৃত্তিমূলক দক্ষতা ছাড়া অন্য সব শিক্ষাই সমাজে মূল্য হারাচ্ছে। বাজারী শক্তিকেই নিয়ন্ত্রক বলে মেনে নিয়ে রাষ্ট্র তার মৌলিক সামাজিক দায়িত্ব থেকে সরে আসছে। যুগের চাহিদা মেটাবার তাগিদে সমাজবিজ্ঞান, এমন কি মৌলিক শিক্ষাকেও উপেক্ষা করা হচ্ছে। তাৎক্ষণিক ফললাভের আশায় এই আলোকবিহীন শিক্ষা সমাজকে ক্রমশঃ গাঢ়তর অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই নতুন লক্ষ্যে 'অভীষ্ট' শিক্ষার চাহিদা বিস্ফারিত হচ্ছে, যোগান সীমিত। নিয়ন্ত্রণবিহীন বাজারের শক্তির অমোঘ নিয়মেই সেই শিক্ষা হয়ে উঠছে মহার্ঘ। অধিকার নয়, শিক্ষা হয়ে উঠেছে পণ্য, — অধুনা আমদানী রপ্তানীর পণ্য।

কিন্তু বিরাট সংখ্যক মানুষের স্বার্থবিরোধী এই ব্যবস্থায় অন্তর্নিহিত স্ববিরোধ প্রকট হয়ে উঠছে। তাই বিশ্বায়নের সোচ্চার প্রবক্তারাই অন্য মঞ্চে সমবেত হয়ে ভিন্ন সুরে কথা বলছেন। আজ থেকে সাত বছর আগে ইউনিসেফ হিসেব করে দেখিয়েছে বিশ্বে কত কোটি বয়স্ক নিরক্ষর আছেন, আর কত কোটি আছে শিক্ষাবঞ্চিত শিশু-কিশোর। গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তারা বলেছে যে এই পরিস্থিতি শুধু দেশে গণতন্ত্র ও উন্নয়নকেই ব্যাহত করে না, বিশ্বশান্তিকেও প্রবল সঙ্কটের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। তাই সব মানুষেব কাছে শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেবার জন্য সর্বত্র আনুষ্ঠানিক আয়োজন হচ্ছে। একাধিক আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন হয়েছে। ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্বের সব শিশুকে প্রারম্ভিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার অঙ্গীকার ঘোষিত হয়েছে। শুধু সংখ্যার প্রসারই নয়, শিক্ষার গুণগত মানকেও এযুগের জ্ঞানভিত্তিক সমাজের উপযুক্ত স্তরে উন্নীত করতে হবে। জ্যাক দ্যেলরের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন বসল, গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন প্রতিবেদন প্রকাশিত হ'ল যার শিরোনাম "জ্ঞান ঃ অন্তরের সম্পদ।" [Learning : The Treasure within.] এই প্রতিবেদনে শিক্ষার চারটি মূল স্তম্ভকে এভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে — (ক) জানতে শেখা, (খ) করতে শেখা, (গ) সমবেতভাবে বাঁচতে শেখা এবং (ঘ) বিকশিত হয়ে উঠতে শেখা। আজকের লোভাতুর সমাজে আত্মকেন্দ্রিক জীবন-দর্শন মানুষকে সমাজের স্বার্থ সম্পর্কে নিস্পৃহ করে তুলছে। সমষ্টিগত জীবনযাপনের উপযোগিতা ভুলিয়ে দিচ্ছে। এই বৈকল্যের প্লাবন রোধ করার জন্য সমবেতভাবে বাঁচার জন্য মনের প্রসারতা অর্জনের লক্ষ্যটি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দাবী করে। তবে এসব তো নতুন কথা নয়। আমাদের বিস্মৃতপ্রায় মহিলা কবি কামিনী রায় লিখেছিলেন — "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তবে"। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বিপুল সৃষ্টির বিভিন্ন শাখায় আমাদের বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন — 'স্বার্থমগ্ন যে-জন বিমুখ বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখে নি বাঁচিতে।'

(খ) **জাতীয় স্তরে** — একথা আজ অনস্বীকার্য যে দেশ স্বাধীন হবার পরে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় শিক্ষা-ব্যবস্থাকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিকাঠামোর বিরাট ঘাটতি থেকে গেছে। সারা দেশে বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। যে বিদ্যালয়গুলি আছে তার অধিকাংশেই দৈন্যদশা প্রকট। ১৯৮০-র দশকে ভারত সরকার নতুন আর্থিক নীতি গ্রহণ করাব পরে সামাজিক পরিষেবার ক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্রের সরে আসার প্রক্রিয়ায় আরো গতি সঞ্চার করা হয়েছে। এর পেছনে যে আন্তর্জাতিক চাপ ছিল তা-ও অজানা নয়। নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আগে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে অষ্টম পরিকল্পনার নেতিবাচক অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছিল যে বিশ্বব্যাঙ্ক নির্দেশিত কাঠামোগত পরিবর্তনের

জন্যই সরকারী বরাদ্দ বিশেষভাবে কমে যায়। ফলে সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়ন - দুটি কাজই ব্যাহত হয়। রাষ্ট্র হাতগুটিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গেই মুনাফাশিকারী বেসরকারী মহলের সামনে এই জগতের দরজা খুলে গেল। শিক্ষাকে পণ্য হিসাবে বাজারে আনার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হল।

কিন্তু শিক্ষার জন্য দেশের ভেতরে মানুষের দাবী তীব্র হতে লাগল। সেই সঙ্গে সকলের জন্য শিক্ষাপ্রসারের আন্তর্জাতিক চাপকেও উপেক্ষা করা গেল না। ভারতের সর্বোচ্চ আদালত ১৯৯৩ সালে একটি বিখ্যাত মামলায় প্রারম্ভিক শিক্ষাকে সব নাগরিকের মৌলিক অধিকার বলে ঐতিহাসিক রায় দিলেন। পরে ১৯৯৯ সালে সংবিধানের ৮৬ তম সংশোধনের মাধ্যমে প্রারম্ভিক শিক্ষাকে 'রাষ্ট্রের নির্দেশাত্মক নীতির' অধ্যায় থেকে সরিয়ে এনে 'মৌলিক অধিকার'-এর অংশে স্থান দেওয়া হ'ল। অবৈতনিক সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষা রাষ্ট্রের আইনগত দায়িত্বে পরিণত হল। অনিচ্ছাপ্রসূত অক্ষমতার বাধায় সরকার এই লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থবরাদ্দ করতে পারবে না। পরিত্রাণের পথ হিসেবে চেষ্টা শুরু হ'ল প্রথাবন্ধ শিক্ষাকে সরিয়ে রেখে স্বল্পব্যয়ে নিম্নমানের প্রথামুক্ত শিক্ষাব্যবস্থায় আরো জোর দেওয়া। (এই প্রসঙ্গে কিছু বিশদ আলোচনা এই পুস্তিকার প্রথম অধ্যায়ে দেওয়া হ'ল।) একই সঙ্গে চালু করা হ'ল দেশজুড়ে 'সর্বশিক্ষা অভিযান' যার মূল কথা হ'ল সকলের জন্য উন্নত মানের শিক্ষা দেবার আয়োজন। কিন্তু যে-ভাবে এ প্রকল্প চলছে তাতে কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছবার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে গভীর সংশয় জাগছে। পঃ বঃ মঃ শিক্ষা পর্ষদ্ এই প্রকল্পের অন্যতম অংশীদার। শিক্ষককূল এবং সমাজের সব অংশের মানুষের সহযোগিতা নিয়ে এই উদ্যোগকে সফল করে তোলার চেষ্টা চলছে।

এতদিন পর্যন্ত দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে সম্পদ বরাদ্দে কার্পণ্যের ফলে শিক্ষার অগ্রগতি নানাভাবে ব্যাহত হলেও তার ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রটি অক্ষুন্ন ছিল। ২০০০ সাল থেকে এই প্রশ্নে ভারতের শিক্ষার আকাশে একটি নতুন ঘনকৃষ্ণ মেঘের সঞ্চার হতে থাকে। ঐ বছর নভেম্বর মাসে NCERT বিদ্যালয় শিক্ষার জন্য নতুন জাতীয় পাঠক্রমের খসড়া প্রকাশ করে, যেখানে বেশ কিছু আপত্তিজনক প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। মূল্যবোধের শিক্ষা প্রসঙ্গে তারা ধর্মসংক্রান্ত শিক্ষা প্রবর্তন করতে চায় যার জন্য কোনো নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি বা পাঠ্যপুস্তক থাকবে না। শিক্ষক/শিক্ষিকারা তাঁদের নিজ নিজ ধারণা ও বিশ্বাস অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ধর্মবিষয়ক শিক্ষার উপস্থাপন করবেন। এই সূত্রে NCERT-র নতুন করে লেখা ও প্রকাশিত ইতিহাস বইয়ে বেশ কিছু মৌলবাদী বিকৃতি ধরা পড়ল। এ নিয়ে দেশব্যাপী প্রবল বিতর্কের ঝড় উঠল। অনেক বিদগ্ধ পন্ডিত এবং ধর্মনিরপেক্ষ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। আমাদের রাজ্যে এ নিয়ে জনমত গঠন করে শক্তিশালী আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে।

কেন্দ্রে সরকার পরিবর্তনের পরে NCERT বিদ্যালয় পাঠক্রমের পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনার জন্য অধ্যাপক যশপালের নেতৃত্বে জাতীয় স্তরে একটি কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটির ২১ টি বিচার্য বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা উপসমিতি তৈরি করা হয়েছে যার প্রথমটি হল শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কিত। সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত NCERT-র একটি সভায় পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিরা দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়ে এসেছেন যে পাঠক্রম পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার পাঠক্রম নিয়ে গত কিছুদিন ধরে নানারকম বিচ্যুতি ও বিভ্রান্তি দেখা যাচ্ছে। তাৎক্ষণিক ভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠা যে-কোনো বিষয়কেই পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য শিক্ষা-বহির্ভূত মহল থেকে চাপ আসছে। এর মূল কারণ হ'ল শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণার অভাব এবং অনবধানতা।

(গ) **পশ্চিমবঙ্গের চিত্র** — বিগত ১৫ বছরে সারা দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা গেছে। নির্বাচনে এবং অন্তর্বর্তী নির্বাচনে কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন রাজ্যে বারেবারে সরকার বদল হয়েছে। কিন্তু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সব রকম সমস্যা ও চাপের মুখে দাঁড়িয়েও আমাদের রাজ্যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং ফলতঃ নীতির ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে যা জনমুখী উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। এই সময়ের মধ্যে রাজ্য সরকার শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে সুপারিশ দেবার জন্য ১টি কমিশন ও ৩টি কমিটি গঠন করেছিলেন। [(ক) সর্বস্তরের শিক্ষা নিয়ে কমিশন - ১৯৯০, (খ) বিদ্যালয় শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ের পাঠক্রমের তুলনীয়তা বিচারের জন্য কমিটি - ১৯৯৫, (গ) প্রাথমিক স্তরে ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্তন সংক্রান্ত কমিটি - ১৯৯৯, এবং (ঘ) বিদ্যালয় শিক্ষার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিবেচনার জন্য কমিটি - ২০০১।] এছাড়াও মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী এবং মূল স্রোতের সঙ্গে সুসমঞ্জস করে তোলার লক্ষ্যে পৃথক একটি কমিটি করা হয়েছিল। এই সব কমিটির অনেকগুলি সুপারিশ রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছে এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পরামর্শ দিয়েছেন। এর ভিত্তিতে মধ্যশিক্ষা পর্ষদও কিছু নতুন উদ্যোগ নিয়েছে এবং নিতে চলেছে। প্রথাবদ্ধ শিক্ষার পাশাপাশি সুচিহ্নিত লক্ষ্যদলের প্রয়োজন মেটাতে মুক্ত শিক্ষার আয়োজনও করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় একটি বিধিবদ্ধ সংস্থার রূপ পেয়েছে ২০০১ সালে। এই বিদ্যালয়ের পরীক্ষা ও শংসাপত্রকে প্রথাবদ্ধ ব্যবস্থার সমতুল্য বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

সর্বস্তরে শিক্ষার প্রসারের অন্যতম ফল হিসেবে সাধারণ মানুষের মনে শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আগ্রহ ও সচেতনতা বেড়েছে, বেড়েছে তাঁদের চাহিদা ও প্রত্যাশা। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁরা শিক্ষাব্যবস্থার মূল্যায়ন করছেন, মতামত জানাচ্ছেন। সংগঠিতভাবেও এ রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার পর্যালোচনা চলছে। কয়েকটি বেসরকারী সংস্থা — যারা এন্. জি. ও. নামে পরিচিত - কিছু কিছু বিষয়ে অনুসন্ধান করছে। অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের নেতৃত্বে প্রতিচি ট্রাস্ট তাঁদের সমীক্ষাভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সর্বোপরি সরকার রাজ্যের মানবোন্নয়ন প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন যা আন্তর্জাতিক স্তরে প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হয়েছে। এই প্রতিবেদনেও এরাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার একটি প্রামাণ্য ও বস্তুনিষ্ঠ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এ সবই আমাদের সযত্নে অনুধাবন করতে হবে।

বিদ্যালয় শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে কর্তৃপক্ষের চিন্তা-ভাবনা ও সিদ্ধান্তের মধ্যে সমন্বয় বাড়িয়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে পাঁচটি সংস্থার (প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ, উঃ মাঃ শিক্ষা সংসদ ও রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়) সভাপতিরা একটি অ-বিধিবদ্ধ সমিতি গঠন করেছেন। সভাপতিরা এই মঞ্চে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মত বিনিময় করছেন এবং কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করারও পরিকল্পনা নিয়েছেন। সম্প্রতি এই সমিতির উদ্যোগে ধারাবাহিক ও সার্বিক মূল্যায়ন সম্পর্কে একটি জাতীয় স্তরের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই কর্মশালার সুপারিশ আমাদের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হবে। রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদও (এস্. সি. ই. আর. টি) বেশ কয়েকটি বিষয়ে নতুন উদ্যোগ নিয়েছে। কর্মশালার ভিত্তিতে এই পরিষদ 'শিক্ষা প্রসারে বেতার' শীর্ষক একটি মূল্যবান পুস্তক প্রকাশ করেছে। আমরা আশা করি এস্. সি. ই. আর. টি.-র কার্যাবলী থেকে আমরা বিশেষভাবে উপকৃত হব।

নতুন দিশায় পর্ষদ — এই জটিল ও পরিবর্তিত পটভূমিকায় পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে কিছু নতুন পদক্ষেপ নিতে হচ্ছে। মাধ্যমিক স্তরে প্রচলিত পাঠক্রম-পাঠ্যসূচির সার্বিক পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হয়েছে। স্বাস্থ্যশিক্ষাকে শুধুমাত্র শরীরচর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সঙ্গত নয়, মানসিক ও সামাজিক সুস্থতার দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। সেই সঙ্গে জীবনশৈলীর ধারণা শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। পাঠ্যবিষয়ের ক্ষেত্রে দেশের সবোর্চ্চ বিচারালয়ের কিছু নির্দেশ আমাদের মান্য করতে হচ্ছে। পরিস্থিতির মূল্যায়নের ভিত্তিতে আমাদের সম্পূর্ণ ব্যবস্থাটির নবায়নের সময় এসেছে। পঠন-পাঠনের দিন বাড়াবার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীকে নতুন গুরুত্ব দেওয়ার কথা চিন্তা করা হয়েছে। পরীক্ষা ব্যবস্থায় নতুন পদ্ধতি প্রবর্তনের কথা সক্রিয় বিবেচনায় আছে। বিদ্যালয়গুচ্ছ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা নতুন করে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কিছু কাঠামোগত সংস্কার হয়ত করতে হবে।

দেশের মানবসম্পদকে কাম্যস্তরে বিকশিত করে তোলার এই যে বিশাল ও জটিল অভিযান তার মূল কান্ডারী অবশ্যই শিক্ষককূল। আমরা যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করি তাতে শিক্ষার এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ার সব পর্যায়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভূমিকা পালন করেন। শ্রেণিকক্ষে পঠন-পাঠন, তার বাইরে সহপাঠক্রমিক চর্চা ও অনুশীলন, নিয়মিত মূল্যায়ন ও সংশোধনী পাঠ— এসব ক্ষেত্রে শিক্ষকদের এক্তিয়ার নিরঙ্কুশ। এখানে তাঁদের কোনো বিকল্প নেই। আর পাঠক্রম-পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, বিদ্যালয় পরিচালনা, পাঠোপকরণসহ সমগ্র ব্যবস্থাটির পর্যালোচনা ও নবীকরণে তাঁদের গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণও অপরিহার্য। এই সব বিষয়ে অবহিত, সচেতন ও সক্রিয় থাকা তাঁদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব ও অলঙ্ঘনীয় অধিকার।

আমাদেব রাজ্যের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সচেতনতার ওপর পর্ষদের পরিপূর্ণ আস্থা আছে। শিক্ষার উৎকর্ষসাধনে তাঁরা সাধারণভাবে সজাগ ও সচেষ্ট। কিন্তু পরিস্থিততে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। সমাজে নতুন প্রবণতা দেখা দিচ্ছে যার সবটাই সুস্থ নয়। বেশ কিছু ক্ষেত্রে বিতর্ক ও বিভ্রান্তি আছে, আছে নতুন বিষয় প্রবর্তনের চাপ। এই সব প্রশ্নে পর্ষদের ভাবনা-চিন্তা, সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষককূলকে অবহিত করা, তাঁদের সঙ্গে মত বিনিময় করা বিশেষ জরুরী। সেই উদ্দেশ্যেই এক ব্যাপক অভিমুখীকরণের আয়োজন করা হয়েছে যেখানে রাজ্যের সব শিক্ষক-শিক্ষিকা অংশ নেবেন, নিজেদের আরো সমৃদ্ধ করে তুলবেন, শিক্ষার মান যথাসাধ্য উন্নত করার কাজে পর্ষদকে সাহায্য করবেন।

১৯৮৯ সালে রাজ্যব্যাপী অভিমুখীকরণ উপলক্ষ্যে একটি প্রশিক্ষণ সহায়িকা রচনা এবং ব্যবহার করা হয়েছিল। এবারের কর্মসূচির ভিত্তি হিসেবে সেই পুস্তিকাটি সময়োচিত সংযোজন ও পরিমার্জনসহ প্রকাশ করা হল। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সক্রিয় সহযোগিতায় এই বই প্রণীত হয়েছে। যাঁরা পুস্তিকাটি অনুসরণ করবেন তাঁরা এটিকে আরো উন্নত করার জন্য পরামর্শ দিলে পর্ষদ বাধিত হবে।

(ক) প্রথাবিহীন, প্রথাবন্ধ ও প্রথামুক্ত শিক্ষার ধারণা ও তাদের গুরুত্ব।

জন্মের পরক্ষণ থেকে মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত মানুষ কিছু না কিছু শেখে। এই শিখনের ধারাকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়, যথা

১। প্রথাবিহীন শিক্ষা (Informal Education)

২। প্রথাবন্ধ শিক্ষা (Formal Education)

৩। প্রথামুক্ত শিক্ষা (Non-Formal Education)

(১) প্রথাবিহীন শিক্ষা

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় প্রবেশ করার আগেই শিশু প্রধানত তার আশেপাশের প্রকৃতি ও পরিবেশ থেকে এবং পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভাব ও ভাবনার আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। এই অভিজ্ঞতাই তাব দৈনন্দিন আচার-আচরণ, আগ্রহ-উদ্যোগকে প্রভাবিত করে, তার মধ্যে নানা পরিবর্তনের সূচনা করে। এইসব উপাদানই শিশুর জীবনে প্রথাবিহীন শিক্ষার গোড়াপত্তন করে। অবশ্য প্রথাবন্ধ শিক্ষা চলাকালে এবং তারপরে সারা জীবন ধরেই প্রতিটি মানুষ প্রথাবিহীন শিক্ষার বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করে জীবনযুদ্ধে এগিয়ে চলে। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এখনও বিরাট সংখ্যক শিশু ও কিশোর প্রথাবন্ধ শিক্ষালয়ে যোগ দেবার সুযোগ পায় নি, অথবা শুরু করেও অকালে ঝরে গেছে। সমাজে বয়স্ক নিরক্ষরের সংখ্যাও উদ্বেগজনক। এঁদের জীবনেও শিক্ষা থেমে থাকে না। গ্রামে-শহরে সাক্ষর-নিরক্ষর সব বয়সের নারী-পুরুষ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে বসবাস করেন। তাঁদের পরিবার-পরিজন আছে। প্রতিবেশী, বন্ধু আছে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, অভাব-অনটন আছে। পরিবেশে কিছু অনুকূল উপাদন আছে, অনেক প্রতিকূলতাও আছে। এসবের মধ্যে দিনযাপন করতে করতে তাঁরা নিত্যনূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হন, অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। বাস্তব অর্থে মানসিক ও বৌদ্ধিক দিকে পরিণত হন। শিক্ষিত হন। প্রথাবিহীন শিক্ষা এভাবেই সব মানুষের জীবনব্যাপী একটি স্বাভাবিক ও অপরিহার্য প্রক্রিয়া। এর জন্য কোনো নির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন থাকে না। দেশের সব নাগরিকই এই শিক্ষাপ্রবাহের অঙ্গ। জীবন ও সমাজ সম্পর্কে তাঁদের বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁদের মূল্যবোধ, রুচি ও ব্যক্তিত্বকে এই শিক্ষাধারা গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সুতরাং সমাজ ও সংস্কৃতির সামগ্রিক বিকাশে প্রথাবিহীন শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

(২) প্রথাবন্ধ শিক্ষা

যে কোনো সমাজের অগ্রগতির জন্য কিছু লক্ষ্য ও গতিমুখ থাকে। মানুষের অনেক আশা ও অভিলাষ থাকে। এগুলি পূরণ করার জন্য দেশের জনসম্পদকে পরিশীলিত করার ব্যবস্থা করতে হয়। অনির্দিষ্ট ও অনিয়ন্ত্রিত প্রথাবিহীন শিক্ষার মাধ্যমে এ কাজ সম্পন্ন হতে পারে না। তাই প্রতিটি জাতি তার জীবন-দর্শন ও আদর্শ এবং সামাজিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে তার নাগরিকদের জন্য পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে। সমাজ বিকাশের স্তরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং শিক্ষার্থীর বয়স ও বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের পর্যায় অনুসারে

বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেই শিক্ষাব্যবস্থা কার্যকর করে। একেই বলা হয় প্রথাবদ্ধ শিক্ষা (Formal Education) অথবা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা (Institutional Education)। বর্তমান যুগের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়-ভিত্তিক শিক্ষা এই শ্রেণিভুক্ত।

সারা পৃথিবী শিক্ষাকে মানুষের অধিকার বলে অনেকদিন আগেই মেনে নিয়েছে। সব নাগরিকের এই অধিকার সুনিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আমাদের সংবিধান গৃহীত হবার সময় রাষ্ট্রের এই অলঙ্ঘনীয় দায়িত্ব নির্দেশাত্মক নীতির অধ্যায়ে স্থান পেয়েছিল, কিন্তু সকলের অধিকার প্রতিষ্ঠার সেই লক্ষ্য থেকে জাতি এখনো অনেক যোজন পিছিয়ে আছে। কয়েক বছর আগে সংবিধানের ৮৬ তম সংশোধনের বলে প্রারম্ভিক শিক্ষাকে (৮ম শ্রেণি পর্যন্ত) মৌলিক অধিকারের তালিকায় আনা হয়েছে। ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সের সব বালক বালিকাকে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসা, ধরে রাখা ও উন্নত মান-এর শিক্ষা দেবার লক্ষ্য নিয়ে সর্বশিক্ষা অভিযান শুরু হয়েছে। পর্ষদ এবং অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলিও এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত।

বিদ্যালয় স্তরে প্রথাবন্ধ শিক্ষার দুটি প্রধান লক্ষ্যের কথা বলা হয় — (ক) একটি গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, বিজ্ঞানমনস্ক সমাজের উপযুক্ত সচেতন, সৃজনশীল নাগরিক তৈরি করা। (খ) শিক্ষার্থীদের উত্তর জীবনে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে জীবিকা অর্জনে সক্ষম করে তোলা।

(৩) প্রথামুক্ত শিক্ষা

সমাজের নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধক প্রথাবন্ধ শিক্ষার কার্যকাল স্বাভাবিক কারণেই সীমিত। এই সীমিত সময়ের ও পরিধির শিক্ষা শেষ হলেই শিক্ষার ধারা থেমে যায় না। প্রতিটি মানুষ এরপরও নানাভাবে নানা দিক থেকে শিক্ষা-সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করে যা তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে। এর ফলে তার ব্যক্তি ও সমাজ জীবন-যাপন প্রণালী ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিশীলিত ও পরিমার্জিত হয়। সাধারণভাবে জীবন-ব্যাপী এই শিক্ষাকে প্রথাবিহীন শিক্ষার সমপর্যায়ের মনে হলেও, প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত শিক্ষা থেকে এই শিক্ষা ভিন্ন প্রকৃতির। কারণ প্রথাবন্ধ শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক গন্ডির মধ্যে সীমাবন্ধ না থাকলেও প্রথাবন্ধ শিক্ষালব্ধ চিন্তন মনন, বিশ্লেষণ-পদ্ধতি আত্তীকরণের ভিত্তি হিসাবে এই শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই এই শিক্ষাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার জন্য একে প্রথামুক্ত (Non-Formal Education) বলা যায়।

আরো একটি কারণে এই শিক্ষা প্রথাবিহীন শিক্ষা থেকে স্বতন্ত্র। যদিও প্রথাবন্ধ শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে এই শিক্ষা পরিচালিত হয় না তথাপি নানা ধরনের কেন্দ্র, কর্মশালা, সমিতি ইত্যাদি কাঠামোর মাধ্যমে এই শিক্ষা দেওয়া হয় এবং পরিকল্পনামাফিক নানা প্রকার শিক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, যেমন, বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প, কর্মরত শ্রমিক-শিক্ষা প্রকল্প, নানা আর্থ-সামাজিক কারণে বিদ্যালয়ত্যাগী কিশোর ও শিশুদের জন্য বিকল্প-শিক্ষা প্রকল্প ইত্যাদি।

আজকের দিনে মুক্ত বিদ্যালয় সংক্রান্ত আলোচনা আমাদের কাছে বিশেষ প্রাসঙ্গিক, কারণ দেশের কোনো কোনো অংশের সঙ্গে আমাদের রাজ্যেও মুক্ত বিদ্যা ব্যবস্থা চালু হয়েছে। বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্ষদ সংসদের মত বিধানসভার আইনের ভিত্তিতে রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে।

মুক্ত শিক্ষার ঘোষিত উদ্দেশ্য হল শিক্ষা-বঞ্চিতদের কাছে শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া (reaching the unreached)। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার উপযোগিতা এখানে আমাদের বিবেচ্য নয়। আমরা বুঝে নিতে চেষ্টা করব মুক্ত বিদ্যালয় সমাজের কোন্ শ্রেণির মানুষের প্রয়োজন মেটাবে। আমরা মনে করি বিদ্যালয় স্তরে মুক্ত শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্যদল তাঁরাই যাঁরা বিভিন্ন আর্থসামাজিক প্রতিবন্ধকতার জন্য যথাসময়ে বিদ্যালয়ের পাঠ সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। এঁরা সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ (Marginalised section of the population)। ২০০১ সালের জানুয়ারী মাসে হায়দারাবাদে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনেও এই মত গৃহীত হয়েছিল। এই বঞ্চিতের দল জীবনের পথে কিছুদূর এগোবার পরে নতুন করে লেখাপড়া শুরু করার, দু'একটি পরীক্ষা পাশ করার তাগিদ অনুভব করতে পারেন। কিন্তু বয়স, পেশা বা সামাজিক অবস্থান তাঁদের প্রথাবদ্ধ শিক্ষার অঙ্গনে প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছে। মুক্ত বিদ্যালয় কিছু নমনীয় নিয়মবিধির সাহায্যে এই অসহায় নরনারীদের সামনে লেখাপড়া চালিয়ে যাবার এক বিকল্প সুযোগ এনে দিয়েছে। এঁরা সাধারণত আংশিক সময়ের পড়ুয়া। অবশ্য প্রথাবদ্ধ বিদ্যালয়ে অসফল কিছু তরুণ-তরুণীও মুক্ত শিক্ষার দিকে আসছে। তারা এখনো কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে নি, তাই লেখাপড়ায় পূর্ণ সময় ও মনোযোগ দিতে পারে।

অধিকাংশ শিক্ষার্থীর সাধারণ কিছু সমস্যা দূর করার জন্য মুক্ত বিদ্যালয়ে কিছু বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। এখানে কয়েকটি মূল বিষয় উল্লেখ করা হল। (ক) মুক্ত বিদ্যালয়ে ভর্তির বয়সের কোনো ঊর্ধসীমা নেই। ১৪ বছরের ওপরে যে-কোনো বয়সের নরনারী স্বীকৃত পাঠকেন্দ্রে গিয়ে পড়ুয়া হিসেবে নাম নথীভুক্ত করতে পারেন। (খ) ভর্তি হবার পরে পড়ুয়ার পাঠকেন্দ্র থেকে পাঠোপকরণ পাবেন। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশেষ পদ্ধতিতে এই উপকরণগুলি প্রস্তুত করে। ধরে নেওয়া হয় স্ব-শিখনের লক্ষ্যে রচিত এই বইগুলি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা নিজ প্রচেষ্টাতে পাঠ্য বিষয়গুলি আয়ত্ত করতে পারবেন। (গ) পাঠকেন্দ্রে হাজিরা দেবার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। পাঠকেন্দ্রগুলি সপ্তাহের নির্দিষ্ট কোনো কোনো দিনে খোলা থাকে। বিভিন্ন বিষয়ের পাঠসহায়করা উপস্থিত থাকেন। নিজের চর্চায় পাঠ আয়ত্ত করতে কোথাও অসুবিধা হলে শিক্ষার্থীরা পাঠকেন্দ্রে এসে সেটুকু বুঝে যেতে পারেন। (ঘ) বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে পড়ুয়াদের স্বাধীনতা আছে। সকলের পড়ার প্রয়োজন বা আগ্রহ এক রকম নাও হতে পারে। তাই নিজের পছন্দ অনুসারে কী পড়বেন বা পড়বেন না সেটা শিক্ষার্থী ঠিক করে নিতে পারেন। তবে প্রথাবদ্ধ ব্যবস্থার সমতুল্য শংসাপত্র নিতে চাইলে সেই পরীক্ষার আবশ্যিক সব কটি বিষয়ে পাশ করতে হবে। (ঙ) মুক্ত বিদ্যালয়ের পরীক্ষা ব্যবস্থাও নমনীয়। সব কটি পাঠ্য বিষয়ে এক সঙ্গে পরীক্ষা দেওয়ার চাপ যদি কেউ না নিতে পারেন তবে দফায় দফায় পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে।

যে বর্গের মানুষদের মুক্ত বিদ্যালয়ের প্রকৃত লক্ষ্যদল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে তাঁদের কাছে এই নমনীয় ব্যবস্থার উপযোগিতা অনস্বীকার্য। কিন্তু শৈশবে, কৈশোরে — বিশেষতঃ বয়ঃসন্ধির কালে — শিক্ষার যে মূল উদ্দেশ্য সেই নিরিখে বিচার করলে এই ব্যবস্থার দুর্বলতা সম্পর্কেও সচেতন থাকা দরকার। প্রথমত, মুক্ত বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা নিয়মিত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাহচর্য পায় না। তাদের নির্ভর করতে হয় পাঠোপকরণ এবং নিজস্ব ক্ষমতা ও চেষ্টার ওপর। যেহেতু এরা নানাদিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষ তাই পরিবার বা পরিপার্শ্ব থেকে বিশেষ সহায়তা পাবার সুযোগ এদের থাকে না। স্বশিখনের পাঠোপকরণগুলি যত্নের সঙ্গে তৈরি করা হয়, তাদের মানও ভাল হতে পারে। কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ বইও শিক্ষকের বিকল্প হতে পারে না। বিশেষতঃ বিদ্যালয়-

বয়সের বালক-বালিকাদের জন্য এই শিক্ষকবিহীন শিক্ষা আদৌ কাম্য নয়। সপ্তাহে কয়েক ঘন্টা শিক্ষকরা পাঠকেন্দ্রে উপস্থিত পড়ুয়াদের যে-সাহায্য করেন, তা হল পরামর্শদান বা Counselling। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সহায়তা চলতে পারে। কিন্তু আমরা মনে করি মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এটা অর্থহীন। এই পড়ুয়াদের প্রয়োজন সিলেবাস অনুসরণ করে ধারাবাহিক ক্লাসের আয়োজন। কিন্তু সেই অবকাশ এখানে নিতান্তই সীমিত।

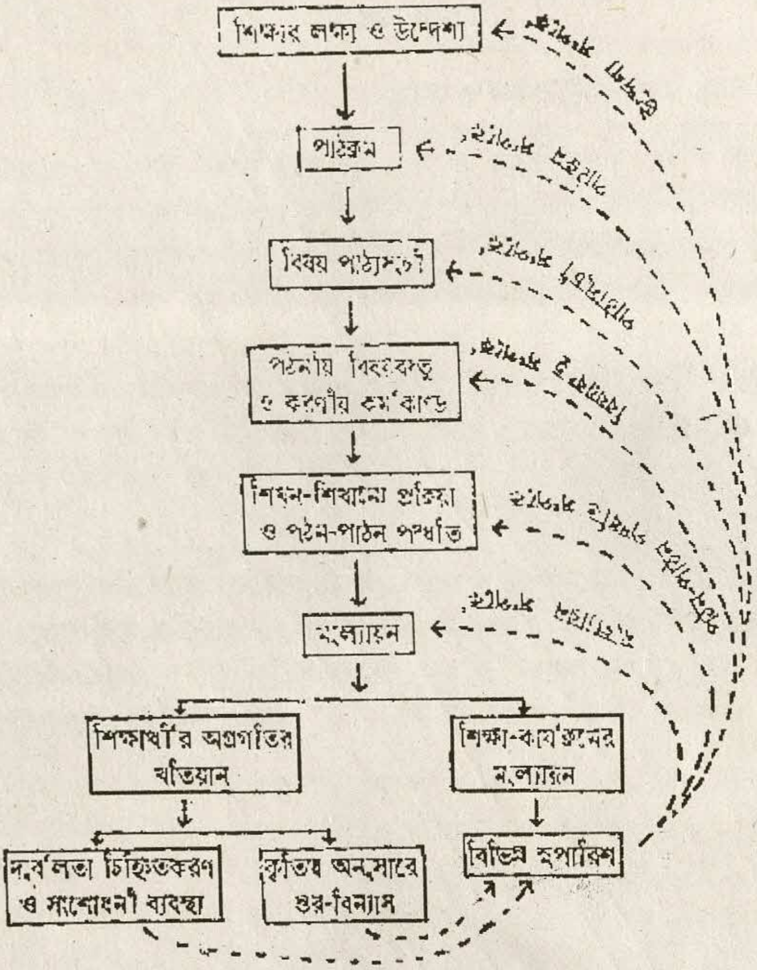
দ্বিতীয়ত মুক্ত পড়ুয়াদের নিয়ে কোনো ছাত্রসমাজ গড়ে ওঠে না। তারা সহপাঠী বন্ধু পায় না। এখানে সবাই বিচ্ছিন্ন, একা। একই পাঠকেন্দ্রে নাম লিখিয়েছেন বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত নানা বয়সের মানুষ। তাঁরা কৈ করে উপস্থিত হবেন তার স্থিরতা নেই। প্রথাগত বিদ্যালয়ে পরস্পরের মেলামেশার মধ্য দিয়ে সামাজিকীকরণের যে পরিবেশ তৈরী হয়, মুক্ত বিদ্যালয়ে তা সম্ভব নয়। দিনের পর দিন সহপাঠীদের সঙ্গে সমবেতভাবে পড়াশুনা, খেলাধুলা, সহপাঠক্রমিক চর্চা ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে যে আবেগ-অনুভূতি, প্রীতি ও সৌহার্দ্য বিকশিত হয়, যে সামাজিক মূল্যবোধ সঞ্চারিত হয়, সবাইকে নিয়ে বাঁচার যে শিক্ষা (Learning to live together) নেওয়া যায়, মুক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সেই অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হয়। তৃতীয়ত, বিষয় নির্বাচনে শিক্ষার্থীর স্বাধীনতাকে মুক্ত ব্যবস্থার একটি বড় গুণ বলে দেখানো হয়। কিন্তু আমরা জানি দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা ব্যাপকভিত্তিক সাধারণ শিক্ষা (Broad-based general education) হিসেবে বিবেচিত হয়। এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিদ্যালয় শিক্ষার পাঠক্রমে সব মৌলিক বিষয়গুলিকেই আবশ্যিক ধরা হয়। সব বিষয়েরই কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে যা বিদ্যালয় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যের অনুগামী। অপরিণত বয়সের শিক্ষার্থীরা বিষয়গুলির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে না। তারা যদি পছন্দমত কিছু বিষয় অধ্যয়ন করে আর বাকীগুলি এড়িয়ে যায়, তবে তাদের শিক্ষা ভারসাম্য হারাবে, সার্থক হবে না।

আমরা বিশ্বাস করি এইসব সীমাবদ্ধতা নিয়ে শিক্ষকবিহীন এই বিকল্প শিক্ষা উৎকর্ষের বিচারে প্রথাবদ্ধ শিক্ষার সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে না। হায়দারাবাদে অনুষ্ঠিত যে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ' In spite of various efforts, the search for quality remains a dream'। এই ব্যবস্থার একটিই আকর্ষণ — রাষ্ট্রের আর্থিক দায়িত্ব অনেক কমে যায়। কিন্তু সম্প্রতি কোনো কোনো প্রভাবশালী মহলে একটি ঝোঁক দেখা যাচ্ছে যার প্রতি আমরা উদাসীন থাকতে পারি না। সুকৌশলে প্রচার করা হচ্ছে যে প্রথাবদ্ধ শিক্ষা ব্যর্থ হয়েছে, তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, এই ব্যবস্থা এখন বর্জনীয় অতীত। মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা চলছে মুক্ত শিক্ষা অনেক বেশী উৎকৃষ্ট ও উপযোগী, এটাই ভবিষ্যৎ। এমন কি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের ক্ষেত্রেও এই শিক্ষার মহিমা কীর্তন করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য স্পষ্ট। আগামী দিনে প্রথাবদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে মুক্ত বিদ্যালয়ের সম্প্রসারনের ক্ষেত্র তৈরি করা হচ্ছে। এই যুক্তি মেনে নিলে শুধু শিক্ষাব্যবস্থাই নয়, গোটা সমাজই বিপন্ন হবে।

(খ) শিক্ষা পরিকল্পনার বিভিন্ন উপাদান ও গুরুত্ব

যে কোনো শিক্ষা পরিকল্পনা রূপায়ণের সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষক/শিক্ষিকার আন্তরিক অংশগ্রহনের ওপর, সেই জন্য পরিকল্পনার উপাদান ও গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন প্রত্যেক শিক্ষক/শিক্ষিকার। শিক্ষা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, পরিপ্রেক্ষিত ও পদ্ধতি আলোচনায় সমসাময়িক সমাজে (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক), গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন অথবা সিদ্ধান্তের উল্লেখ স্বাভাবিকভাবে এসে পড়ে। শিক্ষক/শিক্ষিকারা বিশ্লেষনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা পরিকল্পনা প্রস্তুতি ও রূপায়ণে অংশীদার হতে পারেন। শিক্ষা পরিকল্পনার বিভিন্ন স্তরে তাঁদের অংশগ্রহণ ও সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রশিক্ষণ সহায়িকার এই অধ্যায়ের অবতারনা। (আশা করা যায় প্রশিক্ষণের সময় শিক্ষক/ শিক্ষিকারা মতামত বিনিময়ের সাহায্যে এই আলোচনা সমৃদ্ধ করবেন এবং পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপায়ণে অংশগ্রহণ করবেন।)

যে কোনো সুসভ্য সমাজের জনসম্পদ বিকাশের ক্ষেত্রে প্রথাগত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই একটি গতিশীল সমাজে প্রথাগত শিক্ষার পরিকল্পনা ও তার প্রয়োগ কৌশল বারবার আলোচিত হয় ; সমাজ বিকাশের ধারা অনুসরণ করে তা পরিবর্তিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়। যে ক্রমধারা অনুসরণ করে শিক্ষার পরিকল্পনা রচিত ও আলোচিত হয় তাকে সংক্ষেপে নিম্নরূপে উপস্থাপন করা যায় —



এবার শিক্ষা-পরিকল্পনার বিভিন্ন অংশগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক —

(ক) শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

যে- কোনো পরিকল্পনার গোড়াতেই থাকে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। শিক্ষা-পরিকল্পনার শুরুতেই পরিকল্পনা রচয়িতাগণ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করেন। এর জন্য তাঁরা প্রধানত যে যে বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করেন সেগুলি হল —

(১) সমাজের জীবন-দর্শন ও তা বাস্তবায়নের প্রয়োজন ;

(২) সমাজের বস্তুগত ও কৃষ্টিগত উন্নয়নের প্রয়োজন ;

(৩) শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক ও প্রাক্ষোভিক গুণাবলীর কাম্য বিকাশ ;

(৪) প্রচলিত শিখন-শিখানো প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি ;

(৫) লক্ষ্য পূরণে সমাজের বস্তুগত ও পরিকাঠামোগত সামর্থ্য ;

উপরিউক্ত সাধারণ বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তির স্তর অনুসারে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষার বিশেষ বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করা হয়।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই হলো ভারতীয় সমাজ ইতিহাসের চিরন্তন ধারা। তাই স্বাধীনতাউত্তর ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল — ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র , সামাজিক সাম্য ও সম্প্রীতি, জন কল্যাণ। আর আর্থব্যবস্থার ক্ষেত্রে গৃহীত নীতির মূলকথা হল— গণতান্ত্রিক রীতিসম্মত উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে দ্রুত বৈষয়িক ও শিল্প-বানিজ্যিক বিকাশ। এই সাধারণ সামাজিক দর্শন ও আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার বর্তমান সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলিকে মোটামুটি নিম্নরূপে তালিকাভুক্ত করা যায় ঃ

(১) একটি স্তর পর্যন্ত জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, ধনী, নির্বিশেষে সমস্ত শিশুর জন্য আবশ্যিক ও অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা ;

(২) জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, অর্থনৈতিক সামর্থ্য নির্বিশেষে সকলের জন্য সমমানের শিক্ষার সমান সুযোগ উন্মুক্ত রাখা ;

(৩) শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, বৌদ্ধিক ও প্রাক্ষোভিক গুণাবলীর সুষম বিকাশ ঘটানো ;

(৪) সাম্প্রাদায়িকতা, সঙ্কীর্ণ ভেদবুদ্ধি ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে, ধর্মনিরপেক্ষ, উদার ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ ঘটানো ;

(৫) পরিবেশকে অনাহত রেখে ধারণযোগ্য উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ গড়ে তোলা।

(৬) জাতীয় উন্নয়নের প্রয়োজনে এবং বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের প্রয়োজনে দেশেব মানব সম্পদের বিকাশ ঘটানো ;

(৭) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মনোভাব গড়ে তোলা·;

(৮) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সুষম বিকাশের স্বার্থে আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের পূর্ণবিকাশ ঘটানো ;

(৯) শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক নীতিকে সামনে রেখে সমাজতান্ত্রিক নীতির সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের দৃঢপ্রতিজ্ঞ এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সক্রিয় ও সফল নাগরিকের জীবনযাপনে অভ্যস্ত করে তোলা ;

(১০) সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগের মাধ্যমে শ্রম ও শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদাবোধের বিকাশ ঘটানো ;

(১১) সমাজ সেবামূলক কাজে যুক্ত করে সামাজিক দায়িত্ববোধের উন্মেষ ঘটানো ; সেইসঙ্গে সমাজে পরশ্রমভোগী মানুষের চরিত্র ও ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা ;

(১২) বিশ্বভ্রাতৃত্ব এবং শান্তির সপক্ষে মানসিকতা গড়ে তোলা।

[উপরিউক্ত সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি সামনে রেখে কর্মশালায় দলগত আলোচনার ভিত্তিতে একে সমৃদ্ধ ও সুসংবদ্ধ করা যেতে পারে।]

(খ) পাঠক্রম ঃ

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির হয়ে যাওয়ার পরই পরিকল্পনা রচয়িতাদের প্রধান কাজ হল — কী কী বিষয় অনুশীলন করলে এবং কোন্ কোন্ ক্রিয়াকান্ড অনুসরণ করলে শিক্ষার্থীর আচার-আচরণে উক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি বাস্তবায়িত হবে তা স্থির করা। শিক্ষাতাত্ত্বিক পরিভাষায় একে বলা হয় "পাঠক্রম নির্বাচন"। পাঠক্রম নির্বাচনের সময় পঠনীয় বিষয় ও করণীয় কর্মকান্ডের পরিমাণ নির্ণয় করার কাজটিও করতে হয়।

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে পাঠক্রমের ভূমিকা সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা খুবই জরুরী। কারণ তবেই গতিশীল সমাজে পরিবর্তনশীল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক্রমের পরিবর্তনটি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হয়। স্বাধীনতার পূর্বে আমাদের দেশে যে পাঠক্রম সাধারণভাবে চালু ছিল তাতে ভাষা শিক্ষার উপর যত গুরুত্ব ছিল তত গুরুত্ব ছিল না বিজ্ঞান ও অন্যান্য জ্ঞানমূলক শিক্ষার উপর। বিদেশী শাসকশ্রেণি নিজেদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষার যে উদ্দেশ্য স্থির করেছিল তার সঙ্গে সেই পাঠক্রম ছিল সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু স্বাধীনতার পর আমরা যখন আমাদের সমাজ ও অর্থনীতির স্বার্থে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করলাম তখন স্বাভাবিকভাবেই পাঠক্রমে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সূচিত হলো।

উল্লেখ করা যেতে পারে Jacques Delors এর নেতৃত্বে UNESCO নিয়োজিত আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন তাঁদের প্রতিবেদনে (1996), একুশ শতকের শিক্ষার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

1990 সালে থাইল্যান্ডের জমতিয়েন শহরে অনুষ্ঠিত ' সকলের জন্য শিক্ষা ' শীর্ষক বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলনে সাধারণ শিক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে গৃহীত — " ...... basic learning needs comprise both essential learning tools (such as literacy, oral expression, numeracy and problem solving) and the basic learning content (such as knowledge, skills, values and attitudes) required by human beings to be able to survive, to develop their full capacities, to live and work in dignity, to participate fully in development, to improve the quality of their lives, to make informed decisions and to continue learning. (World Declaration on Education for all, Art.-1, para - 1) " — এই প্রস্তাব সমর্থন করে Delors কমিশন বিশ্বে সাধারণ শিক্ষার প্রসারে গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

সমগ্র বিশ্বে ৯০ কোটি নিরক্ষর বয়স্ক মানুষ, বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়া ১৩ কোটি শিশু আর বিদ্যালয়

শিক্ষা সম্পূর্ণ না করে বিদ্যালয় ছেড়ে যাওয়া ১০ কোটি ছাত্র-ছাত্রীর সাধারণ শিক্ষার আয়োজন করার জন্য আন্তর্জাতিক প্রয়াসের আহ্বান করেছেন Delors Commission।

তাঁরা উল্লেখ করেছেন সাধারণ শিক্ষার প্রতি সকলের আগ্রহ সঞ্চার করবার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার উপাদানের সংস্কারসাধন, যাতে শেখা বা জ্ঞান আহরণের উৎসাহ বাড়ে এবং তা জীবনব্যাপী শিক্ষার আগ্রহ সৃষ্টি করে।

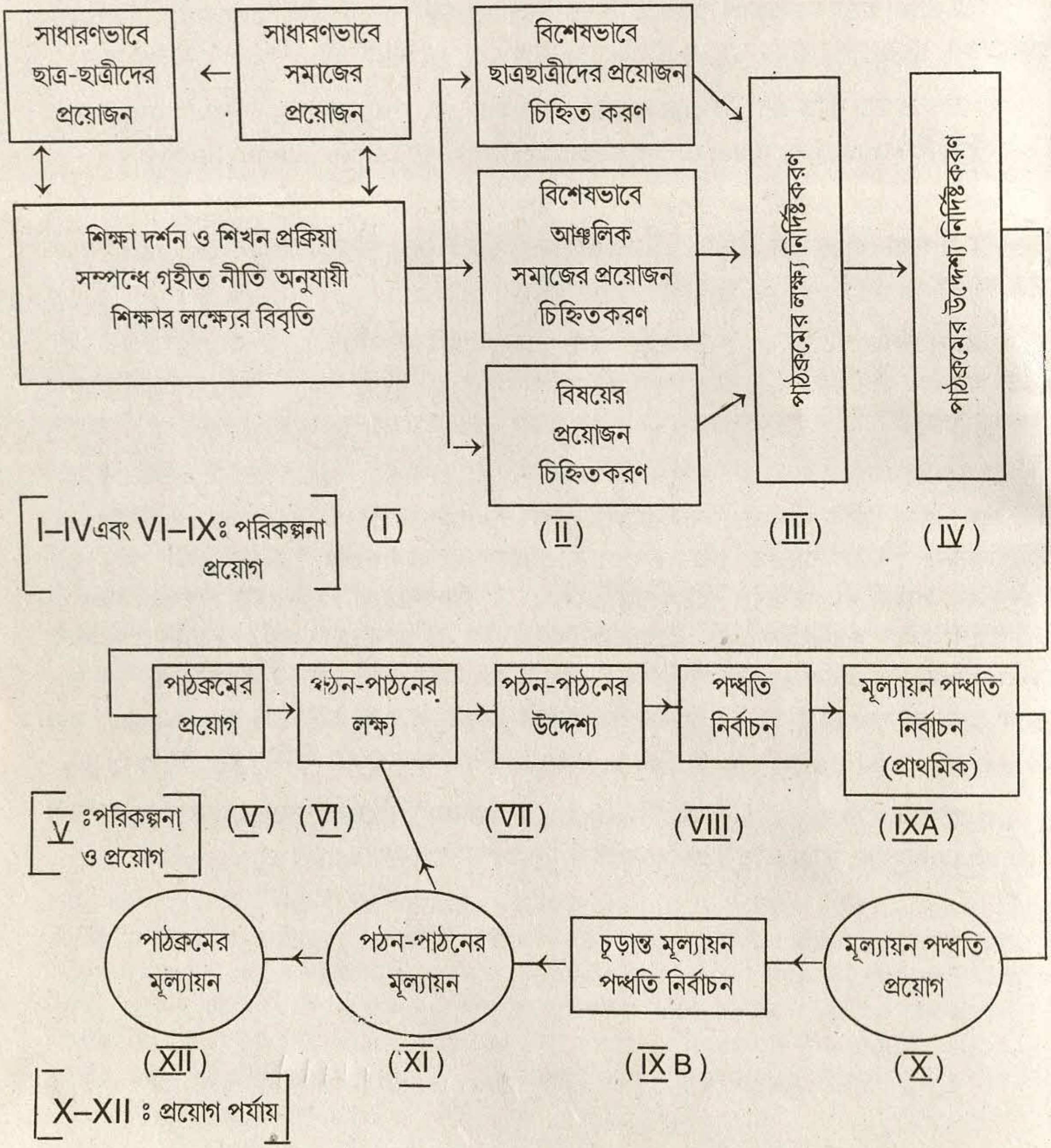
সাধারণ শিক্ষার নীতি এবং উপাদান প্রসঙ্গে এই কমিশন চারটি স্তম্ভের বর্ণনা করেছেন, সেগুলি হল — "Learning to know; Learning to do; Learning to live together ; Learning to be "

আমাদের দেশে কোঠারী কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে সকলের জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ শিক্ষার স্তর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, এই স্তরে পাঠক্রম প্রণয়নে Delors কমিশনের মন্তব্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশ করবে।

পাঠক্রম নির্বাচনের সময় শিক্ষার বিভিন্ন স্তর, যেমন প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা ইত্যাদি সম্বন্ধে আলাদা আলাদাভাবে বিচার করা হয়। আবার শিক্ষার বিভিন্ন শাখা যেমন, সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে পাঠক্রম তৈরি করার সময় এদের স্বতন্ত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই প্রাধান্য পায়।

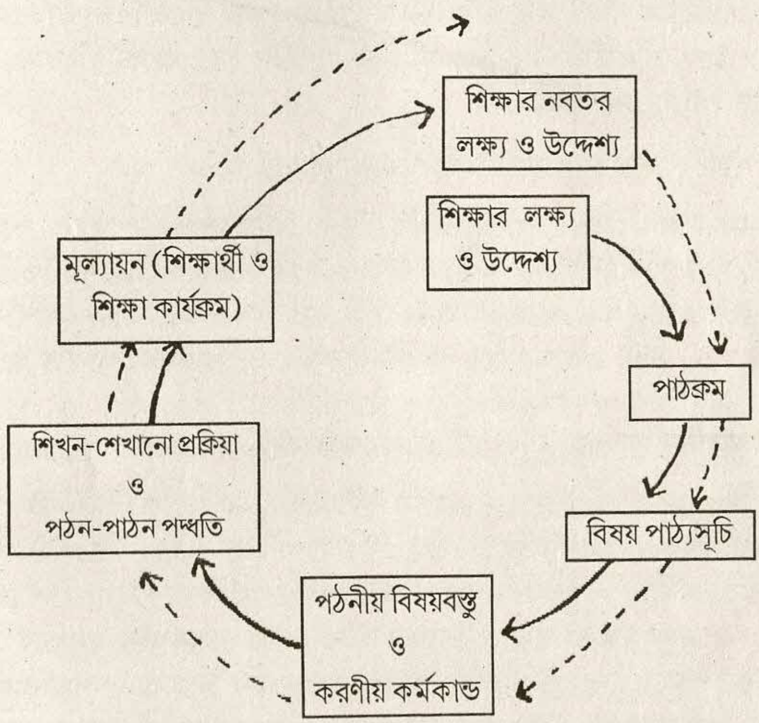
শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের জন্য শিক্ষালয়ে যে সব শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা ও কর্মসূচি নির্দিষ্ট করা হয়, তাদের সমন্বিত রূপ হল পাঠক্রম। পাঠক্রম সম্পর্কে এইরকম সংজ্ঞা সকলের পরিচিত। তবে এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ এবং প্রয়োগ করবার সময় " বিষয়বস্তুর বিন্যাস ", " বিদ্যালয়ে অধিতব্য সমস্ত শিখণ-অভিজ্ঞতা ও পাঠ্যসূচির বিন্যাস", "পারদর্শিতামূলক উদ্দেশ্যের বিন্যাস" ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিদ্যালয়ে অধিতব্য সবরকম শিখনমূলক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং কর্মসূচিকেই পাঠক্রম হিসাবে গ্রহণ করা হয়। পাঠক্রম প্রণয়নের সম্পর্কে বিশদ আলোচনার জন্য আগ্রহী শিক্ষক/শিক্ষিকা এই বিষয়ে Developing the Curriculum (3rd Edn) - Peter F. Oliva, Harper Collins (1992) বইটি পড়তে পারেন।

আলোচনার সুবিধার্থে— Oliva নির্দেশিত (পৃঃ ১৭২) পাঠক্রম বিকাশের রূপরেখার অনুবাদ পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হল। প্রশিক্ষণের সময় প্রত্যেক পর্যায় সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হতে পারে।


সাধারণভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজন
সাধারণভাবে সমাজের প্রয়োজন
শিক্ষা দর্শন ও শিখন প্রক্রিয়া সম্পন্ধে গৃহীত নীতি অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্যের বিবৃতি
বিশেষভাবে ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন চিহ্নিত করণ
বিশেষভাবে আঞ্চলিক সমাজের প্রয়োজন চিহ্নিতকরণ
বিষয়ের প্রয়োজন চিহ্নিতকরণ
পাঠক্রমের লক্ষ্য নির্দিষ্টকরণ
পাঠক্রমের উদ্দেশ্য নির্দিষ্টকরণ
I–IVএবং VI–IXঃ পরিকল্পনা প্রয়োগ
(I)
(II)
(III)
(IV)
পাঠক্রমের প্রয়োগ
পঠন-পাঠনের লক্ষ্য
পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্য
পদ্ধতি নির্বাচন
মূল্যায়ন পদ্ধতি নির্বাচন (প্রাথমিক)
V ঃপরিকল্পনা ও প্রয়োগ
(V)
(VI)
(VII)
(VIII)
(IXA)
পাঠক্রমের মূল্যায়ন
পঠন-পাঠনের মূল্যায়ন
চূড়ান্ত মূল্যায়ন পদ্ধতি নির্বাচন
মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রয়োগ
(XII)
(XI)
(IX B)
(X)
X–XII ঃ প্রয়োগ পর্যায়

(গ) শিক্ষার মানোন্নয়ন কর্মসূচির অনুষঙ্গ

শিক্ষা পরিকল্পনার যে রূপরেখা পূর্ববর্তী বিভাগে আলোচিত হয়েছে তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, একটি গতিশীল সমাজে শিক্ষা একটি গতিশীল বিষয়। বিকাশমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারা অনুসরণ করে সমাজকে মাঝে মাঝেই তার শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন পরিমার্জন করে এগিয়ে যেতে হয়। নইলে তার শিক্ষা ব্যবস্থা সময় ও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে সমাজ ও ব্যক্তি-জীবনের দাবী পূরণ করতে পারে না। এই বিষয়ে "মূল্যায়ন ব্যবস্থা" শিক্ষা-পরিকল্পনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও শিক্ষা ব্যবস্থার শেষ ধাপে মূল্যায়নের স্থান তবু শিক্ষা ব্যবস্থার গলিশীলতার ক্ষেত্রে তা কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। প্রথম অধ্যায়ের (খ) বিভাগের আলোচনা থেকে স্পষ্টই দেখা যায় যে, মূল্যায়নের মাধ্যমে যে ফলাফল পাওয়া যায় তার পরিপ্রেক্ষিতে এমন কি শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিবর্তনের প্রয়োজনও দেখা দিতে পারে। সেই দিক থেকে বিচার করলে শিক্ষা পরিকল্পনার গতিশীলতাকে একটি ক্রমবিকাশমান বৃত্তের সঙ্গে তুলনা করা যায়। নিম্নের চিত্ররূপ থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে।



এই চিত্র থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, যে-কোনো বিকাশমান সমাজে শিক্ষার মানোন্নয়ন কর্মসূচি এই ক্রমবিকাশমান বৃত্তের যে-কোন ধাপ থেকে শুরু করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কোনো একটি জাতি বা সমাজের ক্ষেত্রে শিক্ষার সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে ঘন ঘন মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। এ অবস্থায় সাধারণত সমাজ ও জাতীয় জীবনে বৈপ্লবিক কোনো পরিবর্তন না হলে

শিক্ষার মানোন্নয়নের কর্মসূচি শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে শুরু করার প্রয়োজন হয় না। আমাদের দেশে স্বাধীনতার পর অবশ্য সেই প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।

যাই হোক জাতীয় স্তরে শিক্ষার সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অপরিবর্তিত থাকলেও শিক্ষার মানোন্নয়ন কর্মসূচি ক্রম-অনুসারে যে যে অনুষঙ্গ থেকে শুরু করা যেতে পারে তা হল — (১) পাঠক্রম, (২) বিষয় পাঠ্যসূচি (৩) পঠনীয় বিষয়বস্তু ও করণীয় কর্মকান্ড, অর্থাৎ বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্য-পুস্তক ও ব্যবহারিক কাজকর্মের বিবরণ, (৪) শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া ও পঠন-পাঠন পদ্ধতি ও (৫) মূল্যায়ন।

পাঠক্রম ঃ (যদি মানোন্নয়ন কর্মসূচি এখান থেকে শুরু হয়)

পাঠক্রম নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষার সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই প্রধান ভিত্তি হওয়ায় এর পরিবর্তনও ঘন ঘন হয় না। কিন্তু আজকের যুগ হলো জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কলা-কৌশলের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের যুগ। তাই শিক্ষার সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অপরিবর্তিত রেখেও জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক কাজকর্মের নবতর আবিষ্কার উদ্ভাবনকে স্থান করে দিতে পাঠক্রমের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিমার্জন করতে হয়। তাই বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও কমিটি প্রতি ৫/৭ বছর পর পরই পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি পর্যালোচনা করার সুপারিশ করে থাকেন। এর ফলে ক্রম-অনুসারে পরবর্তী অনুষঙ্গগুলিতে পরিবর্তনের সূচনা হয়।

বিষয় পাঠ্যসূচি ঃ (যদি মানোন্নয়ন কর্মসূচি এখান থেকে শুরু হয়)

অনেক সময় পাঠক্রম অপরিবর্তিত রেখেও পঠনীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে নবতর উপাদানের স্থান করে দেওয়ার জন্য পুরোনো, বাতিল বা কম উপযোগী উপাদান কাটছাঁট করে নতুন করে বিষয় পাঠ্যসূচি তৈরি করার প্রয়োজন দেখা দেয়। সাধারণত বেশ কয়েক বছর পরই এই ঘটনা ঘটে। তাই শিক্ষার মানোন্নয়ন কর্মসূচি এই ধাপ থেকে শুরু করার ঘটনা প্রায়ই ঘটে। তখন ক্রম-অনুসারে পরবর্তী ধাপগুলিতেও পরিবর্তন আনতে হয়।

পঠনীয় বিষয়বস্তু ও করণীয় কর্মকান্ড ঃ (যদি মানোন্নয়ন কর্মসূচি এখান থেকে শুরু হয়)

সাধারণত এই ধাপ থেকে স্বতন্ত্রভাবে মানোন্নয়ন কর্মসূচির সূচনা হয় না। পাঠ্যসূচি পরিবর্তনের পরই সাধারণত এই অনুষঙ্গে পরিবর্তন অবধারিতরূপে দেখা দেয়। অবশ্য এমনও হতে পারে যে, যে-কোন কারণেই হোক প্রচলিত পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে লিখিত পাঠ্য-পুস্তক ও ব্যবহারিক কাজকর্মের বিবরণ পর্যালোচনা করে দেখা গেল যে তাদের মান আশানুরূপ নয় বা তারা পাঠ্যসূচির দৃষ্টিভঙ্গি বা গাইডলাইন অনুসারে তৈরি নয়, তখন পাঠ্যসূচি প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষকে নিজস্ব উদ্যোগে বা প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে উন্নতমানের পাঠোপকরণ তৈরি করার ব্যবস্থা করতে হয়। অবশ্য তখন স্বাভাবিকভাবেই ক্রম-অনুসারে পরবর্তী ধাপগুলিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের কথা ভাবতে হয়।

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া ও পঠন-পাঠন পদ্ধতি ঃ (যদি মানোন্নয়ন কর্মসূচি এখান থেকে শুরু হয়)

পূর্ববর্তী স্তরের উদ্যোগের ফলে এই পর্যায়ে মানোন্নয়নের প্রয়াস শুরু হতে পারে ; আজ বিশ্বের বিভিন্ন

দেশে শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাপ্রণালী সম্পর্কে নিয়ত নানা গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এর ফলে অনেক সময় পঠন-পাঠন ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা হয়। তখন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অপরিবর্তিত রেখেও এই পর্যায়ে মানোন্নয়ন কর্মসূচি শুরু হতে পারে।

যেভাবেই মানোন্নয়ন কর্মসূচি শুরু হোক না কেন এই পর্যায়ে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় শিক্ষকের স্থান। পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষকই মূল সেতুবন্ধ। এই পর্যায়ের সার্থকতা অনেকাংশে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশাগত দক্ষতা এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও মানসিক আন্তরিকতার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এর সবটাই শিক্ষকের নিজের ব্যক্তিগত আয়ত্তের মধ্যে নেই। প্রতিটি শিক্ষা কমিশন ও কমিটি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মন্তব্য করেছে—সামাজিক স্বীকৃতি, চাকুরীর সর্তাবলী, পেশাগত পরিবেশ, সামাজিক নিরাপত্তার আশ্বাস ইত্যাদি কয়েকটি বিষয় শিক্ষকের উদ্যোগ ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। একমাত্র সামাজিক সদিচ্ছা ও দায়িত্ববোধই শিক্ষকদের এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারে। আবার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কর্মরত শিক্ষকদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা খুবই জরুরী। এতৎসত্ত্বেও প্রতিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ব্যক্তিগত ও যৌথ উদ্যোগ ও কর্মপ্রচেষ্টার গুরুত্ব কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না, যেমন অস্বীকার করা যায় না শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের কর্তব্যবোধ ও দায়িত্ববোধের গুরুত্ব।

মূল্যায়ন ঃ

পূর্ববর্তী যে-কোন পর্যায়েই মানোন্নয়ন কর্মসূচি শুরু হোক না কেন তার ঢেউ এই পর্যায়কে সক্রিয় করতে বাধ্য। আবার এই পর্যায় থেকে স্বতন্ত্রভাবেও মানোন্নয়ন কর্মসূচি শুরু হতে পারে। যখন দেখা যায় যে প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থা বা তার কোনো কোনো উপাদান সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বা তার কোন কোন অংশকে সার্থকভাবে মূল্যায়ন করে দিক নির্দেশ করতে পারছে না, তখন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অপরিবর্তিত রেখেও এই পর্যায়ে মানোন্নয়ন কর্মসূচি শুরু করা যেতে পারে।

এক কথায় বলতে গেলে মাধ্যমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো একটি সৃজনশীল পূর্ণ মানুষ তৈরি করা। আর মানবের বিকাশের প্রধান কয়েকটি দিক হল — দেহ, জ্ঞান, কর্ম, অনুভূতির বিকাশসাধন। আবার আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের মতে শিক্ষা প্রয়াসে এদের বিকাশ কখনো আলাদা আলাদাভাবে ঘটে না। কোনো একটি উদ্দীপকের মুখোমুখি হলে শিক্ষার্থী মোটামুটিভাবে সাড়া দেয়। তাই আধুনিক যুগে মূল্যায়ন ব্যবস্থা কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশের মূল্যায়ন করেই সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। তা শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশের মূল্যায়নের দিকে ক্রমেই এগিয়ে চলেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্যদ

৭৭/ ২, পার্ক স্ট্রিট, কোলকাতা - ৭০০ ০১৬

শিক্ষা-পরিকল্পনার বাৎসরিক রূপরেখা

পর্ব -ভিত্তিক বাৎসরিক শিক্ষাপঞ্জি

মূল্যায়নে গ্রেড ব্যবস্থা প্রচলনের পাশাপাশি সার্বিক শিক্ষা-কর্মসূচির নবায়ন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বিষয়টি স্বতঃস্ফূর্ততার ওপর ছেড়ে দিলে বা অপরিকল্পিত ভাবে রূপায়িত হলে কাঙ্ক্ষিত ফল প্রত্যাশা করা অযৌক্তিক হবে। বিদ্যালয় স্তরে মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর গুণগত উন্নতিসাধনের প্রশ্নে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। সার্বিক শিক্ষা পরিকল্পনা স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হওয়া দরকার। প্রথম দুটি স্তর হল ১) শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করা এবং ২) বিভিন্ন স্তরের পাঠক্রম ও বিস্তারিত পাঠ্যসূচি রচনা। পরবর্তী ধাপ হল শিখন-প্রয়াস, যার মূল কথা হল শেখা-শেখানো ও মূল্যায়ন। শ্রেণি কক্ষে দৈনন্দিন শিক্ষা প্রয়াসের মাধ্যমে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু আশ্রয় করে শিক্ষার্থীর আচরণে কাম্য পরিবর্তনের যে লক্ষ্য নির্ধারিত করা হয় তার কতখানি বাস্তবায়িত হল তা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে যাচাই করা। এখানেই বাৎসরিক সময়-সারণির প্রাসঙ্গিকতা। প্রথমে প্রতিটি শ্রেণির প্রতিটি বিষয়ের পঠনীয় বিষয়বস্তু ও করণীয় কর্মকান্ডকে একটি শিক্ষা-বৎসরে প্রাপ্তব্য সময়ের মধ্যে সুষমভাবে বন্টন করে একটি বাৎসরিক সময়-সারণি প্রস্তুত করা ও সেই মতো শেখা-শেখানো ও নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন সম্পাদন করা। পর্যায়ক্রমে আসবে শিখন সামর্থ্য অনুযায়ী পাঠ একক বিশ্লেষণ করে শ্রেণি শিখনের ব্যবস্থা করা যার মূল কথা হবে শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিকতা এবং শিখন-শেখানো শেষে যথাযথ মূল্যায়ন। প্রথমে সময়-সারণির প্রসঙ্গটি আলোচনা করা যায়।

বাৎসরিক সময়-সারণির রচনার বিচার্য বিষয় ঃ

- পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত শিখন সামর্থ্যের পরিমাপ (জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগ ও দক্ষতার ভিত্তিতে) ও সামর্থ্য অর্জনের ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণতা ও দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ এবং সেগুলি দূর করার জন্য সংশোধনী পাঠ ও সঙ্গী শিখন (Peer Learning) - এই বিষয়গুলি মনে রেখে সেই মতো পঠনীয় বিষয় ও করণীয় কর্মকান্ড নির্ধারণ এবং ছুটি ইত্যাদি বাদে কতগুলি কার্যকর শিখন দিবস পাওয়া যাবে এবং কোনও একটি শ্রেণির জন্য একটি বিষয়ের পঠনীয় বিষয়বস্তু ও করণীয় বিশেষ কর্মকান্ডের খতিয়ান। উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে পর্যায়ক্রমিকভাবে আলোচনা করা হচ্ছে।
- সামগ্রিক /চূড়ান্ত পর্বের মূল্যায়নের পর ফল প্রকাশের দিন ছাপানো পুস্তক-তালিকা * শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে।

** পর্যদ প্রকাশিত বইয়ের ক্ষেত্রে পর্যদের জলছাপ ও হলোগ্রামযুক্ত বই সংগ্রহের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে।*

- শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই একক অভীক্ষা ও পর্বভিত্তিক মূল্যায়নের ছাপানো পাঠ পরিকল্পনা শিক্ষার্থীদের দিতে হবে। শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার পূর্বে বিগত বর্ষের সামগ্রিক/ চূড়ান্ত পর্বের মূল্যায়নের পর যে সময় পাওয়া যাবে সে সময়ে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক প্রকাশিত সময় নির্ঘন্ট অনুযায়ী সময়-সারণি, একক অভীক্ষা ও পর্ব ভিত্তিক মূল্যায়নের পাঠ্যসূচি/ কর্মসূচি ইত্যাদি প্রণয়নের কাজ শেষ করতে হবে। (বিধিগত কারণে বিদ্যালয়ে পরিচালন সমিতি না থাকলে বিদ্যালয় প্রধান/ ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বিষয় শিক্ষকদের সঙ্গে পরামর্শ করে এই কাজ করবেন।)

বাৎসরিক সময়-সারণি
পর্ব-ভিত্তিক সময়/ দিন বরাদ্দ

প্রতিদিন ৫ (পাঁচ) ঘন্টা সময় শ্রেণি শিখনের জন্য নির্ধারিত করতে হবে। টিফিনের পূর্বে ৪ (চার) পিরিয়ড ও পরে ৪ (চার) পিরিয়ড ক্লাস করতে হবে। টিফিন বা বিরতির সময় ৫ (পাঁচ) ঘন্টার বাইরে হবে। যথা কোনও বিদ্যালয় ১১ টায় শুরু হলে (টিফিনের জন্য ৩০ মিনিট সময় বরাদ্দ করলে) ৪-৩০ মিনিটে ছুটি হবে।

পর্ব	*রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন*	*সহ-পাঠ ক্রমিক*	*পার্বিক মূল্যায়ন, ফলাফল প্রস্তুত*	*কার্যকর শিখন দিবস - দৈনিক সময় সারণির মধ্যেই একক অভীক্ষা সহ*	*মন্তব্য*
১ ম) মে হতে আগষ্ট ১২৩ দিন	রবিবার - ১৭ দিন গ্রীষ্মাবকাশ - ১৮ দিন অন্যান্য ছুটি - ১০ দিন মোট ৪৫ দিন	২ দিন	১ম (ক) একক অভীক্ষা মূল্যায়ন - পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি (খ) দশম শ্রেণি পরপর ২ দিন ২য় (ক) একক অভীক্ষা মূল্যায়ন পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি	১২৩ - ৪৫ - ২ - ৬ = ৭০ দিন	সকল একক অভীক্ষা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিতগুলি প্রযোজ্য। একই দিনে একাধিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রতিটির মাঝে ৫ (পাঁচ) মিনিট করে বিরতি দেওয়া বাঞ্ছনীয়। একক অভীক্ষা মূল্যায়ন শনিবার ও সোমবার টিফিনের পূর্বে/ শুক্রবার টিফিনের পরে ও শনিবারে শেষ করা যেতে পারে। ১ম (ক) পূর্ণমান ঃ ১৫ সময় ঃ ৩০ মিনিট (খ) পূর্ণমান ঃ ২৫ সময় ঃ ৪৫ মিনিট জুন শেষ সপ্তাহ ২য় (ক) একক অভীক্ষা মূল্যায়ন পূর্ণমান ঃ ১০ সময় ঃ ২০ মিনিট

পর্ব	রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন	সহ-পাঠ ক্রমিক	পার্বিক মূল্যায়ন, ফলাফল প্রস্তুত	কার্যকর শিখন দিবস - দৈনিক সময় সারণির মধ্যেই একক অভীক্ষা সহ	মন্তব্য
			(খ) দশম শ্রেণি পরপর ২ দিন ৩য় (ক) একক অভীক্ষা মূল্যায়ন পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি (খ) দশম শ্রেণি পরপর ২ দিন		(খ) পূর্ণমান ঃ ২৫ সময় ঃ ৪৫ মিনিট জুলাই শেষ সপ্তাহ ৩য় (ক) পূর্ণমান ঃ ১৫ সময় ঃ ৩০ মিনিট (খ) পূর্ণমান ঃ ২৫ সময় ঃ ৪৫ মিনিট আগষ্ট শেষ সপ্তাহ
২য়) সেপ্টেম্বর হতে ডিসেম্বর ১২২ দিন	রবিবার - ১৮ দিন পূজা - ৮ দিন অন্যান্য ছুটি - ১৬ দিন মোট ৪২ দিন	০ দিন	৪র্থ (ক) একক অভীক্ষা মূল্যায়ন পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি (খ) দশম শ্রেণি পরপর ২ দিন ৫ম) একক অভীক্ষা মূল্যায়ন পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি পরপর ২ দিন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রেরণের জন্য যোগ্যতা নির্ণায়ক মূল্যায়ন - ৯ দিন	১২২ - ৪২ - ০ - ৬ - ৯ = ৬৫ দিন	৪র্থ (ক) একক অভীক্ষা মূল্যায়ন পূর্ণমান ঃ ১০ সময় ঃ ২০ মিনিট (খ) পূর্ণমান ঃ ২৫ সময় ঃ ৪৫ মিনিট সেপ্টেম্বর শেষ সপ্তাহ/ পূজোর আগে ৫ম) পূর্ণমান ঃ ১৫ সময় ঃ ৩০ মিনিট নভেম্বর শেষ সপ্তাহ পঞ্চম থেকে নবম ও একাদশ শ্রেণির এই সময়ে কোনও পার্বিক মূল্যায়ন না থাকায়, দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার জন্য প্রেরণের যোগ্যতা নির্ণায়ক মূল্যায়ন-এর দিনগুলিতে পর্যায়ক্রমে একটি করে /একান্ত না

পর্ব	রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন	সহ-পাঠ ক্রমিক	পার্বিক মূল্যায়ন, ফলাফল প্রস্তুত	কার্যকর শিখন দিবস - দৈনিক সময় সারণির মধ্যেই একক অভীক্ষা সহ	মন্তব্য
			৬ম) একক অভীক্ষা মূল্যায়ন পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি পরপর ২ দিন		সম্ভব হলে একাধিক ইউনিট ছুটি দিয়ে পঞ্চম থেকে নবম ও একাদশ শ্রেণির কিছু শিখন দিবস চালু রাখতে হবে। ৬ম) একক অভীক্ষা মূল্যায়ন পূর্ণমান ঃ ১০ সময় ঃ ২০ মিনিট ডিসেম্বর তৃতীয় সপ্তাহ
৩য়) জানুয়ারি হতে এপ্রিল ১২০ দিন	রবিবার - ১৭ দিন অন্যান্য ছুটি - ১৩ দিন মোট ৩০ দিন	২ দিন	৭ম) একক অভীক্ষা মূল্যায়ন পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি পরপর ২ দিন ৮ম) একক অভীক্ষা মূল্যায়ন পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি পরপর ২ দিন বাৎসরিক/ সামগ্রিক মূল্যায়ন - ৯ দিন ফলাফল প্রস্তুত - ৮ দিন মাধ্যমিক / উচ্চ মাধ্যমিক - ৯/ ১৪ দিন	১২০ - ৩০ - ২ - ৪ - ৯ - ৮ = ৬৭ দিন অথবা ১২০ - ৩০ - ২ - ৩০ = ৫৮ দিন অথবা ১২০ - ৩০ - ২ - ৩৫ = ৫৩ দিন	৭ম) পূর্ণমান ঃ ১৫ সময় ঃ ৩০ মিনিট জানুয়ারি তৃতীয় সপ্তাহ ৮ম) একক অভীক্ষা মূল্যায়ন পূর্ণমান ঃ ১০ সময় ঃ ২০ মিনিট ফেব্রুয়ারী দ্বিতীয় সপ্তাহ কোন বহিঃপরীক্ষা না থাকলে মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র হলে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র হলে
৩৬৫	১১৭	৪	৪২(-) / ৫১(-)/ ৫৬(-)	২০২+/১৯৩+/১৮৮+	

বিঃ দ্রঃ অভিভাবক/ অভিভাবিকাবৃন্দের নিকট একক অভীক্ষা মূল্যায়নপত্রগুলি প্রেরণের জন্য পর্ষদের নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তিটি পড়তে হবে ঃ-

'To : The Heads of all Schools Recognized by the Board.

Sub : Return of examined answer scripts of *terminal Examinations to pupils for perusal of guardians.

Sir/Madam,

In partial modification of the Board's Circular Nos. 16/Nov/52 dtd. 20.11.52 and 15/April/53 dtd. 27-4-53 relating to the subject as mentioned above, this has been decided by the Board that henceforth the Schools are to so arrange that their Students can take home the examined answer scripts of the terminal examination for perusal of their guardians under the condition that they must return the scripts with the signature of the guardians to their Schools by 7 (seven) days' from the date of receipt of the scripts from the Schools.

As per decision of the Board, the Schools are to arrange for holding Parent Teacher meet at least twice every year, after the *half -yearly examination and before the annual examination.

All the recognized schools including the Govt. Schools are requested to take necessary action accordingly with immediate effect.

* In the present situation terminal / half -yearly examinations mean - Unit Tests.

মোট ঃ ক) ২০২ + ঃ (৭০ + ৬৫ + ৬৭) দিন (কোন বহিঃপরীক্ষার কেন্দ্র না হলে) + (ম)

অথবা খ) ১৯৩ + ঃ (৭০ + ৬৫ + ৫৮) দিন (মাধ্যমিকের কেন্দ্র হলে) + (ম)

অথবা গ) ১৮৮ + ঃ (৭০ + ৬৫ + ৫৩) দিন (উচ্চ মাধ্যমিকের কেন্দ্র হলে) + (ম)

বিঃ দ্রঃ তৃতীয় পর্বে রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে তিন ধরনের বাস্তবতা থাকে।

ক) কোন বহিঃপরীক্ষার কেন্দ্র হয় না এমন বিদ্যালয় - এখানে প্রাপ্তব্য কার্যকর শিখন দিবস ঃ ২০২ + (ম)

খ) কেবল মাত্র মাধ্যমিক পরীক্ষার কেন্দ্র হয় এমন বিদ্যালয় - এখানে প্রাপ্তব্য কার্যকর শিখন দিবস ঃ ১৯৩ + (ম)

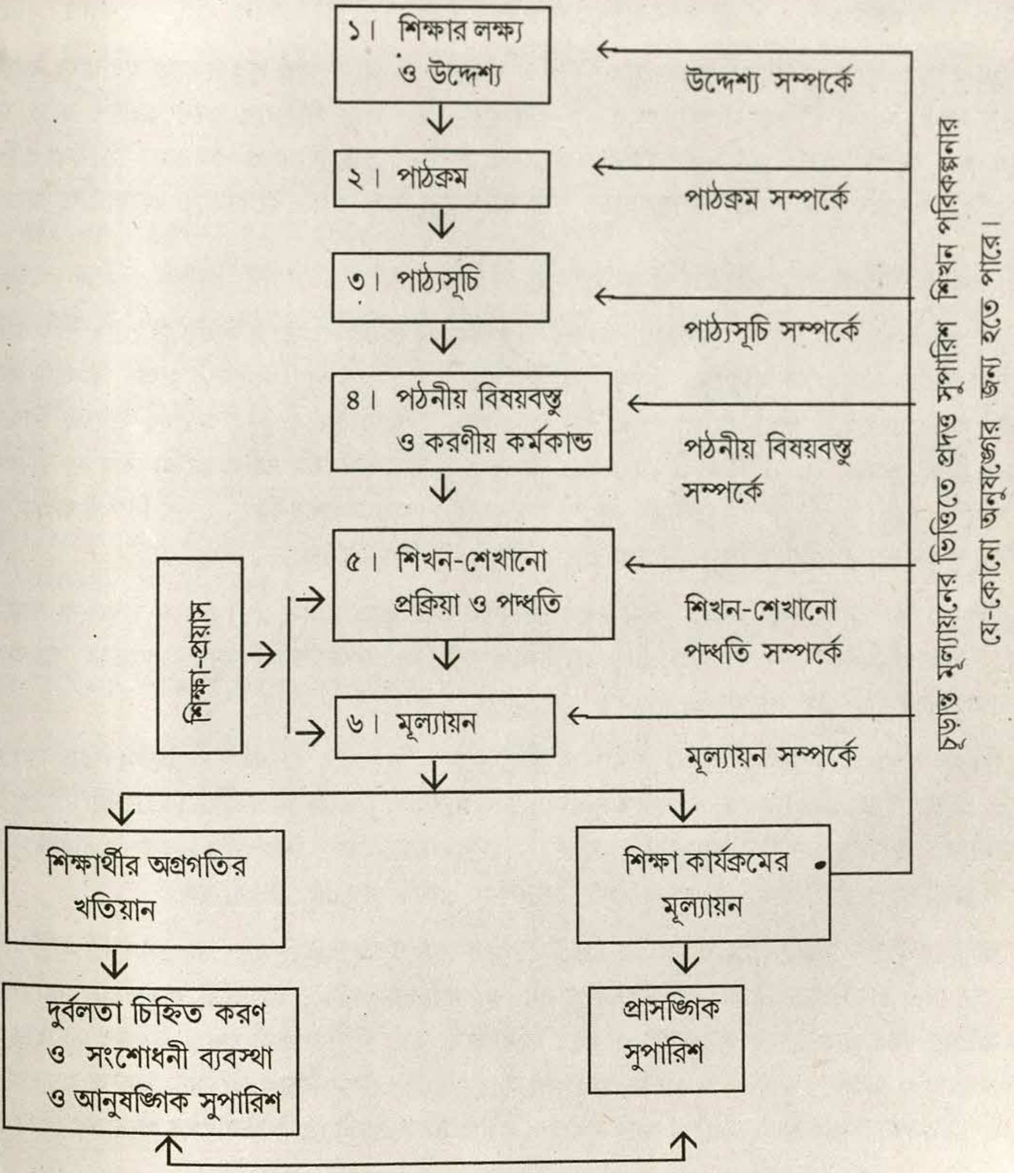
গ) উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কেন্দ্র হয় এমন বিদ্যালয় - এখানে প্রাপ্তব্য কার্যকর শিখন দিবস ঃ ১৮৮ + (ম)

ঘ) বহিঃপরীক্ষা সূচির মধ্যের যে দিনগুলিতে পরীক্ষা হবে না সেই দিনগুলিতে বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন চালু রাখতে হবে।

মোট দিন	রবিবার	ছুটির দিন	আটটি একক অভীক্ষা ও সামগ্রিক মূল্যায়ন = (ম)	সহ পাঠক্রমিক কাজ	বাৎসরিক মূল্যায়নের ফলাফল প্রস্তুতি	বহিঃপরীক্ষা	মোট কার্যকর শিখন/পরীক্ষণ দিবস = (ভ)	অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের দিনসহ কার্যকর শিখন/পরীক্ষণ দিবস (ম) + (ভ)
৩৬৫	(-) ৫২	(-) ৬৫	(-) ২ x ৮ = ১৬ } (-) ২ x ৯ = ১৮ }	(-) ৪	(-) ৮		২০২ +	২৩৬
৩৬৫	(-) ৫২	(-) ৬৫	(-) ৩৪	(-) ৪	(-) ৮	(-) ৯ (মাধ্যমিক)	১৯৩ +	২২৭
৩৬৫	(-) ৫২	(-) ৬৫	(-) ৩৪	(-) ৪	(-) ৮	(-) ১৪ (উচ্চ মাধ্যমিক)	১৮৮ +	২২২

ক) সামর্থ্য ভিত্তিক পঠন-পাঠন ও মূল্যায়ন

যে কোনো সুসভ্য সমাজের জনসম্পদ বিকাশের ক্ষেত্রে প্রথাগত ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই একটি গতিশীল সমাজে প্রথাগত শিক্ষার পরিকল্পনা ও তার প্রয়োগ কৌশল বারবার আলোচিত হয়। সমাজ বিকাশের ধারা অনুসরণ করে তা পরিবর্তিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়। যে ধারা অনুসরণ করে শিখন পরিকল্পনা রচিত ও আলোচিত হয় তাকে সংক্ষেপে নিম্নরূপে বিবৃত করা যায়।



শিক্ষা পরিকল্পনা রচনার রূপরেখা আলোচনার সময় আমরা দেখেছি যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির হওয়ার পরই শিক্ষার বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী পাঠক্রম তৈরি হয়। এরপরই আসে পাঠক্রমে নির্ধারিত বিভিন্ন বিষয়ের জন্য বিস্তারিত পাঠ্যসূচি। আর সেই পাঠ্যসূচি ভিত্তি করেই রচিত হয় বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক, নির্ধারিত হয় বিভিন্ন ব্যবহারিক কর্মকান্ডের বিবরণ। এর পরের ধাপটি হলো "শিক্ষা-প্রয়াস" যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত শ্রেণিতে অনুসরণীয় শিখন -শেখানো পদ্ধতি ও প্রকরণ এবং সেই সঙ্গে ও তার শেষে মূল্যায়ন। " শিক্ষা-প্রয়াসের" মাধ্যমে প্রতিদিন শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের কাছে সুপরিকল্পিত পঠনীয় বিষয়বস্তু এবং করণীয় কর্মকান্ড নিয়ে যাওয়া যেমন জরুরী তেমনি জরুরী তার ফলে শিক্ষার্থীর আচার-আচরণে কাম্য পরিবর্তনের কতটুকু বাস্তবায়িত হল তা অবিরত বা নিরবচ্ছিন্নভাবে যাচাই করে এগিয়ে যাওয়া।

যে কোনো পরিকল্পনার গোড়াতেই যেমন ঈপ্সিত লক্ষ্য স্থির করে কাজ শুরু করতে হয় এবং কাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ঈপ্সিত লক্ষ্যের কতটুকু বাস্তবায়িত হল তার পরিমাপ করে অগ্রসর হতে হয়। এখানেও তাই করতে হবে। তাই সকল "শিক্ষা-প্রয়াসের" শুরুতেই চাই বিষয় ও কর্মকান্ড ভিত্তিক প্রতিটি শ্রেণির প্রতিটি বিষয়ের জন্য পর্বভিত্তিক বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা, যার বিবরণ ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে।

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া -— পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন ঃ

পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী নির্ধারিত শিক্ষার বিভিন্ন অনুষঙ্গ ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত হয় বিভিন্ন পদ্ধতি-প্রকরণের মাধ্যমে। ফলে শিক্ষার্থীর আচার-আচরণে পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য অনুযায়ী কাম্য পরিবর্তন ঘটে। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, যে-কোনো "শিক্ষা প্রয়াস" শুরু হওয়ার আগেই শিক্ষক-শিক্ষিকার চিন্তা-চেতনায় তিনি শিক্ষার্থীদের আচার-আচরণে কিরূপ পরিবর্তন আশা করেন তার একটি স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। অর্থাৎ, শিখন-শেখানো শুরু করার পূর্বেই শিক্ষক মহাশয় কিছু বিশেষ বিশেষ লক্ষ্য স্থির করে কাজ শুরু করবেন। একেই শিক্ষা তত্ত্বের ভাষায় বলা হয় " শিখন-শেখানোর লক্ষ্য"।

"শিখন-শেখানোর লক্ষ্য" - কে নানা ভাবে শ্রেণিবন্ধ করা যায়, যেমন, (১) চূড়ান্ত লক্ষ্য বা সাময়িক লক্ষ্য (২) সাধারণ লক্ষ্য বা বিশেষ লক্ষ্য (৩) বস্তুভিত্তিক লক্ষ্য বা প্রাক্ষোভিক লক্ষ্য (৪) আচার-আচরণগত লক্ষ্য বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যুক্ত লক্ষ্য।

বিভিন্ন শিক্ষা-বিশেষজ্ঞগণ "শিখন-শেখানোর লক্ষ্য"-কে বিভিন্নভাবে শ্রেণিবন্ধ করেছেন। তবে সবচেয়ে কার্যকরী ও স্বাভাবিক শ্রেণিবিন্যাস করেছেন ব্লুম ও তার সঙ্গীগণ। তাঁরা শিক্ষার্থীর বিকাশের বিভিন্ন দিক আলোচনা করে প্রধানত তিনটি ক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট করেছেন। পরে প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বিকাশের ধারা অনুসারে কয়েকটি স্তর নির্দেশ করেছেন। এই সঙ্গে সেই বিভাজনের একটি রূপরেখা দেওয়া হল।

আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানের মতে কোনো একটি ঘটনা বা বিষয়ের মুখোমুখি হলে একজন ব্যক্তি সার্বিকভাবে তাতে সাড়া দেয়, আংশিকভাবে বা ভাগ ভাগ করে নয়। কারণ চিন্তন, মনন, অনুভূতি, কর্মপ্রয়াস এরা কোনো বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া নয়। তাই এদের পৃথক পৃথক করে দেখা ঠিক নয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কাজের সুবিধার জন্য আমাদের বোধ ও আগ্রহ, আচরণ ও নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির মধ্যে পার্থক্য টেনে বিচার বিবেচনা করতে হয়। শিখন-শেখানো পরিকল্পনা করার সময়, বিশেষ করে মূল্যায়ন করার সময় এমনি শ্রেণি-বিন্যাসের প্রয়োজন দেখা দেয়

শিখন-শেখানোর লক্ষ্য

বৌদ্ধিক ক্ষেত্র (Cognative Domain)	প্রাক্ষোভিক ক্ষেত্র (Affective Domain)	চিন্তন কর্ম সমন্বয় ক্ষেত্র (Psychomotor Domain)
(১) জ্ঞান	(১) অনুভূতি	(১) তাৎক্ষণিক অনুকরণ
(২) বোধ	(২) আগ্রহ	(২) কলাকৌশলগত প্রয়াস
(৩) প্রয়োগ	(৩) কর্মোদ্যম	(৩) সুনিয়ন্ত্রিত সমন্বয়
(৪) দক্ষতা	(৪) মূল্যবোধ	(৪) স্বভাবজ দক্ষতা

পরাধীনতার যুগে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির স্বার্থে এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসক গোষ্ঠীর উদ্যোগে প্রচলিত যে শিক্ষা ব্যবস্থা আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি, স্বাধীনতার পর অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় কাল হলেও আমরা তাকে আমাদের জাতীয় জীবনের আশা-আকাঙ্খার সঙ্গে যুক্ত করে একটি প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করতে পারিনি। করণিক, আমলা তৈরির এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়। ফলে শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক, বৌদ্ধিক ও প্রাক্ষোভিক সামর্থ্যের সার্বিক ও সুষম বিকাশের বিষয়টি অবহেলিত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার নবায়নের জন্য যে দলিল (পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি) তৈরি হয়েছিল তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সেখানে শিক্ষার্থীর দেহ, জ্ঞান, কর্ম ও অনুভূতির সুষম বিকাশের কথা মাথায় রেখে শিক্ষাক্রমটিকে প্রধানত চারটি ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছিল যথা (১) খেলাধূলা ও শরীরচর্চা (২) উৎপাদনশীল ও সৃজনশীল কাজ (৩) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ (৪) পঠন-পাঠন নির্ভর কাজ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সম্প্রতি নবীকৃত ঐ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি (কৃত্যসূচি)-কে সামান্য সংশোধিত আকারে বিষয়গুলিকে এইভাবে রাখা হয়েছে ঃ

(১) স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ (২) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক, সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজ এবং (৩) পঠন-পাঠন নির্ভর কাজ।

বিজ্ঞান সম্মত শিখন-শেখানো ও মূল্যায়নের ভিত্তি হিসাবে সামর্থ্যভিত্তিক একক বিশ্লেষণের গুরুত্ব ঃ

"শিক্ষা-প্রয়াস "-এর সার্থকতার জন্য প্রতিটি বিষয় ও কর্মকান্ড অনুশীলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষক/শিক্ষিকার স্পষ্ট ধারণা থাকা খুবই জরুরী। একই সঙ্গে শিক্ষক/ শিক্ষিকাকে এও জানতে হবে যে, একটি বিষয় বা কর্মকান্ডের পাঠ্যসূচির বিভিন্ন একক, উপ-একক অনুশীলনের মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয় ও কর্মকান্ড অনুশীলনের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের বিভিন্ন উপাদান কিভাবে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হয়। কারণ-বাস্তবে একটি বিষয় বা কর্মকান্ডের পাঠ্যসূচিকে পর্যায়ক্রমে একক, উপ-এককে বিভক্ত করে দৈনন্দিন অনুশীলনের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের নিকট তা উপস্থাপিত করা হয়।

"শিক্ষা-প্রয়াস"-এর ফলে বৌদ্ধিক বা প্রাক্ষোভিক ও চিন্তন- কর্ম সমন্বয় ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বিকাশ একই সঙ্গে এগিয়ে চলে। অবশ্য এই এগিয়ে চালার ধারা নির্ভর করবে শিক্ষার্থীর পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার উপর। একক, উপ-এককের দৈনন্দিন অনুশীলনের মধ্য দিয়েও শিক্ষার্থীর ক্রমবিকাশ স্বভাবতই এই ধারা ধরেই এগিয়ে চলে। তাই কোনো একটি বিশেষ একক বা উপ-একক অনুশীলনের ফলে শিক্ষার সমস্ত ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সামর্থ্যের কোন কোনটি কী কী ক্রমধারা অনুসরণ করে বাস্তবায়িত হবে তার সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা যদি শিক্ষক/শিক্ষিকা আগে থেকেই ভেবে চিহ্নিত করে রাখতে পারেন তবে প্রাত্যহিক শ্রেণি অনুশীলনের কাজটি সুশৃঙ্খল, সদর্থক ও প্রকৃত অর্থে কার্যকরী হবে। নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও এর বিরাট গুরুত্ব রয়েছে।

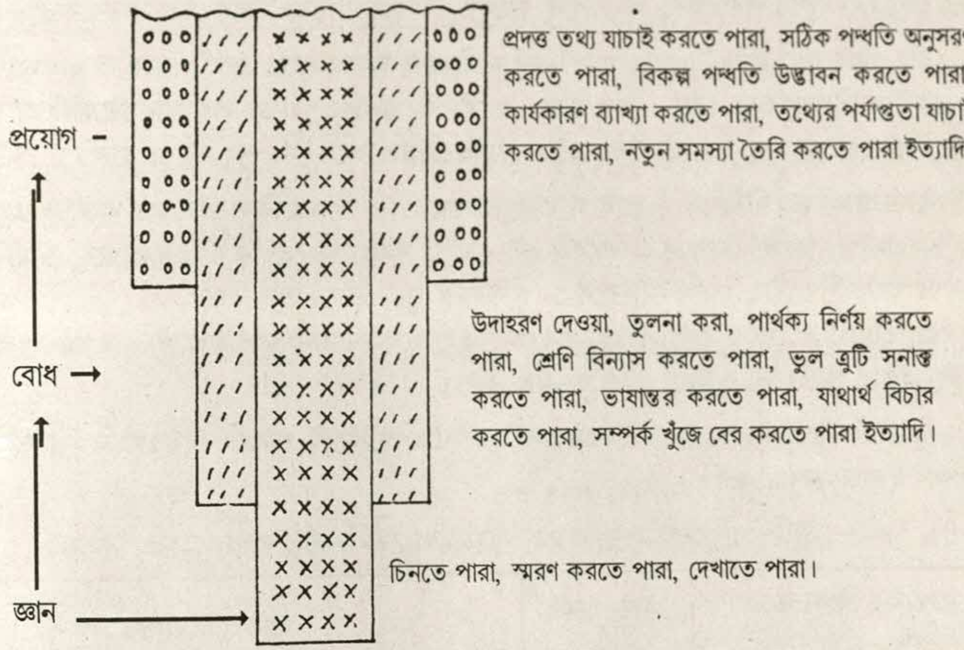
উপরিউক্ত বিশ্লেষণটি শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। তবে পঠন-পাঠন নির্ভর কাজ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের সময় বাড়তি কিছু বিষয় সম্পর্কে লক্ষ রাখতে হয়। একটু পরেই আমরা তা দেখতে পাবো।

পঠন-পাঠন নির্ভর কাজের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশের ধারাটি খুব সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়, এবং তা হল,

জ্ঞান ⟶ বোধ ⟶ প্রয়োগ

অর্থাৎ পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী প্রথমে সেই বিষয় সম্পর্কিত কিছু কিছু শব্দ, সংজ্ঞা ও ধারণা সম্পর্কে প্রাথমিক পরিচিতি বা "জ্ঞান" পায়। পরে সেই প্রাথমিক "জ্ঞান"-এর উপর দাঁড়িয়ে আরও চর্চার ফলে সেই বিষয়ের নানা সূত্র ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে পারে। একেই বলে সামর্থ্যের "বোধ" পর্যায়। পরে জ্ঞান ও বোধের উপর ভিত্তি করে সেই বিষয়ের নতুন নতুন পরিস্থিতি বুঝে তার সমাধান করতে সক্ষম হয়। এই পর্যায়টি হলো "প্রয়োগ" সামর্থ্যের পর্যায়।

বৌদ্ধিক ক্ষেত্রের বিষয়টি চিহ্নিত করা যায় অনেকটা এইভাবে ঃ



এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে বৌদ্ধিক স্তরের ক্ষেত্রে প্রয়োগই সর্বোচ্চ সামর্থ্য হিসেবে গণ্য হতে পারে। ব্যাপক অর্থে দক্ষতা মূলত চিন্তন-কর্ম-সমন্বয় ক্ষেত্রের একটি উচ্চ পর্যায়ের সামর্থ্য, তবে বৌদ্ধিক স্তরে সাধারণত যাচাইযোগ্য বা পরিমাপযোগ্য সামর্থ্য হিসেবে দক্ষতার বিষয়টি খুবই সীমিত। নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের অন্তর্গত চিত্ররূপ উপস্থাপন (ঠিকভাবে আঁকতে পারা), সারণি প্রস্তুতি, লেখ-চিত্র (গ্রাফ) ঠিকভাবে আঁকা, মানচিত্র আঁকা বা মানচিত্রে নির্দেশমতো স্থান চিহ্নিত করতে পারা ইত্যাদি বৌদ্ধিক ক্ষেত্রের দক্ষতা সামর্থ্য হিসেবে গণ্য হতে পারে।

উপরের চিত্র থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শিখন প্রক্রিয়ার মূল কাঠামোটি হলো, "জ্ঞান"। আর একে ঘিরেই বোধ ও প্রয়োগ সামর্থ্যের বিকাশ ঘটে। আবার জ্ঞানের চেয়ে "বোধ" উন্নত পর্যায়ের সামর্থ্য এবং " প্রয়োগ" বোধের চেয়েও উন্নততর পর্যায়ের সামর্থ্য।

এই প্রসঙ্গে চিত্রের ডানপাশে উল্লিখিত তথ্যগুলি লক্ষণীয়। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া চলাকালে শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশের কোন পর্যায়ে তার বাস্তব কর্মসামর্থ্য বা অভিব্যক্তি কীরূপ হবে এই তথ্যগুলি তা প্রকাশ করছে। শ্রেণি অনুশীলনের সময় শিক্ষক কীভাবে তা কাজে লাগাবেন তার বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে পুনরায় একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন। পঠন-পাঠন নির্ভর কাজ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য বিকাশের বিশ্লেষণের সময় আগ্রহ ,কর্মোদ্যম, কলাকৌশলগত প্রয়াস, সুনিয়ন্ত্রিত সমন্বয়, স্বভাবদ্ধ দক্ষতা, মূল্যবোধ প্রভৃতি সামর্থ্যের কথা মনে রাখতে হবে। এইসব ক্ষেত্রে অনুশীলন পরিচালনা ও মূল্যায়নের সময় উপরিউক্ত সামর্থ্যের কথা বিবেচনা করতে হবে। বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে যেমন কাগজ-কলম নিয়ে

মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামর্থ্যের বিকাশ সহজেই যাচাই করা যায়, এসব ক্ষেত্রে তা করা যায় না। তাই এইসব ক্ষেত্রে দৈনন্দিন পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান, রিপোর্ট, আত্মমূল্যায়নের উপর বেশি নির্ভর করতে হয়।

বার বারই বলা হচ্ছে "শিক্ষা-প্রয়াস"-এর সার্থকতার জন্য কোনো একটি বিষয় বা কর্মকান্ডের একক/উপ-একক অনুশীলনের ফলে জ্ঞান-বোধ, আগ্রহ-কর্মোদ্যম, স্বভাবজ দক্ষতা-মূল্যবোধ ইত্যাদি সামর্থ্যের কোনটি কতটুকু বিকশিত হবে তার একটি স্পষ্ট ধারণা পূর্বেই চিহ্নিত করে কাজ শুরু করতে হবে।

এখন প্রশ্ন হলো নির্ধারিত বা কাম্য সামর্থ্যগুলি বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা বা হলেও কতটুকু হয়েছে তা কী করে নির্ধারণ ও/ বা পরিমাপ করা যাবে ? এই সমস্যা সমাধানের প্রধান হাতিয়ার হবে, নির্ধারিত সামর্থ্য বিকাশের ফলে শিক্ষার্থীর আচার-আচরণে যে অভিব্যক্তি ফুটে উঠবে তার বাস্তব লক্ষণগুলি চিহ্নিত করে রাখা এবং পরে তাৎক্ষণিক থেকে সামগ্রিক মূল্যায়ন (লিখিত/পর্যবেক্ষণ/অনুসন্ধান ইত্যাদি)-এর সময় সেই লক্ষণগুলি কতটুকু প্রকাশ পাচ্ছে তা মিলিয়ে দেখে পরিমাপ করা।

নীচে শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্যের ক্ষেত্রের পরিপ্রেক্ষিতে অভিব্যক্তি জ্ঞাপক কয়েকটি লক্ষণ সারণি আকারে তালিকাবন্ধ করে দেওয়া হল।

বৌদ্ধিক ক্ষেত্র (ভাষাসহ পঠন-পাঠন নির্ভর জ্ঞানমূলক বিষয়)

মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	কাম্য সামর্থ্য	অভিব্যক্তি জ্ঞাপক লক্ষণ
নীচে মাধ্যমিক স্তরের কয়েকটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তালিকাবন্ধ করা হলো। আলোচনার মাধ্যমে তা সমৃদ্ধতর করা যেতে পারে। ১। জাতি ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় স্ত্রী-পুরুষ ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সবার জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ সুনিশ্চিত করা। ২। শিক্ষায় গণতন্ত্রীকরণের নীতির সফল রূপায়নের স্বার্থে একটি স্তর পর্যন্ত সমমানের শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করা।	জ্ঞানমূলক সামর্থ্য	ভাষাসহ কোন্ একটি জ্ঞানমূলক বিষয়ের একটি একক/ উপ-একক অনুশীলনের ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে জ্ঞানমূলক সামর্থ্যের বিকাশ ঘটলে শিক্ষার্থী ঃ ১। ঐ পাঠের অন্তর্গত বিভিন্ন পদ, প্রতীক, স্বতঃসিদ্ধ, সূত্র, সংজ্ঞা, তথ্য, প্রক্রিয়ার নাম ইত্যাদি স্মরণ করতে পারবে। ২। ঐ পাঠের অন্তর্গত বিভিন্ন পদ, প্রতীক, স্বতঃসিদ্ধ, সূত্র, সংজ্ঞা, তথ্য, প্রক্রিয়া ও প্রণালী ইত্যাদি দেখে চিনতে পারবে। বিঃদ্রঃ মনে রাখতে হবে যে, "জ্ঞান"-কে এখানে খুবই সীমাবদ্ধ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কোনো একজন শিক্ষার্থী যদি পাঠের অন্তর্গত কোনো একটি জিনিস কেবল স্মরণ করতে পারে, বা আগে দেখা কোনো একটি জিনিস দেখে চিনতে পারে, তবেই ধরে নিতে হবে যে তার এই জিনিস সম্পর্কে জ্ঞান হয়েছে।

বৌদ্ধিক ক্ষেত্র (ভাষাসহ পঠন-পাঠন নির্ভর জ্ঞানমূলক বিষয়)

মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	কাম্য সামর্থ্য	অভিব্যক্তি জ্ঞাপক লক্ষণ
৩।সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, সংকীর্ণতা, কুসংস্কার মুক্ত, ধর্ম নিরপেক্ষ, উদার, যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক মানসিকতার উন্মেষ ঘটানো। ৪। দৈহিক, মানসিক, বৌদ্ধিক ও প্রাক্ষোভিক গুণাবলীর সুষম বিকাশ ঘটানো। ৫। শিক্ষা-সংস্কৃতির সুষম বিকাশেব স্বার্থে আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ঘটানো। সংবিধান স্বীকৃত আঞ্চলিক ভাষাকে সেই অঞ্চলের উচ্চতম স্তর পর্যন্ত শিক্ষার বাহন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা। ৬। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সুষম বিকাশের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মনোভাব গড়ে তুলে জাতীয় সংহতি দৃঢ়তর করা। ৭। সামাজিক উৎপাদনমূলক কর্মকান্ড ও সমাজ সেবামূলক কাজের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে শ্রম ও শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদা	বোধমূলক সামর্থ্য	ভাষাসহ কোনো একটি জ্ঞানমূলক বিষয়ের একটি একক/ উপ-একক অনুশীলনের ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে বোধমূলক সামর্থ্যের বিকাশ ঘটলে শিক্ষার্থী ঃ ১। ঐ পাঠের অন্তর্গত পদ, সূত্র, সংজ্ঞা ইত্যাদি আলাদা করে সনাক্ত করতে পারবে। ২। ঐ পাঠের অন্তর্গত পদ, সূত্র, সংজ্ঞা ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত উদাহরণ দিতে পারবে। ৩। ঐ পাঠের অন্তর্গত বিভিন্ন ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪। ঐ পাঠের অন্তর্গত ঘটনা ও সমস্যাকে প্রয়োজনে ভাষান্তর করতে পারবে। ৫। ঐ পাঠের অন্তর্গত কোনো সংজ্ঞা, সূত্র, প্রক্রিয়া, প্রণালী ইত্যাদি ত্রুটিপূর্ণভাবে উপস্থাপিত হলে তাতে ভূল চিহ্নিত করতে পারবে। ৬। ঐ পাঠের অন্তর্গত কোনো সংজ্ঞা, সূত্র, প্রক্রিয়া ইত্যাদি ত্রুটিপূর্ণভাবে উপস্থাপিত হলে তাতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে পারবে। ৭। প্রদত্ত তথ্যাদির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে এবং সম্পর্কিত বিষয়গুলির মধ্যে তুলনা করতে পারবে। ৮। প্রদত্ত ঘটনা, সমস্যা ও তথ্যাদির মধ্যকার জটিলতা সরল করতে পারবে এবং তা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করতে পারবে। ৯। ঐ পাঠের অন্তর্গত বিভিন্ন পদ, সূত্র, সংজ্ঞা, তথ্য, ধারণা, প্রক্রিয়া ও প্রণালী ইত্যাদির মধ্যে তুলনা করতে পারবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	কাম্য সামর্থ্য	অভিব্যক্তি জ্ঞাপক লক্ষণ
বোধের বিকাশ ঘটানো এবং সামাজিক দায়িত্ব বোধের উন্মেষ ঘটানো। ৮। জাতীয় উন্নয়নের প্রয়োজন এবং বিভিন্ন প্রকল্পের সফল রূপায়নের পরি-প্রেক্ষিতে মানব-সম্পদের বিকাশ ঘটানো। ৯। শিক্ষার্থীকে শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক নীতির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সক্রিয় ও সফল নাগরিকের জীবন যাপনে অভ্যস্ত করে তোলা।	বোধমূলক সামর্থ্য	১০। নিকট সম্পর্কযুক্ত ঘটনা ও তথ্যাদির মধ্যকার পার্থক্য চিহ্নিত করতে পারবে। ১১। প্রদত্ত তথ্যাবলী বিচার-বিশ্লেষণ করে তাদের শ্রেণিবন্ধ করতে পারবে। ১২। প্রদত্ত সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে আঁচ করতে পারবে। ১৩। প্রদত্ত সিদ্ধান্তকে যাচাই করতে পারবে। ১৪। প্রদত্ত সারণি, তালিকা, চিত্র, রূপরেখা ইত্যাদি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১৫। ঐ পাঠের অন্তর্গত সমস্যাবলী সমাধান করতে পারবে। ১৬। ঐ পাঠের অন্তর্গত বিভিন্ন ধারণা, ঘটনা ও সমস্যাকে নিজের ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে। বিঃ দ্রঃ "বোধ" জ্ঞানের চেয়ে উন্নততর সামর্থ্য। তাই বোধ-সামর্থ্যের যাচাই করার সময় উপরিউক্ত লক্ষণগুলি খুব ভাবভাবে মিলিয়ে দেখতে হবে। ভাষাসহ কোন একটি জ্ঞানমূলক বিষয়ের একটি একক/উপ-একক অনুশীলনের ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রয়াগমূলক সামথ্যের বিকাশ ঘটলে
	প্রয়োগমূলক সামর্থ্য	শিক্ষার্থী ঃ ১। ওই পাঠের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করতে পারবে। ২। প্রদত্ত তথ্যাবলীর মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	কাম্য সামর্থ্য	অভিব্যক্তি জ্ঞাপক লক্ষণ
		৩। কোনো একটি সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য বিভিন্ন পদ্ধতি চিহ্নিত করতে পারবে। ৪। প্রদত্ত সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে উপযোগী পদ্ধতিটি নির্বাচন করতে পারবে। ৫। কোন একটি সমস্যাকে সম্ভাব্য বিকল্প পদ্ধতিতে সমাধান করতে পারবে। ৬। পর্যাপ্ত যুক্তি (অবরোহ) সহকারে কোনো একটি সূত্র, সংজ্ঞা, ধারণা, প্রক্রিয়া ও প্রণালী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।
	দক্ষতামূলক সামর্থ্য	শিক্ষার্থী ১। ওই পাঠের সঙ্গে সম্পর্কিত সহজ সরল ছবি আঁকতে পারবে এবং ছবিটিতে নির্দেশ অনুযায়ী অংশ বা অঙ্গ চিহ্নিত করতে পারবে। ২। সহজ সরল চিত্র (গ্রাফ) আঁকতে পারবে। ৩। মানচিত্র আঁকতে পারবে বা মানচিত্রে নির্দিষ্ট স্থান চিহ্নিত করতে পারবে।

পঠন-পাঠন নির্ভর বিষয়ের ক্ষেত্রে সামর্থ্য ভিত্তিক একক বিশ্লেষণের রূপরেখা ঃ

বিজ্ঞান সম্মত শিখন-শেখানো ও মূল্যায়নের ভিত্তি হিসাবে সামর্থ্য-ভিত্তিক একক বিশ্লেষণের গুরুত্ব আলোচিত হয়েছে। পঠন-পাঠন নির্ভর কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সামর্থ্য বিকাশের ফলে শিক্ষার্থীর আচার-আচরণে যে অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় তারও তালিকা তৈরি। এবার দেখা যাক, পঠন-পাঠন নির্ভর বিষয়ে কী করে সামর্থ্য ভিত্তিক একক বিশ্লেষণ করা যায়।

প্রতিটি পাঠ-একক ও তার উপ-এককগুলি নিয়ে সামর্থ্যভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য যে যে বিষয়গুলির উপর নজর দিতে হবে সে সম্বন্ধে নীচে একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেওয়া হল। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ পরস্পর আলোচনার ভিত্তিতে তাকে সমৃদ্ধতর করবেন। প্রথমে পঠন-পাঠন নির্ভর কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে। পরে অন্যান্য ক্ষেত্র সম্বন্ধেও আলোচনা করা যাবে।

(১) প্রথমেই তিনটি পর্বে বিভক্ত বাৎসরিক সারণিতে শ্রেণি ও বিষয় ভিত্তিক যে বিস্তারিত সময় সূচি তৈরি করা হয়েছে তা নিয়ে কাজ শুরু করতে হবে। বিস্তারিত সময় সূচি তৈরি করার সময় বিষয় পাঠ্যসূচি, পাঠ্য-পুস্তক, করণীয় কর্মকান্ড ইত্যাদি নিয়ে যেমন আলোচনা করা হয়েছে, তেমনি কোনো একটি উপ-একক পাঠের জন্য কত পিরিয়ড সময় দিতে হবে তাও ঠিক করা হয়েছে। তাই বিস্তারিত সময়সূচি নিয়ে কাজ করা যেতে পারে। একটি বিষয় লক্ষ রাখতে হবে যে, সামর্থ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ করার সময় যদি দেখা যায় যে, পূর্বতন সময়সূচি বিভাজনে কোনো প্রকার ত্রুটি বা অসঙ্গতি রয়েছে তবে এই স্তরে তা সংশোধন করে নেওয়া যেতে পারে।

(২) এবার ঠিক করতে হবে, এই বিশেষ একক/উপ-একক পাঠের পূর্বপ্রস্তুতি হিসাবে শিক্ষার্থীর কী কী পূর্বজ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

(৩) এক একটি উপ-একক অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগ ও দক্ষতামূলক সামর্থ্যের কী কী বিকাশ ঘটবে তা তালিকা বদ্ধ করতে হবে।

(৪) "শিক্ষা-প্রয়াসের" ফলে শিক্ষার্থীর সামর্থ্যের বিকাশ তার আচার-আচরণ-কর্মপ্রয়াসে বিশেষ বিশেষ পরিবর্তন হিসাবে প্রকাশ পায়। সেই পরিবর্তনকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করার জন্য উপরে বর্ণিত "অভিব্যক্তি জ্ঞাপক লক্ষণ" গুলি উল্লেখ করতে হবে। তবেই সামর্থ্যভিত্তিক বিশ্লেষণকে শিখন-শেখানো ও মূল্যায়ন উভয় কাজেই সার্থকভাবে প্রয়োগ করা যাবে।

সাধারণত যে বিশেষ ছকে সামর্থ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ করা যেতে পারে তার একটি সম্ভাব্য নমুনা নীচে দেওয়া হলঃ

শ্রেণি .... বিষয় .... একক ....

উপ-এককের বিবরণ	পিরিয়ড সংখ্যা	পূর্বার্জিত জ্ঞান	কাম্য-সামর্থ্য সমূহ			
			জ্ঞানমূলক	বোধমূলক	প্রয়োগমূলক	দক্ষতামূলক

বর্তমান "প্রশিক্ষণ সহায়িকা" পুস্তকে প্রতিটি বিষয়ের কোনো একটি শ্রেণির পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত কোনো একটি পাঠ একক নিয়ে তার সামর্থ্যভিত্তিক বিশ্লেষণের নমুনা দেওয়া হয়েছে। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ নিজ নিজ বিষয়ের যে কোনো একটি বা দুটি শ্রেণির অন্তত একটি করে পাঠ-একক নিয়ে তার সামর্থ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ করে কৃৎ-কৌশলটি এমনভাবে আয়ত্ব করে নিতে চেষ্টা করবেন যেন পরে বিদ্যালয়ে ফিরে গিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টাটি বরাবর চালিয়ে যেতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় আবারো স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সামর্থ্যভিত্তিক বিশ্লেষণের গুরুত্ব। মূল্যায়ন হল সামর্থ্যভিত্তিক যে-সব লক্ষ্য সামনে রেখে অনুশীলন চলছিল, তা চলা কালে বা শেষ হলে শিক্ষার্থীর আচার-আচরণে তা কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে বা হয়নি তার পরিমাপ করা এবং তার ভিত্তিতে যতটুকু সাফল্য এখনো বাকি আছে তার হিসাব নিয়ে সংশোধনী পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে কাম্য-সামর্থ্যের পর্যায়ে তুলে আনা সম্ভব করে তোলা।

প্রধানতই পঠন-পাঠন নির্ভর নয় এমন দুটি ক্ষেত্রের সামর্থ্যভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় অভিব্যক্তি জ্ঞাপক লক্ষণের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা নীচে দেওয়া হল — মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমে তারা এখনি অন্তর্ভূক্ত। তা ছাড়া শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, বৌদ্ধিক ও প্রাক্ষোভিক বিকাশ যেখানে কাম্য সেখানে এদের গুরুত্ব আর অবহেলা করা যায় না।

ক্ষেত্র ঃ স্বাস্থ্য ও শরীর শিক্ষা

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	কাম্য সামর্থ্য	অভিব্যক্তি জ্ঞাপক লক্ষণ
(ক) খেলাধূলা ও শরীর চর্চার মাধ্যমে দেহ ও মনের সুসংবন্ধ বিকাশ।	(ক) উপলব্ধি ও অনুকরণ	১। শিক্ষার্থী নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি জানবে এবং তাদের কার্যকারিতা জানবে। ২। শিক্ষার্থী বিভিন্ন অঙ্গ-সঞ্চালন অনুকরণ করতে পারবে। ৩। শিক্ষার্থী কোনো খেলা/ শরীর চর্চার জন্য কী কী উপাদান প্রয়োজন তা জানবে এবং প্রয়োজনে তা বাছাই করে নিতে পারবে। ৪। শিক্ষার্থী খেলা/শরীর চর্চার নিয়মাবলী জানবে এবং তা মেনে চলবে।
(খ) সুশৃঙ্খল ও সহযোগিতা-মূলক জীবন যাপন	(খ) আগ্রহ সহযোগিতা ও নেতৃত্ব।	১। শিক্ষার্থী সাগ্রহে খেলাধূলা/শরীর চর্চা সংক্রান্ত কাজে অংশগ্রহণ করবে। ২। শিক্ষার্থী তার সহযোগীদের সঙ্গে মিলেমিশে খেলাধূলা/ শরীরচর্চা/ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কাজ করবে। ৩। শিক্ষার্থী নিজের ব্যক্তিগত কৃতিত্বকে জাহির করবে না। ৪। শিক্ষার্থী প্রয়োজনে নেতৃত্ব দিতে পারবে।
(গ) নেতৃত্বের বিকাশ।	(গ) পার-দর্শিতা ও উদ্ভাবনীশক্তি।	১। শিক্ষার্থীর খেলাধূলা/শরীর চর্চায় পারদর্শিতার লক্ষণ ফুটে উঠবে। ২। খেলাধূলা/শরীর চর্চার অঙ্গানে ঐ সংক্রান্ত কোন সমস্যা দেখা দিলে শিক্ষার্থী তার মুখোমুখি হতে পিছপা হবে না। ৩। ঐ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে বিকল্প পন্থা গ্রহণ করতে পারবে।
(ঘ) ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সু-অভ্যাস গঠন।	(ঘ) মূল্যবোধ ও স্বভাবজ আচরণ	১। শিক্ষার্থী স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করে খেলাধূলা/শরীর চর্চায় অংশ নেবে। ২। শিক্ষার্থী নিজের জীবন চর্চা দ্বারা সতীর্থদের প্রভাবিত করতে পারবে।
(ঙ) স্বাস্থ্য ও শরীর চর্চার মাধ্যমে নান্দনিক চেতনার বিকাশ।		৩। শিক্ষার্থী খেলাধূলা/শরীর চর্চার মধ্যে যেমন সাংস্কৃতিক সুস্থতার উপাদান খুঁজে পাবে, তেমনি খেলাধূলা/শরীর চর্চার মধ্যে নান্দনিক উপাদান সংযোজন করবে। ৪। শিক্ষার্থী তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক চেতনা-সঞ্জাত নিরাপত্তামূলক আচার-আচরণ করতে অভ্যস্থ হবে এবং তার সতীর্থদের মধ্যে তা সঞ্চালিত করবে। ৫। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার পরিচয় রাখবে, সাধারণ স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলবে, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতনতার পরিচয় দেবে।

ক্ষেত্র ঃ কর্মশিক্ষা

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	কাম্য সামর্থ্য	অভিব্যক্তি জ্ঞাপক লক্ষণ
(ক) পরিবেশে কাজের জগতের সঙ্গে পরিচিতি। (খ) কাজের মধ্য দিয়ে আত্ম-প্রত্যয় ও দায়িত্ব বোধের বিকাশ। (গ) শ্রম ও শ্রমকারী মানুষের প্রতি সম্ভ্রম-বোধ।	(ক) উপলব্ধি ও অনুকরণ	১। শিক্ষার্থী তার পরিবেশে অনুষ্ঠিত উৎপাদনশীল কাজগুলির কথা স্মরণ করতে পারবে। ২। শিক্ষার্থী তার দেখা কাজগুলির পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু বলতে পারবে। ৩। শিক্ষার্থী সেইসব কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি চিনতে পারবে এবং কোনটি কি কাজে ব্যবহৃত হয় বলতে পারবে। ৪। কোন কাজটি সমাজের কী উপকারে আসে শিক্ষার্থী তা বলতে পারবে।
(ঘ) সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে শ্রম ও শ্রমকারী মানুষের সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি করা। (ঙ) পরিকল্পনা মাফিক কাজ করার অভ্যাস।	(খ) কর্মোদ্যম, সহযোগিতা ও নেতৃত্ব	১। শিক্ষার্থী নিজের ইচ্ছায় নিজস্ব উদ্যোগে কাজটি করবে। ২। শিক্ষার্থী প্রয়োজন ক্ষেত্রে তার সতীর্থদের সঙ্গে সহযোগিতা বজায় রেখে কাজ করতে পারবে। ৩। শিক্ষার্থী অহেতুক নিজের কৃতিত্ব জাহির করবে না। ৪। শিক্ষার্থী প্রয়োজনে নেতৃত্ব দিতে পারবে। ৫। শিক্ষার্থী কাজের পদ্ধতিগত ক্রম বজায় রেখে কাজ করবে।
(চ) উৎপাদনশীল কাজ ও গণতান্ত্রিক বন্টন ব্যবস্থার সামাজিক গুরুত্ব উপলব্ধি করা। (ছ) সম্মিলিত কাজের মধ্য দিয়ে নেতৃত্ব ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানো।	(গ) পারদর্শিতা ও উদ্ভাবনী শক্তি।	১। শিক্ষার্থী ক্রমান্বয়ে কাজে পারদর্শিতা অর্জন করবে। ২। শিক্ষার্থী কাজের মধ্যে উদ্ভূত সমস্যা নিজস্ব উদ্যোগে সমাধান করতে পারবে। ৩। শিক্ষার্থী প্রয়োজনে বিকল্প পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারবে। ৪। শিক্ষার্থী আত্মপ্রত্যয় নিয়ে নতুন কাজে হাত দিতে উৎসাহ দেখাবে। ৫। শিক্ষার্থী কাজের সময়সূচি রক্ষা করে কাজ শেষ করতে চেষ্টা করবে।
(জ) জীবনব্যাপী শিক্ষা ও সংস্কৃতিক কর্মকান্ডের ভিত্তি গড়ে তোলা। (ঝ) বিদ্যালয় জীবন আনন্দময় ও অর্থবহ করে তোলা। (ঞ) আয়াসসাধ্য কাজে অভ্যস্থ হওয়া।	(ঘ) কাজকে নিজের সাংস্কৃতিক জীবনের অংশ করে সুস্থ মূল্যবোধ গড়ে তোলা।	১। শিক্ষার্থী তার আচার-আচরণে শ্রমকারী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। ২। শিক্ষার্থী স্বাভাবিকভাবে শ্রমের প্রতি আগ্রহশীল হবে। ৩। শিক্ষার্থী শ্রমসাধ্য কাজে এগিয়ে আসতে কুন্ঠাবোধ করবে না। ৪। কাজের মধ্যে যে স্বাভাবিক আনন্দ বোধ রয়েছে শিক্ষার্থীর আচারণে তা প্রকাশ পাবে। ৫। কাজের মধ্য দিয়ে নবতর সৃজনের আনন্দ উপলব্ধি করবে। ৬। শিক্ষার্থী করণীয় কাজটিকে কীভাবে সুন্দর করে করা যায় তার জন্য চেষ্টা করবে।

পঠন পাঠন নির্ভর নয় এমন দুটি বিষয়ের ক্ষেত্রে সামর্থ্যভিত্তিক একক বিশ্লেষণের জন্য অভিব্যক্তি জ্ঞাপক লক্ষণের যে তালিকা উপরে দেওয়া হয়েছে তাকে সামনে রেখে সেই দুটি ক্ষেত্রের একক/উপ-একককে সামর্থ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ করে নিলে একদিকে যেমন দৈনন্দিন অনুশীলন সদর্থকভাবে পরিচালনা করা যাবে, অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট অভিব্যক্তি জ্ঞাপক লক্ষণগুলি সামনে রেখে মূল্যায়ন কালীন পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান, যাচাই ইত্যাদির কাজ সহজ হবে।

সেই কাজের জন্য অবশ্য পূর্বে দেওয়া ছকটিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে নিতে হবে। নীচে তার একটি নমুনা দেওয়া হলো,

শ্রেণি .... বিষয় .... একক ....

উপ-এককের বিবরণ	পিরিয়ড সংখ্যা	পূর্বার্জিত জ্ঞান	কাম্য-সামর্থ্য সমূহ			
			উপলব্ধি/অনু-করণ অনুসন্ধিৎসা	আগ্রহ/কর্মোদ্যম/ সহযোগিতা / নেতৃত্ব	পারদর্শিতা/উদ্ভা-বনী শক্তি	স্বভাবজ আচরণ/ মূল্যবোধ

ভ্রভ্রভ্র

(খ) শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যাধিক্য জনিত সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য কৃৎকৌশল

সকলের জন্য শিক্ষার ন্যূনতম পরিকাঠামোকে অগ্রাধিকার দেবার শুভ ইচ্ছা ঘোষিত হলেও দরিদ্রতম অংশের শিশুদের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি এখনও। রাষ্ট্র শিক্ষাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়নি বলেই পরিকাঠামোর তুলনায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে একই শ্রেণিকক্ষে শতাধিক শিক্ষার্থীর উপযোগী অংশগ্রহণমূলক শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন প্রক্রিয়ার কৃৎকৌশল নিয়ে চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে। সেই সঙ্গে ন্যূনতম উপযুক্ত পরিকাঠামোর জন্য রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গিকে ইতিবাচক করার জন্য সংগঠিত উদ্যোগকেও জোরদার করার ধারাবাহিক কর্মপ্রচেষ্টাকে জোরদার করতে হবে।

শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষক-এর ভূমিকা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেটা কখনই শিক্ষককেন্দ্রিক 'শিক্ষাদান'-এর একমুখি প্রক্রিয়া নয়। শ্রেণি শিখনে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী পিরিয়ডের অধিকাংশ সময় তাঁর জ্ঞান উজাড় করে দেবেন- আর শিক্ষার্থীরা নিষ্ক্রিয় শ্রোতার ভূমিকা পালন করে তাদের মাথায় জ্ঞান জমা করবে- এই পদ্ধতি কখনওই শিখনের উপযোগী হ'তে পারে না। এই পন্থায় সমস্ত শিখন ব্যাপারটি যান্ত্রিক, নিষ্প্রাণ ও বিরক্তিকর হতে বাধ্য। সেইজন্যই শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক অংশগ্রহণমূলক শিখন প্রক্রিয়াকে শ্রেণিশিখনের পক্ষে অপরিহার্য করে তুলতে হবে।

এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষক পাঠ্য বিষয়বস্তুর একক ভাগ করে নিয়ে পাঠএকক উপস্থাপনার ও দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সময় নেবেন। তারপর শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে সর্বাধিক পাঁচটি দলে ভাগ ক'রে দেবেন। দলগত বিভাজনের ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষের সমস্ত শিক্ষার্থীর শিখনগত অবস্থান সম্বন্ধে প্রারম্ভিক ধারণা থাকতে হবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্ষ শুরুর প্রথম মাসে শ্রেণিকক্ষে প্রতিদিন দশজন শিক্ষার্থীর জন্য দুই মিনিট ক'রে মোট কুড়ি মিনিট সময় দেবেন শিক্ষক। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তাদের শিখনগত অবস্থান সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা পেতে চেষ্টা করবেন। এইভাবে পনেরোদিনের মধ্যে শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থীদের সম্বন্ধে প্রারম্ভিক 'তটরেখা সমীক্ষা'-র কাজ প্রাথমিক ভাবে সম্পন্ন হ'তে পারে। আরো সাত-আট দিন শিক্ষার্থীদের অবস্থান সম্বন্ধে ধারণা যাচাই করার জন্য শিক্ষক সময় নিতে পারেন। এই ধারণাকে ভিত্তি করে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাবর্ষের প্রথমপর্বের জন্য সমস্ত ধরনের শিক্ষার্থী সমন্বিত দল বিভাজন করা সম্ভব হ'তে পারে এবং তাদের নির্দিষ্ট বসার জায়গা ঠিক করা যেতে পারে।

বিষয়বস্তুর উপস্থাপনার পরে শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা শুরু করবে। শিক্ষক বিভাজিত দলগুলিতে গিয়ে আলোচনার গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করবেন। উপস্থাপিত বিষয়বস্তু নিয়ে প্রথমদিন আলোচনা, দ্বিতীয়দিন দলগত আলোচনার উপস্থাপনা ও সামগ্রিক বিষয়বস্তুর উপর প্রশ্নোত্তর ও তৃতীয়দিন দুর্বলতার অংশগুলি চিহ্নিত ক'রে সংশোধনী পাঠের সাহায্যে পাঠএককে আত্মস্থ করা সম্পন্ন করতে হবে।

প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের ধারণাকে স্পষ্ট ও স্বচ্ছ করতে হবে। প্রশ্ন করার আগে তাকে ভেবে নিতে হবে তিনি কোন্ উত্তরটি প্রত্যাশা করছেন, প্রশ্ন হবে পূর্বপাঠের বিষয় ভিত্তিক । প্রশ্ন এমন হবে তার অনুষঙ্গ ধরেই শিক্ষার্থী সঠিক উত্তরের দিকে যেতে পারবে। বহুক্ষেত্রেই শিক্ষকের প্রশ্নের ত্রুটির দায় শিক্ষার্থীদের উপর বর্তায়। 'সিপাহী বিদ্রোহ' সম্বন্ধে যা জানো লেখ জাতীয় প্রশ্ন করা চলবে না।

শ্রেণি শিখনের পাঠএকক বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নির্বাচিত প্রশ্ন ও তার বাঞ্ছনীয় উত্তরগুলি ভেবে রাখতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের মনে সঞ্চারিত করতে হবে শ্রেণিশিখনের অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে।

সকলের জন্য শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বহুবিধ বাধা থাকলেও ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার অঙ্গনে দরিদ্রতম ঘরের শিশুদেরও ব্যাপক প্রবেশ ঘটেছে। সেইসঙ্গে বৃহদায়তন শ্রেণিকক্ষের বাস্তবতাও প্রকট হয়েছে যদিও আর্থসামাজিক কারণে বড় শহরে কিছু ক্ষেত্রে সাধারণ সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয় গুলির শিক্ষার্থী সংখ্যা অনেক কমে গেছে। আমাদের দেশের সামগ্রিক বিকাশের ক্ষেত্রে এই অসমবিকাশের সমস্যার বাস্তবতা সমাজ- বিজ্ঞান স্বীকৃত। কিন্তুসামগ্রিক ভাবে অধিকাংশ বিদ্যালয়েই শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। সেই জন্য বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক অংশগ্রহণমূলক শিখন প্রক্রিয়া সঠিকপ্রয়োগের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। সেই সঙ্গে সংখ্যাধিক্য জনিত সমস্যার মোকাবিলা করার উপযুক্ত কার্যকর উপায় উদ্ভাবন করতে হবে।

শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক অংশগ্রহণমূলক শিখন প্রক্রিয়ার সাহায্যে অচলায়তনকে ভাঙা সম্ভব হতে পারে ; যে অচলায়তন শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত আসা, পাঠ মুখস্থ করা এবং সেটি পুনরুল্লেখ করার উপর প্রাধান্য দেবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে।

জ্ঞান জমা করার পরিবর্তে ' হজম' করা, শিক্ষাকে 'বহন' করার পরিবর্তে ' বাহন' করার মানসিকতা অংশগ্রহণমূলক শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রূপায়ন করা সম্ভব হ'তে পারে। বর্তমানে বিশ্বে শিক্ষার গতিশীলতা শ্রেণিশিখনে Co-operative learning - এর পরিবেশ সৃষ্টির অনিবার্যতাকে বাস্তব ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার কথা ভাবতে শুরু করেছে। এই প্রক্রিয়াকে সঠিক প্রয়োগ করতে পারলে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব সমবেত ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ, তথ্যসংগ্রহ, ভবিষ্যতে নিজ নিজ বুদ্ধির সাহায্যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছোবার মানসিকতা জাগ্রত করতে সাহায্য করবে।

শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক অংশগ্রহণমূলক শিখন প্রক্রিয়া সামগ্রিক শিখন পরিবেশকে উন্নত করতে পারবে এবং পরিকাঠামো সহ অন্যান্য সমস্যার বিষয়গুলির সম্মুখীন হ'তে উদ্যোগী করতে পারে। সেই সমস্যাগুলির কয়েকটি হল :

১। শিক্ষার্থীর বিপুল সংখ্যাধিক্য

২। একই শ্রেণিতে বিভিন্নমানের শিক্ষার্থী

৩। ' পিছিয়ে পড়া ' শিক্ষার্থীদের জন্য সংশোধনী পাঠের অসুবিধা পরিকাঠামোগত কারণে

৪। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর শ্রেণিকক্ষে গতানুগতিক ' সম্পর্ক ' ও ' শৃঙ্খলা' সম্বন্ধে সামন্ততান্ত্রিক ধারণা

৫। ' ব্ল্যাক বোর্ড ' ও অন্যান্য সহজলভ্য শিখন প্রদীপণ (L.T.M.) উদ্ভাবন ও ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ঘাটতি

শিখন পদ্ধতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের বাস্তব পরিস্থিতি ও সম্পদের সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে সম্যক ধারণাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

সার্বিক নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন এবং প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কার

মূল্যায়ন (Evaluation) একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া, এটি সার্বিকও (Continuous and Comprehensive) এবং সামগ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনার অঙ্গীভূত, এটি উদ্দেশ্য ভিত্তিক বা শিক্ষার্থীর প্রত্যাশিত (বা কাম্য) সামর্থ্যভিত্তিক, শিক্ষার্থীর দুর্বলতা ও সবলতার দিকগুলির চিহ্নিত করা এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণের সহায়ক। শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন অনেকাংশেই শিক্ষিকা/শিক্ষকেরও মূল্যায়ন, এমনকি সামগ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনারও মূল্যায়ন।

মূল্যায়নের বিবিধ প্রকৌশল বা কৃৎকৌশল (tools or techniques) বর্তমান, যেমন মৌখিক পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা, ব্যবহারিক (প্র্যাকটিকাল) পরীক্ষা, শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা ইত্যাদি।

যে ধরনের পরীক্ষা ব্যবস্থার (Examination system) সঙ্গে সাধারণত আমরা পরিচিত তা মূলত লিখিত পরীক্ষা যা বিদ্যালয়গুলির অভ্যন্তরীন পরীক্ষার ক্ষেত্রে পর্বভিত্তিতে (সাধারণত অধিকাংশ বিদ্যালয়ে দুইবার, কিছু বিদ্যালয়ে তিনবার) এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে (ব্যতিক্রমী দুচারটি বিদ্যালয়ে অবশ্য সাপ্তাহিক বা মাসিক পরীক্ষা নিয়মিত হতে পারে - সেগুলির সংখ্যা নগণ্য)। (বহির্পরীক্ষার বিষয়টি পৃথকভাবে পরে আলোচিত হল)। এই ধরনের পরীক্ষাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমনভাবে পরিচালিত হয় যে পাঠক্রম - পাঠ্যসূচির উদ্দেশ্যগুলির আংশিক পূরণ হতে পারে মাত্র। সমগ্র পাঠ্যসূচির নিতান্তই নির্বাচিত কিছু অংশ প্রস্তুতির মাধ্যমে এবং অধিকাংশ সময় পঠন-পাঠনে ফাঁকি দিয়ে শেষ সময়ে প্রস্তুতির মাধ্যমেও এই ধরনের পরীক্ষায় যেমন অনেক শিক্ষার্থীর পক্ষে ভালো ফল করা অসম্ভব নয়, তেমনি সমগ্র পাঠ্যসূচির বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রস্তুতি নিয়েও অনেক শিক্ষার্থী এমনতরো পরীক্ষায় তুলনামূলক ভাবে খারাপ ফল করতে পারে। এই ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণত শিক্ষার্থীদের মুখস্থ করতে পরোক্ষে উৎসাহিত করা হয়, সর্বোপরি শিক্ষার্থীদের অর্জিত বা অনার্জিত বিভিন্ন সামর্থ্যের (জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগ, দক্ষতা এসবের) যাচাই বা অনার্জিত সামর্থ্যসমূহ অর্জনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা সম্ভব হয় না, শিক্ষার্থীদের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত দৃষ্টিভঙ্গি বা মূল্যবোধ যাচাইএর বা গড়ে তোলার কোনোও সুযোগ এসব পরীক্ষায় থাকে না। কাজেই বলা যায় যে প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থা মূল্যায়নের বিভিন্ন প্রকৌশলের বা কৃৎকৌশলের একটি স্থূল রূপ মাত্র।

শিক্ষার্থীদের শিখনের অগ্রগতি নিরূপণে এবং তাদের শারীরিক মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্য অর্জনে সক্ষম করে তুলতে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন পরীক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে তাই নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন ব্যবস্থার রূপায়নই কাম্য।

নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন

মূল্যায়ন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলবে যাতে সময়ে সময়ে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি লক্ষ করা যায়, শিক্ষার্থী এবং অভিভবক-অভিভাবিকাদের শিক্ষার্থীর দুর্বলতা এবং সরলতার দিকগুলি সম্পর্কে অবহিত করা সম্ভব হয় এবং প্রয়োজনে সংশোধনমূলক পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভবপর হয়। দরকারে পঠন-পাঠন পদ্ধতি বা সামগ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনারও কিছুটা পরিবর্তন বা সংশোধন করা যেতে পারে।

আগের অধ্যায়ে শিক্ষার্থীর সামর্থ্যভিত্তিক পঠন-পাঠন ও মূল্যায়ন সম্ভব করতে কাম্যসামর্থ্যগুলি কীভাবে চিহ্নিত বা সনাক্ত করা যাবে এবং বিষয়ভিত্তিক পাঠ-এককের কোন উপ-এককে কোন সামর্থ্যগুলি থাকবে সেভাবে বিশ্লেষণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল সামর্থ্যভিতিক মূল্যায়ন বাস্তবে কীভাবে নিরবচ্ছিন্ন ও সার্বিকভাবে রূপায়িত করা যায়।

মূল্যায়নের প্রক্রিয়াটিকে নিরবচ্ছিন্ন করতে এটি চারটি পর্যায়ে সম্পাদন করবার কথা ভাবা যেতে পারে, যথা তাৎক্ষণিক বা উপ-একক ভিত্তিক, একক-ভিত্তিক , এককগুচ্ছ-ভিত্তিক বা পার্বিক এবং সামগ্রিক।

এগুলির প্রতিটি পর্যায়েই মূল্যায়ন হবে (আগে থেকেই চিহ্নিত করা) কাম্য সামর্থ্যভিত্তিক।

শিক্ষার্থীরা যাতে ওই সামর্থ্যগুলি অর্জনে সমর্থ হতে পারে সেদিকে লক্ষ রেখেই শিখন -শেখানো প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে হবে এবং প্রক্রিয়া শেষে মূল্যায়ন করতে হবে।

প্রতি পর্যায়ের মূল্যায়ন শেষেই সংশোধন মূলক পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থীর দুর্বলতা চিহ্নিত করে প্রত্যেককেই কাঙ্খিত সামর্থ্যসমূহ অর্জনে যতটা সম্ভব সফল করে তোলা যায়, অপরদিকে শিক্ষার্থী এবং তার অভিভাবককে শিক্ষার্থীর দুর্বলতা, সবলতার দিক সম্পর্কে নিয়মিত অবহিত করা এবং যথাযথ পরামর্শদানের প্রচেষ্টা বাঞ্ছনীয়।

তাৎক্ষণিক বা উপ-একক ভিত্তিক মূল্যায়ন শিখন-শেখানো (পঠন-পাঠন) চলাকালীনই শিক্ষার্থীর মৌখিক এবং ছোটখাটো দু-চারটি প্রশ্নের মাধ্যমেই হতে পারে, যেহেতু পাঠ চলাকালীনই ভূল সংশোধন করে দেওয়া সম্ভব, তাই এই মূল্যায়নের ফলাফল নথীবদ্ধকরণ আবশ্যিক নয়।

<u>একক-ভিত্তিক মূল্যায়ন বা একক -অভীক্ষণের</u> (unit test) পরিকল্পনাও হতে হবে চিহ্নিত (শিক্ষার্থীর) মূল কাম্য সামর্থ্যগুলির (ওই এককের পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে অর্জনীয়) দিকে লক্ষ রেখে। পঠন-পাঠন নির্ভর বিষয়গুলির ক্ষেত্রে মূলত লিখিত পরীক্ষা এবং কিছুটা পর্যবেক্ষণ (পরিকল্পিত দু-একটি কাজকর্ম সম্পাদন, আচার-আচরণগত পরিবর্তন এসবের) এর মাধ্যমে মূল্যায়ন হতে পারে। তবে প্রশ্নপত্র রচনা সহ সামগ্রিক মূল্যায়ন পরিকল্পনাটি যথাসম্ভব বিজ্ঞানসম্মত হতে হবে। লিখিত পরীক্ষার জন্য প্রশ্নপত্রের প্রশ্নের ধরন কেমন হবে, পূর্ণমান কত হবে, কতটা সময়কালের পরীক্ষা হবে এসব আগে থেকে শিক্ষকদেরই পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করে নিতে হবে।

তবে সাধারণত একক-ভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য একটি (খুব বড়ো এককের জন্য দুটি) শ্রেণি পিরিয়ডের (আনুমানিক ৪০ মিনিট) সুপারিশ করা হয়। পূর্ণমান ২০-২৫ রাখা যেতে পারে। নির্দিষ্ট পাঠ-এককের অন্তর্ভুক্ত উপ-এককগুলির বিষয়বস্তুর বিন্যাস অনুযায়ী নম্বর বিভাজনের ক্ষেত্রে উপ-এককগুলির আনুপাতিক গুরুত্ব বিবেচনায় রাখতে হবে (যেমন, ধরা যাক কোনও একটি বিষয়সূচির পাঠ-একক ১ এ তিনটি উপ-একক 'ক' 'খ' এবং 'গ' আছে. এই এককের মূল্যায়নে পূর্ণমান ২৫ হলে 'ক' 'খ' এবং 'গ' উপ-এককত্রয়ের বিষয়বস্তুর আনুপাতিক গুরুত্ব অনুসারে নম্বর বিভাজন করা যেতে পারে ধরা যাক যথাক্রমে ১০, ৮ এবং ৭)। অনুরূপভাবে প্রত্যাশিত মূল সামর্থ্যগুলির উপরও যথাযথ আনুপাতিক গুরুত্ব প্রদান কাম্য (পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনা সম্পর্কিত পরে যে আলোচনা করা হয়েছে সেটি দেখা যেতে পারে)। আর পাঠ-এককের বিষয়বস্তুর বিভিন্ন দিকগুলি যাতে যথাসম্ভব প্রশ্নপত্রে

উপস্থাপিত করা যায়, চিহ্নিত মূল সামর্থ্যগুলির যাচাই যাতে যতটা সম্ভব করা যায়, সেদিকে লক্ষ রেখে প্রশ্নপত্রে অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর ধর্মী (দু-এক মিনিটে উত্তরযোগ্য এমন) প্রশ্নের সংখ্যা সর্বাধিক রাখা বাঞ্ছনীয়। তারপরই সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী (৪-৫ মিনিটে উত্তরযোগ্য) প্রশ্নের সংখ্যা ঠিক করতে হবে, রচনাধর্মী প্রশ্ন (৮-১০ মিনিটে উত্তরযোগ্য) কখনোই একটির বেশি রাখা ঠিক হবে না

আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রশ্নপত্রের নক্‌শা বা ডিজাইনের নমুনা ছকের আকারে নীচে বিস্তারিত হল ঃ

শ্রেণি ঃ বিষয় ঃ

একক - ১ বিষয়বস্তু পূর্ণমান - ২৫

উপ-একক	বিষয়বস্তু	প্রশ্নে আনুপাতিক গুরুত্ব শতাংশে	নম্বর
উপ-একক - ক		৪০	১০
উপ-একক - খ		৩২	৮
উপ - একক -গ		২৮	৭
কাম্য সামর্থ্যসমূহ	জ্ঞান	৪০	১০
(পূর্ব অধ্যায়ে আলোচিত	বোধ	৩০	৮
একক বিশ্লেষণ অনুযায়ী	প্রয়োগ	১৫	৩
মূল্যায়নের পূর্বেই চিহ্নিত)	দক্ষতা	৮	২
	অন্যান্য (দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যবোধ ইত্যাদি ঃ সম্ভব হলে)	৭	২

প্রশ্ন পত্রের নকশা এভাবে পরিকল্পনা করে প্রশ্নপত্রটি প্রস্তুতির পরেই সেটি বিশ্লেষণ করে দেখে নিতে হবে পরিকল্পনা সঠিকভাবে উপস্থাপিত হতে পারল কি না, প্রশ্নগুলির মধ্য দিয়ে এককের সামগ্রিক বিষয়বস্তু যথাসম্ভব মূল্যায়নের জন্য রাখা গেছে কিনা, চিহ্নিত মূল কাম্য সামর্থ্যগুলির যাচাই-এর সুযোগ রাখা গেল কিনা,

বিভিন্ন ধরনের সামর্থ্যের কাম্য আনুপাতিক গুরুত্ব রক্ষিত হল কি না ইত্যাদি। এছাড়াও প্রতিটি প্রশ্নের নম্বর বিভাজন পরিকল্পনা (marking scheme) সঠিকভাবে হয়েছে কি হয়নি সে বিষয়টিও দেখে নিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের সম্ভাব্য আদর্শ উত্তর লিখে উত্তরের কোন অংশের জন্য কত নম্বর (value point) প্রাপ্য সেটিও লিখে ফেলতে হবে। সতর্ক থাকতে হবে প্রশ্নের ভাষা যেন শিক্ষার্থীকে সঠিক উত্তর দিতে সাহায্য করে, সে যেন বিভ্রান্ত না হয় এবং মূল্যায়নের আগেই পঠন-পাঠন কালে কাম্য উত্তরটি তার জানা ছিল-প্রশ্নটি যেন এমন হয় (প্রশ্নপত্র রচনা সম্পর্কে পরে যে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে সেটি দেখা যেতে পারে).। এভাবে প্রশ্নপত্র এবং নমুনা উত্তরপত্র একই সাথে প্রস্তুত করে নিতে পারলে মূল্যায়ন দ্রুততার সাথে এবং সঠিকভাবে করা সম্ভব হবে।

মূল্যায়নের ঠিক পরেই সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। এজন্য উত্তরপত্র যাচাইএর পর শিক্ষার্থীকে বাড়িতে সেটি নিয়ে যেতে দেওয়া যায় যাতে সে যে যে ভুলগুলি করেছে সেটি দেখতে পায় (সম্ভাব্য ক্ষেত্রে অভিভাবকই দেখতে পারেন) অপর দিকে শিক্ষক /শিক্ষিকা অনেক শিক্ষার্থীই যে সামর্থ্যগুলি অর্জন করতে পারেনি বিশেষভাবে সে দিকে লক্ষ রেখে সংশোধনাত্মক পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা নেবেন।

এভাবে পঠন-পাঠন নির্ভর প্রতিটি বিষয়ের প্রতিটি পাঠ -একক ভিত্তিক মূল্যায়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে পারলে মূল্যায়ন নিরবচ্ছিন্ন করা যেমন সম্ভব হবে , মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্যও অনেকাংশে পূরিত হবে।

সমগ্র শিক্ষাবর্ষকে যেহেতু তিনটি পর্বে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে তাই পার্বিক মূল্যায়ন তিনটি পর্বে সম্পন্ন করবার সুপারিশ এখানে রাখা যেতে পারে।

এই পর্বভিত্তিক মূল্যায়ন হবে নির্দিষ্ট পর্বে পঠন-পাঠন (শিখন-শেখানো) সমাপ্ত হয়েছে এমন পাঠ-একক গুচ্ছের ভিত্তিতে। প্রশ্নপত্র সহ সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ন পরিকল্পনা এক্ষেত্রেও একক-ভিতিক মূল্যায়নের অনুরূপই হবে, কেবল উপ-একক সমূহের পরিবর্তে বিভিন্ন এককগুলির বিষয়বস্তু এবং চিহ্নিত কাম্য সামর্থ্যগুলির উপর আনুপাতিক গুরুত্বপ্রদানের বিষয়টি এক্ষেত্রে বিবেচিত হতে হবে।

প্রস্তাবিত এই তিনটি পর্বভিত্তিক মূল্যায়নের শেষেরটি হবে সামগ্রিক বা সামুদায়িক মূল্যায়ন (summative evaluation) যেটির ব্যবস্থা করতে হবে শিক্ষাবর্ষের শেষ দিকে।

এই মূল্যায়নটি হবে কাম্য প্রান্তীয় সামর্থ্যসমূহের (terminal competencies) ভিত্তিতে এবং প্রতিটি বিষয়ের সমস্ত-পাঠ-এককের ভিত্তিতে। প্রশ্নপত্র রচনা সম্পর্কে এতাবৎ যা যা বলা হয়েছে এবং বহিপরীক্ষা সম্পর্কে আলোচনা কালে যা বলা হয়েছে সেগুলিই অনুসরণ করা যেতে পারে।

সামগ্রিক মূল্যায়নে প্রথম দুটি মূল্যায়নের ফলাফলের উপর কিছুটা গুরুত্ব আরোপ করা যেতে পারে। যেমন সামগ্রিক মূল্যায়নে কোনও বিষয়ে যদি পূর্ণ মান থাকে ১০০, তাহলে ৮০ শতাংশ নম্বর এই মূল্যায়নে রেখে ১০ শতাংশ প্রথম পর্ব এবং ১০ শতাংশ দ্বিতীয় পর্বের মূল্যায়নের ভিত্তিতে দেওয়া যেতে পারে। এসব বিষয় যেহেতু নীতি সম্পর্কিত বিষয়, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন পর্যদ। তবে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে কর্মশালা থেকে এমনতরো সুপারিশের কথা ভাবা যেতে পারে। (কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা দলগতভাবে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে সুপারিশ করুন) সামগ্রিক মূল্যায়নের পর সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ যেহেতু আশু লভ্য হবে না পরবর্তী শ্রেণির প্রারম্ভেই এই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া যায় কি না ভাবা যেতে পারে।

সার্বিক মূল্যায়ন কীভাবে

মূল্যায়নের নিরবচ্ছিন্নতার দিকটি এতাবৎ আলোচনায় হয়তো কিছুটা পরিস্ফূট হল। কিন্তু সবচাইতে কঠিন যে প্রশ্নটির সমাধান খোঁজা প্রয়োজন মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে সার্বিক করা যাবে কীভাবে ? অর্থাৎ শিক্ষাপরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কাম্য সার্বিক বিকাশ - শারীরিক, মানসিক, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের দিক থেকে তার কাম্য বিকাশের মূল্যায়ন সম্ভব হবে কী ভাবে ?

আগের অধ্যায়ে শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক (cognitive) , প্রাক্ষোভিক (affective) এবং চিন্তন- কর্মসমন্বয় (psychomotor) ক্ষেত্র গুলির অন্তর্গত সামর্থ্যসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে মূলত শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক ক্ষেত্রের সামর্থ্যগুলির কতটা অর্জিত হল বা অনার্জিত রয়ে গেল সে সম্পর্কেই ধারণা মেলে। কিন্তু প্রাক্ষোভিক ক্ষেত্রের এবং চিন্তন- কর্ম সমন্বয় ক্ষেত্রের সামর্থ্যগুলির যাচাই লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে যে মূল্যায়ন তার মধ্য দিয়ে প্রায় সম্ভব নয় বললেই চলে (সুপরিকল্পিত প্রশ্নের মাধ্যমে প্রাক্ষোভিক ক্ষেত্রের দু-একটি সামর্থ্য সম্পর্কে অবশ্য কিছুটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে)।

কাজেই শিক্ষাপ্রয়াসের মধ্য দিয়ে, সামগ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর কাম্য সার্বিক বিকাশের অগ্রগতি লক্ষ করতে হলে শিক্ষার্থীর আচার-আচরণের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের পরিমাপের ধারণা পেতে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে মূল্যায়নের অন্যতর প্রকৌশল বা কৃৎকৌশল প্রয়োগের কথা ভাবতে হবে। এই ধরনের মূল্যায়নের প্রকৌশল হবে মূলত শিক্ষার্থীর আচার-আচরণগত পরিবর্তনের পরিকল্পিত পর্যবেক্ষণ, তার সঙ্গে মাঝে মাঝেই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলোচনা যেটি কোনো মৌখিক প্রশ্ন করা, বিভিন্ন সামাজিক, পারিবেশিক সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যেই আলোচনার সুযোগ করে দিয়ে সেই আলোচনা শোনা, সহ পাঠক্রমিক এবং পাঠক্রম বহির্ভূত বিষয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, পরিকল্পিত কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীদের নিয়োজিত করে ওইসব কর্ম সম্পাদনে তাদের আগ্রহ, কর্মোদ্যম, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, নৈপুণ্য বা দক্ষতা, একসাথে মিলে মিশে কাজ করবার মানসিকতা, নিয়মিত এসব কাজকর্মে অংশগ্রহণ এসব লক্ষ করে সার্বিক মূল্যায়ন অনেকাংশে সফল করা সম্ভব।

এই ধরনের মূল্যায়ন যেহেতু মূলত নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক তাই মূল্যায়নের জন্য নির্দিষ্ট সময়কাল বেঁধে দেওয়া দুষ্কর। তবে লিখিত পরীক্ষা ভিত্তিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রের মতো প্রাক্ষোভিক এবং চিন্তন কর্ম-সমন্বয় ক্ষেত্রের সামর্থ্যসমূহ যাচাই ভিত্তিক এই ধরনের মূল্যায়নের ফলাফল নিয়মিত নথীবন্ধ করণের (রেকর্ড রাখার) ব্যবস্থা রাখা দরকার। শিক্ষার্থীদের প্রগতি পত্রে পর্বভিত্তিক মূল্যায়নের সময় এই বিশেষ মূল্যায়নের ফলাফল অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে, এজন্য ওই পর্বে শিক্ষার্থীদের আচার-আচরণগত কাম্য পরিবর্তন কতটা হয়েছিলো, ক্রীড়া , সংস্কৃতি বিষয়ক, সমাজ ও পরিবেশ উন্নয়নমূলক এবং অন্যান্য পরিকল্পিত কর্মকান্ডে (সহ পাঠক্রমিক ও পাঠক্রম বহির্ভূত) ওই পর্বে প্রতিটি শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ উৎসাহ নৈপুণ্য ইতাদি পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নে প্রত্যক্ষ গ্রেড (তিন বিন্দুমাত্রিক বা চার বিন্দুমাত্রিক স্কেলে) প্রদান করা যেতে পারে। এর সঙ্গে কোন শিক্ষার্থীর কোনো বিশেষদিকে বিশেষ আগ্রহ বা দক্ষতা আছে সেটি প্রগতি পত্রে মন্তব্যে উল্লেখ থাকলে ভালো হয়।

বিদ্যালয়ের বাস্তব পরিস্থিতি স্থানীয় সামাজিক-পরিবেশিক অবস্থা, পরিচালনাযোগ্য কর্মসূচির ব্যবস্থাপনা, শিক্ষার্থীদের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত চিরকালীন এবং অধুনা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক এমন কিছু মূল্যবোধ জাগ্রত করা এসব বিষয় চিন্তনে রেখে সার্বিক মূল্যায়নে ঠিক কোন কোন বিষয়গুলি লক্ষ করা হবে তা চূড়ান্ত করতে হবে স্থানীয়ভাবে শিক্ষক শিক্ষিকাদেরই (বিদ্যালয়গুচ্ছের ধারণাকে কাজে লাগাতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়)। তবে সাধারণভাবে শিক্ষার্থীর আচার-আচরণের কয়েকটি দিক পর্যবেক্ষণের কথা ভাবা যেতে পারে। যেমন শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি, তার শৃঙ্খলাবোধ, নিয়মানুবর্তিতা, সহপাঠীদের প্রতি এবং শিক্ষিকা শিক্ষকদের প্রতি তার ব্যবহার, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, শারীরশিক্ষা বিষয়ক ও সাংস্কৃতিক কাজে, সমাজ ও পরিবেশ উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ, এ ধরনের কাজে তার আগ্রহ নেতৃত্ব দান ও নৈপুন্য প্রদর্শন, বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায়, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞান প্রদর্শনী এবং অন্যান্য কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও অংশগ্রহণ, মূল্যবোধের পরিচয় (মূল্যবোধের শিক্ষা অংশে দ্রষ্টব্য) ইত্যাদি।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষিকা শিক্ষকবৃন্দ পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বর্জন, সংযোজনের মাধ্যমে বিষয়গুলি ঠিক করে নেবেন। এই ধরনের মূল্যায়নে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা উচিত হবে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ধরনের কর্মকান্ডে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত অংশগ্রহণ, সকলের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে পারা, ব্যক্তিগত, আচার আচরণ এসবের উপর। তবে মূল্যায়নে সর্বোচ্চ গ্রেড দেবার ক্ষেত্রে বিশেষ কাজে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত নৈপুণ্য, দলগত কাজে নেতৃত্ব দেবার দক্ষতা, বিশেষ কাজের গুণমান, সৃজনশীলতা, কোনও বিশেষে ভালো কাজ সম্পন্ন করা এগুলি বিবেচনায় রাখা যেতে পারে।

পর্বভিত্তিক মূল্যায়নগুলি থেকে সামগ্রিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একই বিষয়ে (যেমন সাংস্কৃতিক কাজে অংশগ্রহণ) তিনটি পর্বের প্রাপ্ত গ্রেডের গড় করে নেওয়া যেতে পারে।

বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মধ্যশিক্ষা পর্যদ যদি নীতিগতভাবে গ্রেড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তবে পঠন-পাঠন নির্ভর বিষয়ের ক্ষেত্রে বা লিখিত পরীক্ষাভিত্তিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পরোক্ষ গ্রেড-পদ্ধতি (indirect grading system) অর্থাৎ নম্বর এবং গ্রেড দুটিই উপস্থাপনের পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। আর কর্মনির্ভর বিষয়ের ক্ষেত্রে বা লিখিত পরীক্ষা নির্ভর নয় এমন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ গ্রেড পদ্ধতি অনুসৃত হতে পারে।

একক অভীক্ষণ-পত্র রচনার রূপরেখা (ব্লু-প্রিন্ট)

শ্রেণি ঃ

বিষয় ঃ — পূর্ণমান - ২৫

একক ঃ — সময় - ৪০ মিনিট

সামর্থ্য-সমূহ	জ্ঞান				বোধ				প্রয়োগ				দক্ষতা				মোট নম্বর
	র.	স.উ.	অ.স.উ.	নৈ	র.	স.উ.	অ.স.উ.	নৈ	র.	স.উ.	অ.স.উ.	নৈ	র.	স.উ.	অ.স.উ.	নৈ	
(ক)	৬ (১)	২ (১)	-	-	-	-	২ (২)	১ (১)	-	-	১ (১)	-	-	-	-	-	১২
(খ)							২ (২)				২ (২)	১ (১)		২ (১)			৭
(গ)........			২ (২)			২ (১)	২ (২)										৬

বি. দ্র. বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা প্রশ্নসংখ্যা জ্ঞাপক এবং বন্ধনীর বাইরের সংখ্যা মূল্যমান (নম্বর) জ্ঞাপক

প্রশ্নের ধরন	প্রশ্নের সংখ্যা	মূল্যমান (নম্বর)	আনুমানিক সময় (উত্তরের জন্য)
র. = রচনাধর্মী	১	৬	১২ মি.
স.উ. = সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী	৩	৬	১৫ মি.
অ.স.উ.= অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী	১১	১১	১১ মি.
নৈ = নৈর্ব্যক্তিক	২	২	২ মি.

সামগ্রিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বা বহির্পরীক্ষার ক্ষেত্রেও প্রশ্নপত্র রচনার ব্লু-প্রিন্ট বা রূপরেখা এই ভাবেই প্রস্তুত করে নিতে হবে, কেবল পত্রে পূর্ণমান পৃথক হবে এবং উপ-এককের বিবরণ স্থলে একক সমূহের বিবরণ লিখতে হবে।

এইভাবে একক অভীক্ষণ-পত্রের নক্‌শা (ডিজাইন) এবং রূপরেখা আগে থেকে প্রস্তুত করে নিয়ে তবেই প্রকৃত প্রশ্নপত্রটি রচনা করতে হবে এবং ওই প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ করে দেখে নিতে হবে পরিকল্পনা অনুযায়ী সত্যিই প্রশ্নপত্রটি রচিত হল কি না (প্রশ্নপত্র রচনা সম্পর্কে পরের আলোচনাও দ্রষ্টব্য।)

অংশগ্রহণকারীদের করনীয়

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষিকা-শিক্ষকগণ বিষয়শাখা ভিত্তিক বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে একক-অভীক্ষণের পরিকল্পনা করতে পারেন, প্রতিটি দল নির্দিষ্ট বিষয়-পাঠ্যসূচির অন্তত একটি পাঠ-একক বেছে নিয়ে ওই এককের বিভিন্ন উপ-এককের মূল কাম্য সামর্থ্যগুলি চিহ্নিত করবেন, সেগুলির যাচাইএর জন্য একক-অভীক্ষনের নকশা (ডিজাইন) এবং রূপরেখা (ব্লু-প্রিন্ট) প্রস্তুত করবেন। পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে এসবের প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নিয়ে প্রকৃত প্রশ্নপত্রটি রচনা করবেন, বিশ্লেষণ করবেন এবং চূড়ান্ত করবেন (সবকিছুই পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে)। সমবেত ভাবে আলোচনার জন্য প্রতিটি দলের পৃথক প্রতিবেদনগুলি উপস্থাপিত হতে পারে, বিদ্যালয়ে এই ধারণা বাস্তবায়িত করতে গেলে কী কী অসুবিধা দেখা দিতে পারে এবং সেগুলি কীভাবে কাটিয়ে ওঠা যায় দলভিত্তিক এবং সমবেত আলোচনায় সেই বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

সার্বিক নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগে অসুবিধার কয়েকটি দিক এবং সেগুলির সম্ভাব্য সমাধান পন্থা ঃ

তত্ত্বগতভাবে সার্বিক নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন পদ্ধতি যে বিজ্ঞানসম্মত সে বিষয়ে দ্বিমত না থাকলেও এই পদ্ধতিটি বাস্তবে রূপায়নের ক্ষেত্রে বেশ কিছু অসুবিধা দেখা দিতে পারে। সম্ভাব্য অসুবিধাগুলি কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমেই চিহ্নিত করবেন। আলোচনার সূত্রপাতের জন্য কয়েকটি সম্ভাব্য অসুবিধার বিষয় এখানে উল্লেখিত হল ঃ

(১) শ্রেণিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা খুব বেশি থাকা

(২) বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা যথেষ্ট কম থাকা

(৩) বিশেষ কোনও কারণে বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন দিবসের সংখ্যা হ্রাস, সময়াভাব এবং সেজন্য বিশেষ করে সংশোধনী পাঠের ব্যবস্থা করতে না পারা

(৪) সরঞ্জামের অভাব, অর্থাভাব (যার ফলে প্রশ্নপত্র / উত্তরপত্র সরবরাহে সমস্যা)

(৫) পাঠক্রম-পাঠ্যসূচি লভ্য সময় সাপেক্ষে বিষয়বস্তুর ভারে ভারাক্রান্ত হওয়া

(৬) বহুকালব্যাপী প্রচলিত সাবেকি পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রতি, অভিভাবকদের বিপুল অংশের এবং শিক্ষক সমাজের ও শিক্ষাব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গের একাংশের আনুগত্যবোধ ও বিশেষ দুর্বলতা।

(৭) সার্বিক নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের যৌক্তিকতা, ত্রুটির শিক্ষা বিজ্ঞান সম্মত ভিত্তি, ত্রুটির রূপায়ণ প্রকৌশল সম্পর্কে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এক অংশের সবিশেষ অবহিত না হতে পারা বা এসব বিষয়ে তাঁদের সকলকে ঠিকমতো বোঝাতে অসফল হওয়া।

(৮) পরিবর্তন বিরোধী মনোভাব, এই মনোভাব সৃষ্টিতে বিভিন্ন গণমাধ্যমের ভূমিকা

(৯) পরিকল্পনামাফিক পঠন-পাঠন, মূল্যায়ন, সংশোধনী পাঠ - এসবের ব্যবস্থা করতে না পারা

(১০) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের একাংশের মধ্যে নয়া পদ্ধতি প্রয়োগে বর্দ্ধিতশ্রম ও সময় প্রদানে ভীতি ও অনীহা ইত্যাদি

এসব সমস্যা ছাড়াও মূল্যায়নের সার্বিক দিকটিকে সফল করতে ঠিক কোন কোন নির্দিষ্ট বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন, কোন শিক্ষক-শিক্ষিকারা এ ধরনের মূল্যায়ন করবেন এবং কীভাবে করবেন এসব সম্পর্কে সার্বিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে না পারা। ঠিকভাবে পরিকল্পনা করতে না পারার সমস্যাও রয়েছে।

এই ধরনের সমস্ত সমস্যার চটজলদি সমাধান কেবল ব্যাপ্তস্তরীয় কর্মসূচির আলোচনার মাধ্যমে মিলবে না, স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী অনুস্তরীয় কর্মসূচিতে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান সূত্র উদ্ভাবন করতে হবে (যেমন, বিদ্যালয়গুচ্ছ ধারনার বাস্তবায়নের মাধ্যমে, তা সম্ভব না হলে বিদ্যালয়েই অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে)।

তবে স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ / অভিমুখীকরণের মাধ্যমে শিক্ষিকা-শিক্ষকেরা সার্বিক নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত হতে পারলে সুষ্ঠু পরিকল্পনা মারফৎ অনেক সমস্যাই কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হবেন এ প্রত্যাশা করা যায়। যেমন, শিক্ষাবর্ষের পর্বভিত্তিক পঠন-পাঠন ও মূল্যায়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে সময়াভাবের সমস্যা অনেকখানি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। সময় সাশ্রয়ের জন্য এবং যথাযথ মূল্যায়নের স্বার্থে ও প্রশ্নপত্র রচনার সময়েই শিক্ষিকা / শিক্ষক নমুনা উত্তরপত্র প্রস্তুত করে রাখতে পারেন (এ বিষয়টি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে)। একাধিক পাঠ-এককে ভাগ করে নিতে পারেন অথবা একাধিক পাঠ-একককে যুক্ত করে একটিই পাঠ-একক হিসেবে মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে পারেন (অবশ্যই যুক্তিযুক্তভাবে)।

আর্থিক সমস্যার সমাধানে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় সমাজ ও সরকারের সমন্বিত প্রয়াস জরুরী। বিদ্যালয়ের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে মূল্যায়নের জন্য অর্থের সংস্থান রাখতে হবে, সরকার বিদ্যালয়গুলিকে এ বাবদ কিছুটা অনুদানের ব্যবস্থা করতে পারেন। (বিশেষ করে সর্বশিক্ষা অভিযান তহবিল থেকে এই অর্থ এখুনিই লভ্য হতে পারে), স্থানীয় সমাজও কিছুটা সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে পারেন। অর্থব্যয় যথাসম্ভব কমিয়ে কীভাবে মূল্যায়ন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে সেদিকটিও ভাবতে হবে। প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা সম্ভব হলে প্রশ্ন ও উত্তরের জন্য একই পত্রের ব্যবস্থা করতে পারলে ভালো হয়।

সার্বিক মূল্যায়ন যেহেতু মূলত পর্যবেক্ষণ-ভিত্তিক স্বভাবতই একটি বড়ো প্রশ্ন হল এই পর্যবেক্ষণের বিষয়গুলি কী কী হবে এবং কোন শিক্ষক / শিক্ষিকাগণ এই পর্যবেক্ষণের কাজটি করবেন ?

প্রথম প্রশ্নটি সম্পর্কে সার্বিক মূল্যায়ন সম্পর্কিত আলোচনায় বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। তবুও সার্বিক মূল্যায়নের জন্য যে বহুবিধ বিষয়গুলির উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে ন্যূনতম কয়েকটি ক্ষেত্র বেছে নিতে হলে মনে হয় এই ক্ষেত্রগুলিতে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে ঃ

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	পর্যবেক্ষণের বিষয়
(১) সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড (২) সমাজসেবামূলক কর্মসূচি (৩) শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষা সম্পর্কিত কাজকর্ম (৪) পরিবেশ উন্নয়নমূলক কর্মসূচি	নিয়মিত অংশগ্রহণ, আগ্রহ, একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করার মানসিকতা, ব্যক্তিগত নৈপুন্য (কাজের মান) প্রাসঙ্গিক কাম্য মূল্যবোধ, সৃষ্টিভঙ্গি

একথা বলাইবাহুল্য যে এসব ক্ষেত্রে কর্মকান্ডে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ (প্রত্যক্ষ বা দু-একটি ক্ষেত্রে পরোক্ষ) পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করবেন নির্দিষ্ট কর্মসূচিটির পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষিকা / শিক্ষক, তবে মূল্যায়নের ফলাফলের একটি প্রতিলিপি নির্দিষ্ট শ্রেণির শ্রেণি শিক্ষক / শিক্ষিকাকে দিতে হবে, যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থীর সার্বিক মূল্যায়নের নিয়মিত নথীবন্ধকরণ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়।

এগুলি হল নির্দিষ্ট কর্মকান্ডে শিক্ষার্থীকে জড়িয়ে নিয়ে তাকে পর্যবেক্ষণের মাধমে তার মূল্যায়ন। আর এক ধরনের পর্যবেক্ষণ হল শিক্ষার্থীর আচার আচরণগত পরিবর্তনের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ। নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক পঠন-পাঠন, শিখন-শেখানো, কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে আচার- আচরণগত কাম্য পরিবর্তন (দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, মানসিকতার প্রতিফলন) পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন যথারীতি নির্দিষ্ট বিষয়ের শিক্ষিকা / শিক্ষক। তবে আচার আচরণগত পরিবর্তনের সাধারণ কয়েকটি সূচকভিত্তিক (যেমন নিয়মিত উপস্থিতি, সহপাঠীদের প্রতি শিক্ষকদের প্রতি ব্যবহার, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি) পর্যবেক্ষণ করতে হবে নির্দিষ্ট শ্রেণি-শিক্ষককেই।

একটি শ্রেণির শিক্ষার্থীরা উচ্চতর শ্রেণিতে উন্নীত হলে, তাদের জন্য শ্রেণি শিক্ষক যদি একই থাকেন তবে বিদ্যালয়ে প্রবেশকালে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীর আচার-আচরণগত পরিবর্তনের একটি ধারাবাহিক চিত্র লভ্য হতে পারে। প্রতিবেশী বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক অভিভাবিকা শিক্ষা প্রশাসক গ্রাম শিক্ষা কমিটি / ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটির সদস্যবৃন্দের মধ্যে এসব বিষয়ে মাঝে মাঝে পারস্পরিক আলোচনার প্রয়োজন। আলোচনার মাধ্যমে পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণ করতে হবে (পঞ্চায়েত / পুরসভার সাহায্য প্রয়োজনে গ্রহণ করা যেতে পারে।)

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ এসব কিছু সম্পর্কে দলগতভাবে এবং সম্মিলিতভাবেও পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। এখানে যেসব সুপারিশ উপস্থাপিত হয়েছে প্রয়োজনে সেগুলির পরিবর্তন পরিমার্জন, নতুন সুপারিশ সংযোজন এগুলি করবেন।

বিদ্যালয় শিক্ষার স্তরে প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কার

বর্তমানে বিদ্যালয় শিক্ষার স্তরে অভ্যন্তরীন ও বহিপরীক্ষাগুলি যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে এককথায় বলা যায় তা বিজ্ঞানসম্মত নয়। এই ধরনের পরীক্ষা ব্যবস্থার যে ত্রুটিগুলি স্পষ্টভাবেই প্রতিভাত হচ্ছে তার মূল কারণ হল প্রশ্নপত্র রচনা থেকে শুরু করে উত্তরপত্রের মূল্যায়ন এবং তার ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীদের অর্জিত সামর্থ্য যাচাই ভিত্তিক যেভাবে ফলাফল প্রকাশিত হচ্ছে এই সব প্রক্রিয়ার কোনওটিই শিক্ষাবিজ্ঞান সম্মতভাবে সম্পাদিত হতে পারছে না। যেসব সাধারণ ত্রুটি বিচ্যুতি এসব বিষয়ে লক্ষিত হচ্ছে সেগুলির কয়েকটি এখানে উল্লেখিত হল : (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এখানে যে বিষয়গুলি আলোচিত হল সেগুলি মূলত বহিপরীক্ষা সম্পর্কিত হলেও অনেকগুলিই বিদ্যালয়-অভ্যন্তরীন পরীক্ষার ক্ষেত্রেও সমভাবেই প্রযোজ্য)

<u>প্রশ্নপত্র - সম্পর্কিত</u>

- পাঠক্রম - পাঠ্যসূচি প্রণীত হয় কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে ভাবনায় রেখে - এই উদ্দেশ্যগুলির কয়েকটি সামগ্রিক পাঠক্রম-ভিত্তিক এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়-পাঠ্যসূচি ভিত্তিক।
- প্রশ্নপত্র সাধারণত যেভাবে রচিত হয় তাতে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুগলির বেশ কিছু অংশ প্রশ্নপত্র থেকে হয় বাদ যায় নতুবা কাম্য আনুপাতিক গুরুত্ব পায় না - এর ফলে ঐ পাঠ্যসূচির নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সমূহের অনেকগুলিই পূরিত হয় না।
- শিক্ষার্থীর কাম্য সামর্থ্যগুলি (জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগ, দক্ষতা, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি) যাচাই এর ক্ষেত্রেও প্রশ্নপত্র যথাযথ আনুপাতিক গুরুত্ব প্রদান করা হয় না। প্রকৃতপক্ষে প্রশ্নপত্রগুলি অধিকাংশেই শিক্ষার্থীদের মুখস্থ করার প্রবণতাকে উৎসাহিত করে এবং শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত আচার আচরণগত পরিবর্তন যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্রের কোনও ভূমিকা থাকে না।
- পাঠ্যসূচির অনেক বিষয়বস্তু বাদ দিয়ে এবং শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিয়েও অনেক পরীক্ষার্থী দারুন ভালো ফল করতে পারে।
- অনেক ক্ষেত্রেই প্রশ্নপত্রে এমনতরো কোনও প্রশ্ন থাকে যার উত্তর বিভিন্ন রকম হতে পারে- প্রশ্নপত্র রচয়িতা হয়তো একটি বিশেষ উত্তর চিন্তায় রেখে প্রশ্ন করলেন, পরীক্ষার্থী হয়তো আর একটি উত্তর দিল , আবার পরীক্ষক হয়তো বা আর একটি উত্তরের কথা ভেবে নম্বর দিলেন। (হয়তো তিনটি উত্তরই সঠিক) এসব ক্ষেত্রে সঠিক উত্তর লিখেও কোনোও কোনোও পরীক্ষার্থী নম্বর নাও পেতে পারে, সেক্ষেত্রে তারা কিন্তু সুবিচার পেল না। এই ধরনের প্রমাদ (subjectivity-error) হামেশাই ঘটতে দেখা যায়।
- প্রশ্নের ভাষা অনেকক্ষেত্রে এমনতরো হয় যে প্রশ্নকর্তা যে কথাটি বলতে চান সেটি হয়তো পরীক্ষার্থীর কাছে সঠিকভাবে পৌঁছায় না (ambiguity in using words) ।
- প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর করতে সম্ভাব্য কতটা সময় লাগতে পারে এবং পরীক্ষার্থীর পক্ষে নির্দিষ্ট সময়ে সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব কিনা প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে সেটি অনেক ক্ষেত্রেই বিশ্লেষণ করা হয় না। আবার, প্রশ্নগুলির কাঠিন্যমাত্র বিশ্লেষণ করে সহজ, গড় মানের, কঠিন প্রশ্নগুলির শতকরা মাত্রা সমগ্র

প্রশ্নপত্রে কেমন আছে এটিও দেখা হয় না। ফলে, দেখা যায় কোনও বিষয়ের প্রশ্নপত্র অত্যন্ত কঠিন হয়েছে আবার কোনও কোনওটির ক্ষেত্রে হয়তো অত্যন্ত সহজ হয়েছে - এটি কাম্য নয়।

- প্রশ্নপত্রে কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে শব্দ বা বাক্যচয়ন করা হয় না। ফলে পরীক্ষার্থীর পক্ষে ঠিকমতো উত্তর লেখা সম্ভব হয় না যেমন, আগে ইতিহাসে একটি প্রশ্ন প্রায়শই করা হত "মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলি বর্ণনা কর"। এক্ষেত্রে পরীক্ষার্থী কয়টি কারণ উল্লেখ করবে ?

  প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে একজন বিশিষ্ট শিক্ষক প্রকৃতি বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকে প্রশ্ন করেছেন "পরিবেশ দূষণের কারণগুলি বর্ণনা করো " বা প্রাণী ও উদ্ভিদের একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

  এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর করা শিশুদের পক্ষে কেন, বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের পক্ষেও অসম্ভব।

- অনেকক্ষেত্রে সঠিকভাবে প্রশ্নের নম্বর বিভাজন করা হয় না (marking scheme করা হয় না)।

  পরীক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক স্তরের বিষয়টি মনে না রেখে কোনও কোনও প্রশ্নকর্তার মধ্যে প্রশ্ন প্রণয়নকালে নিজের পান্ডিত্য প্রদর্শনের প্রবণতা দেখা যায়।

<u>উত্তরপত্রের মূল্যায়ন সম্পর্কিত</u>

এ বিষয়টি বোধ হয় উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না যে প্রশ্নপত্র যথাযথভাবে রচিত না হলে উত্তপত্রের মূল্যায়নও সঠিকভাবে হতে পারে না। যেসব ত্রুটি বিচ্যুতি উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রায়শই ঘটতে দেখা যায় সেগুলির দু-চারটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

- দুজন পরীক্ষার্থী সমমানের উত্তর লিখেও পৃথক পরীক্ষকের কাছে পৃথক পৃথক নম্বর পেতে পারে- একজন হয়েতো 100 তে 50 পেল, দ্বিতীয়জন হয়তো 70 পেল। ইতিহাসে যে ধরনের প্রশ্নের নমুনা আগেই উল্লেখিত হয়েছে ঐ ধরনের প্রশ্নের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটা তো খুবই স্বাভাবিক, তাছাড়াও দুজন পরীক্ষকের একজন যদি <u>*কঠিন*</u> এবং অন্যজন যদি <u>*কোমল*</u> বা দরাজ হন, তাহলেও এমনটা হতে পারে। আবার বিভিন্ন প্রশ্নের প্রতিটির ক্ষেত্রে নম্বরের বিস্তৃত বিভাজন দেখানো না থাকলেও এই সমস্যা দেখা দিতে পারে।
- অনেক ক্ষেত্রে সঠিক উত্তর লিখেও হয়তো পরীক্ষার্থী নম্বর পায় না, আবার ভুল উত্তর লিখেও কোনোও পরীক্ষার্থী পুরো নম্বর পেয়ে যেতে 'পারে।
- কিছু কিছু পরীক্ষক আছেন যাঁদের মধ্যে প্রতিটি উত্তরপত্র খুঁটিয়ে দেখে নম্বর না দিয়ে একটা গড় নম্বর দেওয়ার প্রবণতা বর্তমান। আবার একজন পরীক্ষকের কাছে 'বিরাট সংখ্যক উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য দিলেও সময়াভাবেও এমনটা হতে পারে।

<u>মেধা তালিকা</u>

সম্ভবত সব চাইতে অযৌক্তিক হল মেধা তালিকা প্রকাশের বিষয়টি। কারণ এতাবৎ আলোচনাতেই সেটি স্বচ্ছভাবেই বোধগম্য। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা পরীক্ষকদের পক্ষে কোন মানদণ্ডে সমমেধার পরীক্ষার্থীদের

সমান নম্বর দেওয়া সম্ভব ? মেধা তালিকা প্রকাশ না করার যে সিদ্ধান্ত সম্প্রতি পর্ষদ্ গ্রহণ করেছেন সেটি সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত।

এসব বিষয়গুলি গুরুত্বের সঙ্গে চিন্তা ভাবনা করা শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেরই অবশ্য কর্তব্য।

সম্ভাব্য প্রতিকার পন্থা

এখন মূল প্রশ্নটি হল এই সমস্যাগুলির সম্ভাব্য প্রতিকারপন্থা কী ?

এ প্রশ্নের উত্তরে দুটি কথা বলা যেতে পারে ঃ সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠতে আশু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনামাফিক পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যেতে পারে।

এখুনই বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির ব্যাপক এবং আমূল পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব না হলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু কিছু ব্যবস্থা নিয়ে বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতিকেই আর একটু বিজ্ঞান সম্মত করে তোলা যায়।

প্রশ্নপত্র রচনার ক্ষেত্রে

1) প্রশ্নপত্র রচিত হওয়া উচিত পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত সমস্ত পাঠ-এককের (বা অধ্যায়ের) বিষয়বস্তু সমূহকে স্পর্শ করে বা আবৃত (cover) করে যাতে সমগ্র পাঠ্যসূচির উদ্দেশ্যগুলি প্রতিফলিত হতে পারে।

2) প্রশ্নপত্রে পাঠ্যসূচিতে বিধৃত সমস্ত পাঠ-এককের এবং ওইসব পাঠ-এককের অন্তর্গত বিষয়বস্তু সমূহের উপর যুক্তিযুক্ত আনুপাতিক গুরুত্ব প্রদান করা প্রয়োজন।

3) কেবলমাত্র মুখস্থ করে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রবণতা রোধ করতে কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্যগুলির (যথা ঃ জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগ, দক্ষতা ইত্যাদির) উপর যুক্তিযুক্ত আনুপাতিক গুরুত্ব প্রদান করা উচিত।(যেমন, মাধ্যমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই আনুপাতিক গুরুত্ব যথাক্রমে 40%, 35% ,15% এবং 10% তে রাখা যেতে পারে। প্রশ্নপত্রে মূল্যবোধ ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের সহায়ক বা যাচাই কারক এমন দু-একটি প্রশ্ন অবশ্যই রাখা প্রয়োজন।

4) 1 নং বিষয়টি সম্ভবপর করতে প্রশ্নপত্রে কোনও বিকল্প প্রশ্ন না রাখতে পারলেই ভালো (অর্থাৎ যদি 10 টি প্রশ্ন থাকে তবে ঐ 10 টিরই উত্তর দিতে হবে)। তবে একান্তই যদি বিকল্প (alternative) প্রশ্ন দিতেই হয় তবে বিকল্প প্রশ্নটিকে বিষয়বস্তু, সামর্থ্য, কাঠিন্যমাত্রা এসব দিক থেকেই মূল প্রশ্নটির সমতুল্য হতে হবে। বিকল্প প্রশ্নটি মূল প্রশ্নটি যে পাঠ-এককের অন্তর্গত সেই পাঠ-একক থেকেই হলে ভালো হয়। আর সমগ্র পাঠ্যসূচির প্রায় সব বিষয়বস্তুকে স্পর্শ করে প্রশ্নপত্র রচনা সম্ভবপর করে তুলতে অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী (2-1 মিনিটে উত্তরযোগ্য) এবং সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী (4-5 মিনিটে উত্তরযোগ্য) প্রশ্নের সংখ্যা বেশি করে রাখতে হবে, রচনাধর্মী প্রশ্নের (10-15 মিনিটে উত্তরযোগ্য) সংখ্যা যথাসম্ভব কম রাখতে হবে।

5) প্রশ্নপত্রের ভাষা যথাসম্ভব সহজ সরল রাখতে হবে (ঘোরালো - প্যাঁচালো বা কালিদাসের হেঁয়ালি মূলক প্রশ্ন যেন না হয় সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে)। কোনও প্রশ্ন যেন পরীক্ষার্থীর মনে বিভ্রম সৃষ্টি না করে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

6) জাতপাত, ধর্ম, সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি কারক বা উত্তেজনা সৃষ্টির সম্ভবনামূলক এমন প্রশ্ন কোনোও ভাবেই প্রশ্নপত্রে রাখা যাবে না।

7) প্রশ্নপত্রে কোনও প্রশ্নের একাধিক উত্তর হতে পারে এমন প্রশ্ন একান্তই প্রয়োজনীয় না হলে না রাখাই যুক্তিযুক্ত।

8) প্রশ্নপত্র প্রস্তুতির পর সেটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। এই বিষয়গুলি বিশেষভাবে দেখতে হবে :

i) পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকল প্রশ্নের উত্তর করা সাধারণভাবে সম্ভব কি না।

ii) প্রশ্নপত্রে সমস্ত পাঠ-এককের উপর যথাযথ আনুপাতিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কি না এবং বিভিন্ন সামর্থ্যগুলিও যুক্তিযুক্ত আনুপাতিক গুরুত্ব পেয়েছে কি না।

iii) প্রশ্নগুলির কাঠিন্য মাত্রা কেমন এবং সহজ প্রশ্ন, কঠিন প্রশ্ন এবং গড় মানের প্রশ্নের আনুপাতিক শতকরা মাত্রা কীরূপ (যেমন, ধরা যাক 30% প্রশ্ন সহজ, 50% প্রশ্ন মাঝারি বা গড় মানের আর বাকি 20% কঠিন - এর হেরফের অবশ্যই হতে পারে)।

[কাঠিন্যমাত্রা (d) কে গাণিতিকভাবে ভাষায় প্রকাশ করা যেতে পারে এইভাবে :

$d = 1 - \frac{n}{t}$, যেখানে n হল ওই প্রশ্নটির উত্তরদানে সমর্থ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা আর t মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা। স্বভাবতই অনুপাতটি যত উচ্চ হবে প্রশ্নটির কাঠিন্য মাত্রা তত কম হবে (t কে 100 ধরে গণনা করলে সুবিধা হবে)]

iv) প্রশ্নপত্রে বিভিন্ন প্রশ্নের বিন্যাস সহজ থেকে কঠিন এভাবে রয়েছে কি না (প্রথম দিকের প্রশ্ন সহজ হওয়া উচিত, ক্রমশ কঠিন থেকে কঠিনতর প্রশ্নগুলি বিন্যস্ত হতে পারে)।

v) বিভিন্ন প্রশ্নের নম্বর বন্টন পরিকল্পনা (marking scheme) সঠিক হয়েছে কি না এবং একই প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের নম্বর নির্দিষ্ট করা যথাযথ হয়েছে কি না। (যেমন, কোনও বিশেষ প্রশ্নের যদি তিনটি অংশ থাকে, তবে প্রতিটি অংশের উত্তরের জন্য প্রদেয় নম্বর পৃথকভাবে দেখিয়ে দেওয়া আবশ্যক। যেমন, পুরো প্রশ্নটির জন্য যদি 16 নম্বর থাকে, তবে মোট নম্বরকে তিনভাবে ভেঙে দেখাতে হবে - ধরা যাক এক্ষেত্রে 4+6+6)।

এছাড়া 1 থেকে 7 নম্বর পর্যন্ত যে বিষয়গুলি উল্লেখিত হয়েছে প্রশ্নপত্রে সে বিষয়গুলির দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে কি না।

9) প্রশ্নপত্র রচয়িতাকেই সমস্ত প্রশ্নের নমুনা উত্তর লিখে দেওয়া উচিত। এ বিষয়ে আশু করণীয় হিসেবে পর্ষদ্ প্রশ্নপত্র প্রণেতা এবং মডারেটরদের যথাযথ নির্দেশিকা দিতে পারেন।

আর একটি বিষয় ভাবা যেতে পারে : প্রশ্নপত্র এবং উত্তরপত্র একটিই রাখা যায় কি না। সেক্ষেত্রে একদিকে সীমাহীন উত্তর দেবার প্রবণতা কমানো যাবে। এমততরো প্রশ্ন করার ঝোঁকও কিছুটা নিয়ন্ত্র

করা যাবে, অপরদিকে পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে প্রশ্ন পাচার অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব হবে।

অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে ঃ

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষিকা, শিক্ষকেরা বিষয় শাখা ভিত্তিক বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে যাবেন। প্রতিটি দল নিজ নিজ বিষয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার উপযোগী প্রশ্নপত্র রচনা করবেন, প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরও পৃথক একটি পত্রে উপস্থাপন করবেন। এজন্য একক-অভীক্ষণের ক্ষেত্রে যেভাবে প্রশ্নপত্রের নকশা ও রূপায়ণ পরিকল্পনা তাঁরা করেছিলেন সেভাবেই সমগ্র বিষয় পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে প্রশ্নপত্রের পরিকল্পনা ও বিশ্লেষণ করতে হবে, প্রকৃত প্রশ্নপত্র রচনা করে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে ওই প্রশ্নপত্র ত্রুটিমুক্ত করতে হবে। সম্ভাব্য বাধা বিপত্তি কাটিয়ে উঠে কীভাবে পরীক্ষা এমনতরো পরিকল্পনার ভিত্তিতে পরিচালিত হতে পারে সে সম্পর্কে দলগতভাবে এবং সম্মিলিতভাবে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ উপস্থাপিত করুন।

(এখানে উল্লেখ না করলেও চলে যে বিদ্যালয়ের কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা তাই বার্ষিক পরীক্ষার সামগ্রিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্নপত্রও প্রস্তুত করতে পারেন)।

উত্তরপত্রের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে

প্রশ্নপত্র যদি এভাবে কিছুটা বিজ্ঞানসম্মত করে তোলা যায় তবে উত্তরপত্র মূল্যায়নে তারতম্য ঘটাবার সম্ভবনা অনেকটাই কমিয়ে আনা যেতে পারে। উত্তরপত্র মূল্যায়ন অনেকাংশে সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে। এর সঙ্গে অবশ্য কিছু প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়াও প্রয়োজন, যেমন

1) পরীক্ষার খাতা দেখা বা পরীক্ষা সম্পর্কিত অন্যান্য কাজে শিক্ষিকা-শিক্ষকদের অংশগ্রহণ বাধতামূলক, কর্তব্যের অংশ এবং চাকুরীর আবশ্যিক শর্ত হিসাবে গন্য করতে হবে। একমাত্র গুরুতর অসুস্থতা বা অনিবার্য যুক্তিসঙ্গত কারণ (যেগুলির সপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণপত্র পেশ করতে হবে) ব্যতিরেকে কোনও শিক্ষিকা-শিক্ষককে এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া ঠিক হবে না।

2) কোনও পরীক্ষককে 100 টির বেশি উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য না দিতে পারলেই ভালো হয় যাতে উত্তরপত্রের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর পরীক্ষকের পক্ষে খুঁটিয়ে দেখে নম্বর প্রদান সম্ভব হয়। তবে কোনও শিক্ষিকা-শিক্ষককে 200 টির বেশি খাতা দেওয়া ঠিক হবে না।

3) শিক্ষিকা-শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্র বাড়িতে নিয়ে গিয়ে না দেখে পর্ষদ্ নির্দিষ্ট কয়েকটি কেন্দ্রে বসে উত্তরপত্রের মূল্যায়ন (spot evaluation) করাই যুক্তিসঙ্গত তবে, সেক্ষেত্রে পর্ষদকে ওইসব কেন্দ্রে কিছু পাঠ্যপুস্তক এবং সহায়িকাপুস্তক রাখবার ব্যবস্থা করা উচিত হবে।

প্রতি পরীক্ষককে নমুনা উত্তরপত্রের একটি প্রতিলিপি দিতে পারলে ভালো হয়। প্রধান পরীক্ষক তাঁর কাছের পরীক্ষকদের এটি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন। নমুনা উত্তরপত্রটি নিয়ে পরীক্ষকদের সঙ্গে

আলোচনার মাধ্যমে কোথাও সম্ভাব্য বিকল্প উত্তরের সম্ভবনা থাকলে, সেগুলি নিয়েও সিদ্ধান্ত নি
পারেন।

4) একজন প্রধান পরীক্ষকের অধীনে খুব বেশি সংখ্যক পরীক্ষক রাখা ঠিক নয়।

5) প্রতিটি বিষয়ের প্রধান পরীক্ষকদের নিজেদের মধ্যেও নিবিড় আলোচনার প্রয়োজন যাতে উত্তরপ মূল্যায়নে সমতা বজায় রাখা যায় এবং প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর সম্পর্কে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক যায়।

শিক্ষাবিজ্ঞানের দিক থেকে উত্তরপত্র মূল্যায়ন কালে একই প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর যদি একাধিক হয়, ত যে কোনোও একটি সঠিক উত্তরের জন্য পরীক্ষার্থীকে পুরো নম্বর দিতে হবে।

মৌখিক / প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা

মাধ্যমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষা এবং উচ্চ মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা যেভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেটি অনেক ক্ষেত্রেই ঠিকভাবে হচ্ছে না। কোনোও কোনোও বিদ্যালয় এসব পরীক্ষায় নম্ব দেওয়ার ব্যাপারে সুযোগের অপব্যবহার করে যথেচ্ছ নম্বর দিচ্ছেন এবং এর ফলে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদে মধ্যে নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্য হচ্ছে। এই সমস্যার সমাধানে দুটি বিকল্প পদ্ধতির যে কোনোও একটি অনুসরণের প্রস্তাব ভেবে দেখা যেতে পারে।

1) এই পরীক্ষাগুলি বহিরাগত পরীক্ষকের উপস্থিতিতে বা বিদ্যালয়গুচ্ছের তত্ত্বাবধানে করতে হবে, নতু

2) এই ধরনের পরীক্ষার নম্বর পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের অন্তর্ভুক্ত হবে না। স্নাতক স্তরের পরীক্ষায় আবশ্যি অতিরিক্ত বিষয়ে (compulsory additional subject) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ যেমন বাধ্যতামূল অথচ এই পরীক্ষার নম্বর যেমন পরীক্ষায় প্রাপ্ত মোট নম্বরের মধ্যে গণ্য হয় না, তেমনতরো ব্যবস্থাগ্রহণে কথা ভাবা যেতে পারে।

পরীক্ষা ব্যবস্থায় - বিশেষত উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা আনবার জন্য উত্তরপত্রে ছাত্রী-ছাত্রের নামের পরিবর্তে সংকেতিক নম্বর বা কোড নম্বার ব্যবহার করা সমীচিন।

ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে

ফল প্রকাশের জন্য কম্পিউটারের সহায়তা বর্তমানে গ্রহণ করা হচ্ছে। এটি অবশ্যই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু দে যাচ্ছে এই পদ্ধতিতেও বেশ কিছু ত্রুটি প্রতি বছরই থেকে যাচ্ছে। এই ত্রুটি দূর করতে অবিলম্বে দুটি ব্যব গ্রহণ জরুরী ঃ

1) দ্বিতীয় কোনোও কম্পিউটার সংস্থাকে দিয়ে ফলাফল নির্ণয় করিয়ে দুটি সংস্থা নির্ণীত ফলাফল মিলি নেওয়া (cross - checking করা)

2) নমুনা হিসাবে কিছু উত্তরপত্র নির্বাচিত করে (at random) অভিজ্ঞ কর্মীবৃন্দের বা নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গে (উত্তরপত্র মূল্যায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষিকা-শিক্ষকদের মধ্য থেকে এঁদের বেছে নেওয়া যেতে পারে) দ্বা

ফলাফল সঠিকভাবে নির্ণীত হয়েছে কি না সেটি যাচাই করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

যেসব বিষয়গুলি এতাবৎ উল্লেখিত হল, সরকার, পর্ষদ্ (বা সংসদ) এবং শিক্ষক সংগঠনগুলি সমন্বিতভাবে এবং আন্তরিকভাবে প্রয়াসী হলে পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারে ওই সব প্রস্তাব এই মুহূর্তেই রূপায়ন করা অসম্ভব নয়।

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হিসাবে যেসব ব্যবস্থাদি নেওয়া যেতে পারে, সেগুলির কয়েকটি হল ঃ

- প্রশ্নপত্র রচনা, উত্তরপত্রের মূল্যায়ন, মেধা তালিকা প্রকাশ এসব বিষয়েই কর্মশালার মাধ্যমে সমস্ত শিক্ষিকা-শিক্ষককে এবং পরীক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ব্যাপক অভিমুখীকরণ/অবহিতকরণ।
- অভিভাবক-অভিভাবিকা এবং সমাজের ব্যাপক অংশের মানুষকেও এসব বিষয়ের যৌক্তিকতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা। এজন্য বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাহায্য গ্রহণ করে, বিদ্যালয় ভিত্তিক বা বিদ্যালয়গুচ্ছ ভিত্তিক আলোচনাসভা / কনভেনশান ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাপক সম্প্রচার।
- পাঠক্রম- পাঠ্যসূচিতে মূল্যায়ন এবং পরীক্ষা পরিচালন সম্প্রর্কিত সুস্পষ্ট নির্দেশিকা প্রদান।
- পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নকালে ওইসব নির্দেশিকার যথাযথ প্রতিফলন, বিশেষ করে অনুশীলনী অংশে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রশ্নাবলীর সংকলন। সম্ভব হলে প্রতি বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকেরশেষে সমস্ত পাঠ-এককে জড়িত করে একটি নমুনা প্রশ্নপত্র উপস্থাপন (এজন্য প্রয়োজনে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠাসংখ্যা বাড়াতে হবে)।

সব চাইতে ভালো হয় যদি পর্ষদ্ বা সংসদ পাঠ্যপুস্তকের পাণ্ডুলিপি কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে নিজেরাই প্রস্তুত করে মুদ্রণের জন্য বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার হাতে তুলে দিতে পারেন (নিজেরা প্রকাশ করা যদি বাস্তবে সম্ভব না হয়)।

(খ) মাধ্যমিকে গ্রেডিং

গ্রেডিংয়ের স্বরূপ ঃ

পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্রকে নম্বর স্কেলে মূল্যায়ন করার পর বিভিন্ন অক্ষর-মানে তাদের প্রাপ্ত ফলকে চিহ্নিত করার পদ্ধতি হলো গ্রেডিং। পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্ত ফলটি উদ্দেশ্য-সাধক পাঠক্রমের ওপর অর্জিত দক্ষতার প্রতিফলনের নির্দেশক। গ্রেডিংয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন অক্ষর-গ্রেড বা লেটার-গ্রেডগুলি এক পারম্পর্য সূত্রে বাঁধা থাকে। নম্বরও হলো এক ধরনের গ্রেড। আন্তর্জাতিক স্তরে নম্বর-গ্রেডের স্বীকৃত পরিমাপক বা স্কেলটি হলো ১০১ পয়েন্টের । কিন্তু ভারতে নম্বর-গ্রেডের এই সুবিশাল পরিমাপকটি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো কৃতি-সূচক (পারফরমেন্স ডেসক্রিপ্টর) লেটার গ্রেডের সঙ্গে সংযুক্ত নয়। নম্বর বসিয়ে পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্রের পরিমাপ (কোয়ানটিটেটিভ) সম্ভব, কিন্তু পরীক্ষার্থীর গুণগত (কোয়ালিটেটিভ) মূল্যায়ন সম্ভব নয়। সেটি সম্ভব গ্রেডে। নম্বরকে লেটার গ্রেডে রূপান্তর (ট্রান্সফর্ম) করলেই তা বিশেষ সূচক বা নির্দেশকের কাজ করে। সেই নির্দেশক কৃতি-সূচক বা পারফরমেন্স ডেসক্রিপ্টরে (যেমন — এক্সসেলেন্ট বা চমকপ্রদ, ভালো, মাঝারি, দুর্বল) ফেললে তবেই মূল্যায়ন বা ইভ্যালুয়েশন সম্ভবপর হয়।

গ্রেড হলো গুণগত মান-নির্ণায়ক (কোয়ালিটেটিভ এ্যাসেসমেন্ট) পদ্ধতি। প্রতিটি গ্রেড পরীক্ষার্থীর অগ্রগতি বা কৃতিত্বের (প্রগ্রেস বা অ্যাচিভমেন্ট) সূচক বিশ্বের নানা দেশে নম্বর পরিমাপকের পাশাপাশি লেটার গ্রেড এবং কৃতি-সূচক (পারফরমেন্স ডেসক্রিপ্টর) প্রয়োগের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীর গুণগত মান ও উন্নয়ন-অবনমনের ধারণা পাওয়া যায়। বলা যায়, এই সূচকগুলি সহজ ইঙ্গিতবাহী।

গ্রেডের প্রয়োজন কোথায় ঃ

একটা অভিমত হলো নম্বর-পদ্ধতি পরীক্ষার্থীদের, বিশেষ করে যারা কম নম্বর পায়, তাদের মানসিক চাপ বাড়িয়ে দেয়। নম্বর-পদ্ধতি চালু থাকা ঠিক নয়। দেশ-বিদেশের গবেষণায় দেখা গেছে, গ্রেড-পদ্ধতি ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের কৃত্বিত্ব, অগ্রগতি, দুর্বলতা, ইত্যাদি বুঝতে ভালোমতো সাহায্য করে। ছাত্রছাত্রীর জ্ঞান রপ্ত করার সামর্থ্যের কার্যকর পরিমাপক হিসাবে গ্রেড দেশে-বিদেশে বিশেষ স্বীকৃতি পেয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকারাও গ্রেডের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীর গুণগত অবস্থান বা স্টেটাস সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন। গ্রেডের সাহায্যে ছাত্রছাত্রীদের ঝোঁক বা ট্যালেন্ট বোঝা সম্ভব এবং তাদের বৃত্তি নির্বাচনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ বা কাউন্সেলিং করা সহজ হয়। পিতামাতা, অভিভাবকরাও গ্রেডের মাধ্যমে তাদের সন্ততিদের পড়াশোনার সঠিক অবস্থানটি বুঝে নিতে পারে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে। গ্রেডের মাধ্যমে পড়ুয়ারাও নিজেদের সবলতা-দুর্বলতার আন্দাজ পেতে পারে। এক কথায়, গ্রেড ছাত্রছাত্রীদের শেখায় উৎসাহিত করে। ছাত্রভেদে শেখানোর মানচিত্র রচনায় শিক্ষকদের সঠিক ইঙ্গিত যোগায়।

গ্রেডিংয়ের সুবিধা কোথায় ঃ

গ্রেডিংয়ের প্রধান সুবিধা তিনটি ঃ

(এক) পড়ুয়ার নিজস্ব শেখার ক্ষমতা, উদ্যোগে (স্টুডেন্ট লার্নিং) উৎসাহ যোগায়,

(দুই) পড়ুয়া-শিক্ষক সম্পর্ককে অধিকতর সংবেদী-সংবাহী করে তোলে (সেনসিটিভ-কমিউনিকেটিভ)
(তিন) শেখা-শেখানোয় গুণগত উৎকর্ষের অভিমুখ তীক্ষ্ণতর হয়।

প্রথম সুবিধাটির সূত্রে বলা যায়, পড়ুয়ারা শেখা ও উত্তরদানের কলাকৌশলে এবং নিজেদের খসড়া উত্তরগুলিকে ঘষা -মাজার বিষয়ে অধিকতর যত্নবান হয়ে ওঠে। কেন-না, গ্রেড বিষয়ে সচেতনতার ফলে উন্নততর গ্রেডে পৌঁছবার স্পৃহা তাদের মধ্যে দেখা দেয়। এসবের ফলে স্বশিখন, সাথী-পড়ুয়ার সাহায্যে শিখন (পিয়ার লার্নিং) এবং শিক্ষকদের শিক্ষাদানের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদানের (ইন্টারোক্টিভিটি) কার্যকরী বাতাবরণ তৈরি হয়।

গ্রেডিং পদ্ধতিতে একাধিক পরীক্ষার মিলিত ফলাফলের (কিউমুলেটিভ গ্রেডিং) ওপর গুরুত্ব থাকায় এক পরীক্ষার অমোঘতাজনিত হতাশা-বিষন্নতা-মানসিক চাপ থেকে পড়ুয়ারা মুক্ত থাকতে পারে বলে উন্নততর গ্রেডে পৌঁছবার স্পৃহাও তাদের মধ্যে অব্যাহত থাকে । নিজেদের তৈরি পূর্বের উত্তরগুলির চেয়ে পরের উত্তরগুলি গুণগত মানোন্নয়নে তাদের মধ্যে লেখাপড়ার নবতর উদ্যম তৈরি হয়।

দ্বিতীয় সুবিধাটির সূত্রে বলা যায়, তাদের লেখা উত্তরগুলির বিষয়ে শিক্ষক-পরীক্ষকদের কাথ থেকে অধিকতর প্রতিপুষ্টি (ফিটব্যাক) পড়ুয়ারা পেতে পারে। এতে উত্তরপ্রদানের লক্ষ্যগুলি ও তাদের কাছে শিক্ষকদের প্রত্যাশার বিষয়ে তাদের ধারণাও স্বচ্ছ হয়।

তৃতীয় সুবিধাটির ক্ষেত্রে ছোটো করে বলতে গেলে, পড়ুয়াদের ক্রমোন্নতির নির্দেশকগুলি (ডেভালপমেন্ট বেঞ্চমার্কস) গ্রেডিং ব্যবস্থায় সুস্পষ্ট থাকায় শিখন-শিক্ষণের গুণগত উৎকর্ষের যাত্রাপথটি আলোকিত হয়ে ওঠে। শিক্ষার্থীর দেওয়া লিখিত উত্তরগুলিকে নির্দিষ্ট কৃতি-সূচক বা পারফরমেন্স ডেসক্রিপ্টরে ফেলার কাজে শিক্ষিকা-শিক্ষকরা অভ্যস্ত হয়ে উঠলে মূল্যায়ন ব্যবস্থার সঙ্গো শিক্ষাকার্যক্রমের উদ্দেশ্যের সম্পর্ক (কোর্স অবজেকটিভস) বোঝার ক্ষেত্রগুলিও স্পষ্ট হয়।

পড়ুয়ারা কেমন শিখছে গ্রেড পদ্ধতিতে সেটা সুস্পষ্ট হয় ঃ

১. উত্তরের উৎকর্ষ চিহ্নিতকরণে পড়ুয়ার দক্ষ হয়ে ওঠে।
২. ভালো উত্তর সংগঠনে পড়ুয়ারা অনুপ্রাণিত হয়।
৩. পড়ুয়াদের লেখাপড়ার অগ্রগতির বিষয়ে শিক্ষকদের অভিমত স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।
৪. পড়ুয়াদের শেখা ও না-শেখার ক্ষেত্রগুলি শিক্ষকদের কাছ থেকে ধরা পড়ে। (পাঠক্রমের একক-উপএকক ভিত্তিক বিভাজনের সুবাদে)
৫. শিক্ষার পরবর্তী স্তরগুলির জন্য পড়ুয়া-নির্বাচন সহজ হয়।

গ্রেড প্রদান পদ্ধতি গৃহীত ও প্রযুক্ত হলেও দেখতে হবে যে গ্রেডিংয়ের ওপর যেন অতিরিক্ত জোর না পড়ে (ওভার এমফ্যাসিস)। নিঃসন্দেহে ভালো মানের গ্রেড পেলে পড়ুয়ারা বেশি শেখায় আগ্রহী হয়। কিন্তু পাশাপাশি তাদের এ কথাটাও মনে রাখা দরকার যে ভালো গ্রেড পাওয়াটা শিক্ষার লক্ষ্য নয়। শিক্ষার লক্ষ্য হলো জ্ঞানার্জন। ভালো গ্রেড পাওয়াটা যেমন জরুরী, তেমনি খারাপ গ্রেডকে মাথায় মেনে নিয়ে আরো ভালো গ্রেডের দিকে এগিয়ে যাওয়াটাও জরুরী।

গ্রেড ব্যবস্থার স্বরূপ ও প্রণালী ছাত্রদের বুঝিয়ে বলা দরকার। এগুলো বোঝানো হয়ে গেলে গ্রেডের ওপর গুরুত্ব আরোপের বিষয়টি এড়িয়ে চলা দরকার। না হলে উঁচু নম্বর পাওয়ার জন্য যে মানসিক চাপ তৈরি হয়, ভালো গ্রেড পাওয়ার জন্যও সেরকম চাপ পড়ুয়াদের অস্থির করে তুলতে পারে। ফলে পড়ুয়ার লেখাপড়ার অগ্রগতির পরিমাপক হিসেবে গ্রেডের ভূমিকাটি নজরের বাইরে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

গ্রেড পদ্ধতির যাচাই কৌশল (এ্যাসেসমেন্ট) বৈচিত্র্য ঃ

সারা বিশ্বের পরীক্ষাব্যবস্থায় গ্রেড পদ্ধতির নানা রকমফের (রেঞ্জ অফ ভ্যারাইটি) পরিলক্ষিত হয়। বিস্তর বিষয়ের পরীক্ষার ও নানা ধরনের কর্ম-প্রকল্পের (এ্যাকটিভিটি) মূল্যায়নে এইসব গ্রেড পদ্ধতির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেসব ক্ষেত্রে নানা স্তরের কর্মকৃতির (পারফরমেন্স) সম্ভাবনা থাকে সেখানেই গ্রেড পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়ে থাকে। এইসব ক্ষেত্রে নানা কৃতি -সূচক (পারফরমেন্স ডেসক্রিপ্টর) ব্যবহার হয়, যেমন চমৎকার (এক্সসেলেন্ট), বেশ ভালো (ভেরি গুড), মাঝারি মানের (এ্যাভারেজ), তত ভালো নয় (নট সো গুড) ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে নম্বর গ্রেডেরও ব্যবহার দেখা যায় যথা — ১,২,৩,৪,৫ ইত্যাদি। এক কথায়, গ্রেডিং হলো ব্যক্তিক প্রয়াসকে (সাবজেকটিভ টাস্ক) নৈর্ব্যক্তিক এবং সুসমঞ্জস (অবজেকটিভ এ্যান্ড কনসিসটেন্ট) যাচাই-বিন্যাসের ছকে (এ্যাসেসমেন্ট প্যারাডিম) ফেলা।

গ্রেডিংয়ের আন্তর্জাতিক চালচিত্র ঃ

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের (এন সি ই আর টি) অন্তর্গত ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশনাল মেজারমেন্ট এ্যান্ডইভ্যালুয়েশন ২০০৪ সালে 'গ্রেডিং-এর ইন্টারন্যাশনাল পারস্পেকটিভ' নামে একটি সমীক্ষাপত্র (মনোগ্রাফ) প্রকাশ করে। মনোগ্রাফটিতে ২০০৩ সালের রাষ্ট্রসঙ্ঘের হিউম্যান ডেভালপমেন্ট রিপোর্টের নিরিখে ১৬টি উন্নত এবং ২৫টি উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশের বিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষাস্তরে অনুসৃত বিভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতির চিত্র তুলে ধরা হয়।

নীচের টেবিলগুলিতে (পরবর্তী পৃষ্ঠায়) সেই চিত্র সুত্রায়িত আকারে তুলে ধরা হলো ঃ

(১) ক্রমিক নং	(২) দেশের নাম	(৩) নম্বর স্কেল	(৪) লেটার গ্রেড	(৫) পারফরমেন্স ডেসক্রিপ্টর / পারসেনটাইল
১	আমেরিকা	৫ পয়েন্ট	A.B.C.D.F	৫ স্তর বা লেভেল এক্সসেলেন্ট, গুড, এ্যাভারেজ/ফেয়ার, পুওর/পাস, ফেলিওর
২	কানাডা	১০১ পয়েন্ট	ABC+C.C.-F	৬ স্তর ৮৬-১০০%, ৭৩-৮৫%, ৬৭-৭২%, ৬০-৬৬%, ৫০-৫৯%, ০-৪৯%
৩	অস্ট্রেলিয়া (উত্তরাঞ্চল)	২০ পয়েন্ট	A.B.C.D.E অথবা	৫ / ৬ স্তর এক্সসেলেন্ট অ্যাচিভমেন্ট, হাই অ্যাচিভমেন্ট, সাউন্ডঅ্যাচিভমেন্ট.

(১) ক্রমিক নং	(২) দেশের নাম	(৩) নম্বর স্কেল	(৪) লেটার গ্রেড	(৫) পারফরমেন্স ডেসক্রিপ্টর / পারসেনটাইল
			A+A.B.C.D.E	লিমিটেড অ্যাচিভমেন্ট, ইনএ্যাডিকোয়েট অ্যাচিভমেন্ট অথবা আউটস্ট্যান্ডিং অ্যাচিভমেন্ট এবং ওপরের পাঁচটি
৪	সুইডেন	৩ পয়েন্ট	MVG,VG,G.IG	৪ স্তর পাস উইথ স্পেশাল ডিসটিংশন (ভ্যালু : ৩ পয়েন্ট), স্পেশাল ডিসটিংশন (ভ্যালু : ২ পয়েন্ট). পাস (ভ্যালু : ১ পয়েন্ট) ফেল (ভ্যালু : ০ পয়েন্ট)
৫	সুইজারল্যান্ড	১০ পয়েন্ট	—	৫ স্তর ভেরি গুড, গুড, ফেয়ার, পাস, পুওর / ফেল, ফেল
৬	জার্মানি	১৫ পয়েন্ট		
		১৫,১৪,১৩	A1.A2.A3	ভেরি গুড
		১২,১১,১০		গুড
		৯,৮,৭		স্যাটিসফ্যাকটরি
		৬,৫,৪		পাস
		৩,২,১,০		ফেল
৭	ফ্রান্স	২১ পয়েন্ট	—	৪ স্তর
		১৬-২১		এক্সেলেন্ট
		১৪-১৫		ভেরি গুড
		১২-১৩		গুড
		১০-১১		স্যাটিসফ্যাকটরি
		১০ এর নিচে		ফেল
৮	স্পেন	১০ পয়েন্ট		৬ স্তর
		১০		ডিসটিংশন উইথ অনার
		৮.৫-৯		ডিসটিংশন
		৭-৮.৪		ভেরি গুড
		৬-৬.৯		গুড
		৫-৬		স্যাটিসফ্যাকটরি
		৫ এর নিচে		ফেল
৯	ইংলন্ড (ও-লেভেল)	৬ পয়েন্ট	A.B.C.D.E.এবং N	৬ স্তর 80-100 % , 70-79%, 60-69%, 50-59%, 40-49%, 30-39%
১০	পর্তুগাল (ও-লেভেল)	২১ পয়েন্ট		৬ স্তর 80-100 % , 70-79%, 60-69%, 50-59%, 40-49%, 30-39%

(১) ক্রমিক নং	(২) দেশের নাম	(৩) নম্বর স্কেল	(৪) লেটার গ্রেড	(৫) পারফরমেন্স ডেসক্রিপ্টর / পারসেনটাইল
১০	পর্তুগাল (ও-লেভেল) ২০,১৯,১৮,১৭ ১৬,১৫,১৪,১৩ ১২,১১,১০ (১০এর নিচে যারা পায় তাদের কোন পয়েন্ট হয় না	২১ পয়েন্ট ১০১ পয়েন্ট	A1,A2,B1.B2.B3 C1.C2.C3:D1.D2.D3	১১টি স্তর (পয়েন্টভিত্তিক) 100.90.85.80.75
১১	ডেনমার্ক	১০ পয়েন্ট ১০১ পয়েন্ট	——	——
১২	আইসল্যান্ড	৬ পয়েন্ট ১০১ পয়েন্ট	——	——
১৩	জাপান	৩ পয়েন্ট ৩,২,১	——	৩ স্তর হাইয়েস্ট গ্রেড, মিডিল গ্রেড, লোয়ার গ্রেড
১৪	নিউজিল্যান্ড	৯ পয়েন্ট ৫ পয়েন্ট	A.B.C.D.E	——
১৫	বেলজিয়াম	২০ পয়েন্ট	——	——
১৬	গ্রীস	১০ পয়েন্ট/ ২০ পয়েন্ট	A.B.C.D.E	৫ স্তর 17-20,14-16.99,12-13.99,10-11.99,below 10:Fail
১৭	লিথুয়ানিয়া	৫ পয়েন্ট/ ১০ পয়েন্ট/ ১০১ পয়েন্ট	——	১০ স্তর
১৮	ইরান	২১ পয়েন্ট/ ১০১ পয়েন্ট	A.B.C.D	——
১৯	পেরু	২১ পয়েন্ট/ ১০১ পয়েন্ট	——	——
২০	রাশিয়া	৮ পয়েন্ট ৫,৪,৩,১	——	৪ স্তর এক্সসেলেন্ট, গুড, স্যাটিসফ্যাকটরি (পাস), আনস্যাটিসফ্যাকটরি (ফেল)
২১	পোলান্ড	৬ পয়েন্ট 1,2,3,4,5,6	——	৬ স্তর আনস্যাটিসফ্যাকটরি মিডিওকার, স্যাটিসফ্যাকটরি, গুড, ভেরি গুড, এক্সসেলেন্ট

(১) ক্রমিক নং	(২) দেশের নাম	(৩) নম্বর স্কেল	(৪) লেটার গ্রেড	(৫) পারফরমেন্স ডেসক্রিপ্টর / পারসেনটাইল
২২	টার্কি	৬ পয়েন্ট / ১০ পয়েন্ট	A.B.C.D.E.F	——
২৩	ইন্দোনেশিয়া	১০ পয়েন্ট 1-4,5,6,7, 8,9,10	——	৩ স্তর ফেল, বিলো অ্যাভারেজ, অ্যাভারেজ, অ্যাবাভ অ্যাভারেজ, গুড, ভেরি গুড, এক্সসেলেন্ট
২৪	চীন	১০১ পয়েন্ট ১০১ পয়েন্ট	A.B.C.D.F	৩ স্তর এক্সসেলেন্ট, গুড, অ্যাভারেজ স্যাটিসফ্যাকটরি, আনস্যাটিসফ্যাকটরি (ফেল)
২৫	ব্রাজিল	১১ পয়েন্ট	A-D/E-B.C.I.M.S	৪-৬ স্তর
২৬	জামবিয়া	৯ পয়েন্ট	A-E	——
২৭	নাইজিরিয়া	৯ পয়েন্ট/ ৫ পয়েন্ট	A-F	৫ স্তর
২৮	সাউথ কোরিয়া	১০১ পয়েন্ট	A-E	৫ স্তর
২৯	থাইল্যান্ড	৫ পয়েন্ট	——	৫ স্তর
৩০	সিঙ্গাপুর	১০১ পয়েন্ট/ ৯ পয়েন্ট ৫ পয়েন্ট	A1-F9/A-E	৫ স্তর
৩১	রোমানিয়া	১০ পয়েন্ট	——	——
৩২	ইয়েমেন	৫ পয়েন্ট	——	৫ স্তর
৩৩	জিম্বাবুয়ে	৫ পয়েন্ট ১০ পয়েন্ট	A-F	৬ স্তর / ৫ স্তর
৩৪	সাউথ আফ্রিকা	১০১ পয়েন্ট	A-F & H	——
৩৫	ইজিপ্ট	১০১ পয়েন্ট	——	৪ স্তর
৩৬	শ্রীলঙ্কা	১০১ পয়েন্ট	A.B.C.S. & F	৫ স্তর
৩৭	পাকিস্তান	১০১ পয়েন্ট/ ৬ পয়েন্ট	A-F	৬ স্তর
৩৮	আর্জেন্টিনা	১০ পয়েন্ট/ ১১ পয়েন্ট	——	৬ স্তর
৩৯	বাংলাদেশ	১০১ পয়েন্ট	——	৪ স্তর
৪০	মালয়েশিয়া	৯ পয়েন্ট	A-F	৪ স্তর
৪১	ভারত	১০১ পয়েন্ট/ ৯ পয়েন্ট	A1-D2 & E CBSE	৫ স্তর Distinction/1st class/2nd class/ Pass/Fail

নম্বর স্কেলের ধরনের ভিত্তিতে দেশগত অবস্থানের টেবিল	
নম্বর স্কেল	দেশের সংখ্যা
৩ পয়েন্ট	২
৪ পয়েন্ট	১
৫ পয়েন্ট	৮
৬ পয়েন্ট	৫
৯ পয়েন্ট	৫
১০ পয়েন্ট	৮
১১ পয়েন্ট	২
১৫ পয়েন্ট	১
২০ পয়েন্ট	৩
২১ পয়েন্ট	৪
১০১ পয়েন্ট	১৮

কৃতি-সূচক (পারফরমেন্স ডেসক্রিপ্টরের ভিত্তিতে দেশগত অবস্থানের টেবিল	
কৃতি-সূচকের স্তর সংখ্যা	দেশের সংখ্যা
৩ স্তর বা লেভেল	১
৪ স্তর	৭
৫ স্তর	১৪
৬ স্তর	৮
৭ স্তর	১
১০ স্তর	১

পরিসংখ্যান থেকে যা পাওয়া গেল ঃ

১৬টি উন্নত দেশের মধ্যে ৪টি দেশ ১০১ পয়েন্ট স্কেল ব্যবহার করে। এরা হলো কানাডা, পর্তুগাল, ডেনমার্ক ও আইসল্যান্ড। তাও এরা ছোটো ছোটো নম্বর স্কেলের দিকে ঝুঁকছে।

২৪টি উন্নতশীল দেশের মধ্যে ১৩টি দেশ ১০১ পয়েন্ট স্কেল ব্যবহার করে। পাশাপাশি এরা ছোটো নম্বর স্কেল এবং পারফরমেন্স ডেসক্রিপ্টর বা কৃতি-সূচকও ব্যবহার করে। একটা ব্যাপার খুব স্পষ্ট। কোনো দেশেই স্কেলের বিষয়ে কোন জাতীয় ফতোয়া (ন্যাশনাল ম্যানডেট) নেই। স্কুলগুলিকে গ্রেডের বিষয়ে সম্পূর্ণ অটোনমি দেওয়া হয়েছে।

উপসংহার ঃ কিছু ভাবনা, কিছু প্রস্তাব

মূল্যায়নের দ্বিবিধ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হলো

১. পাঠক্রম ও পাঠ্যবস্তুর অন্তর্গত জ্ঞান-বোধ-প্রয়োগ-দক্ষতা কেন্দ্রিক শিখন সামর্থ্যের একক-উপএককগুলি পড়ুয়ারা কতোটা রপ্ত করেছে এবং কতোটাই বা তার আয়ত্বের বাইরে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট পরিমাপক বা স্কেলের সাহায্যে আন্দাজ পাওয়া। এই পরিমাপক বা স্কেলটি নম্বরের হতে পারে বা পয়েন্টের। কৃতি-সূচকটি (পারফরমেন্স ডেসক্রিপ্টর) ৫ বা ৪ লেভেল স্তরের হতে পারে, আবার ১০.১১ স্তরেরও হতে পারে। একটা কোর্সের চূড়ান্ত পরীক্ষায় সাধারণত ৫ স্তরেরই হয়।

২. কিন্তু বিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলির ক্ষেত্রে যেহেতু মূল্যায়নটি পড়ুয়ার উন্নতিসাধক বা ডেভালপমেন্টাল, সে কারণে অনুপুঙ্খ সংশোধনী ব্যবস্থা বা রেমেডিয়াল মেজারস্-এর জন্য ১০-১১ স্তরের হলে বিশেষ সুবিধার হয়। সাথী-পড়ুয়ার সাহায্যে সংশোধন বা পিয়ার কারেকশনের কর্মসূচির ব্যবস্থাও জরুরী । এতে গ্রেড ডেভালপমেন্টে পড়ুয়াদের মধ্যে উৎসাহ বাড়বে। এসবের মধ্যদিয়ে চূড়ান্ত মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য পড়ুয়ার প্রস্তুতির কাজও (স্টুডেন্ট প্রিপারেশন) এগোবে।

বিদ্যালয়-অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন ব্যবস্থা ও মাধ্যমিকের মূল্যায়ন ব্যবস্থার লক্ষ্য ভিন্নতর। বিদ্যালয়-অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন হলো উন্নতিসাধক বা ডেভালপমেন্টাল। শিখন সামর্থ্যের দুর্বলতা চিহ্নিত করে সংশোধনীর ব্যবস্থা করা সুদীর্ঘ বিদ্যালয়কালীন পর্যায়ে (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম বা নবম শ্রেণি) একটা জরুরী কাজ।

মাধ্যমিকের মতো চূড়ান্ত পরীক্ষায় মূল্যায়ন হলো বিচার বিশেষ। যা শিখছে তার ভিত্তিতে মার্কা দিয়ে পরবর্তী উচ্চতর স্তরে ভর্তি হওয়ার বা বৃত্তি নির্বাচনের সুযোগ গ্রহণের ছাড়পত্র দেওয়া।

সুতরাং, অষ্টম বা নবম শ্রেণি পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ও সঠিক মূল্যায়নের (সি সি ই) ব্যবস্থা খুবই সঙ্গত। তাৎক্ষণিক (অর্থাৎ, ক্লাসে পড়ানোর সময়) , এককভিত্তিক সাপ্তাহিক, পার্বিক, প্রান্তিক বা সিমেস্টার প্রভৃতির সমন্বয়ে নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন ও সংশোধনী পাঠের মাধ্যমে পড়ুয়ার উন্নতির নির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণই বিদ্যালয়-অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মূল কথা।

নিরবচ্ছিন্ন ও সঠিক মূল্যায়নের একটা পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা (হোলিস্টিক প্ল্যানিং) থাকা দরকার যেটি গ্রেডিং ব্যবস্থার মূল লক্ষ্যের —পড়ুয়া প্রস্তুতি বা স্টুডেন্ট প্রিপারেশনের — সঙ্গে সম্পৃক্ত । এই পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনাটিকে এইভাবে ভাবা যেতে পারে ঃ

১. প্রথমে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিভিন্ন বিষয়ের পাঠক্রম বা পাঠ্যবস্তুকে পাঠদানের একক-উপএককে বিশ্লেষণ করবেন।

২. তারপর সেইসব একক-উপএককের বিষয়গত উপাদানকে জ্ঞান-বোধ-প্রয়োগ-দক্ষতা সহায়ক হিসাবে চিহ্নিতকরণ করবেন।

৩. এরপর, ক্লাস পিরিয়ডে এইসব একক এবং উপএককগুলিকে বিন্যস্ত করে একটি রুটিন তৈরি করবেন। এই রুটিনের সঙ্গে বর্ষব্যাপী একটি এ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার তৈরি করবেন। রুটিন ও এ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার বছরের প্রারম্ভে ছাত্রছাত্রীদের জানিয়ে দিতে হবে। রুটিন ও ক্যালেন্ডারে নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের জন্য নির্দিষ্ট পিরিয়ড ও দিন চিহ্নিত করা থাকবে।

গ্রেডিংয়ের উদ্দেশ্য ও কৃৎকৌশলকে ঠিক ঠিকভাবে কাজে লাগাতে গেলে ওপরের পূর্ণাঙ্গ কর্মপরিকল্পনাটি এক অনিবার্য অনুষঙ্গ।

লেখাপড়ার পাশাপাশি চলে আনুষঙ্গিক শিক্ষা (স্কলাস্টিক ও কো-স্কলাস্টিক বা কো-ক্যারিকুলার) । সহপাঠক্রমিক বা কো-ক্যারিকুলার পড়ুয়াদের পূর্ণাঙ্গ মানুষ হতে সাহায্য করে। এখন চলেছে 'জীবনশৈলী

শিক্ষা'। পড়ুয়াদের মধ্যে সুস্থ বোধ, সুস্থ রুচি, আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা জ্ঞান তৈরি করাও স্কুলশিক্ষার অন্যতম শর্ত। পরীক্ষা বা মূল্যায়ন ব্যবস্থায় এগুলি এলে পড়ুয়াদের সাংস্কৃতিক চর্চা উৎসাহিত হবে। এসব ক্ষেত্রে লেটার গ্রেড স্কেলে পড়ুয়াদের বিভিন্ন কো-স্কলাস্টিক কাজকর্মের মূল্যায়ন চালু হলে এবং সম্বৎসরের বিষয়গত মূল্যায়নের সঙ্গে যোগ করে ওপরের ক্লাসে ওঠার বিষয় বিবেচিত হলে জীবনশৈলী সমেত অন্যান্য সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম অর্থবহ হয়ে উঠবে।

বিদ্যালয়-অভ্যন্তরীণ নিরবচ্ছিন্ন ও সঠিক মূল্যায়ন ব্যবস্থায় গ্রেড পদ্ধতি প্রয়োগে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে মাধ্যমিকে গ্রেড প্রদানের যৌক্তিকতায় শিক্ষকসমাজ, ছাত্রসমাজ ও বৃহত্তর সমাজ আস্থাশীল হবে বলে আশা করা যায়।

বিদ্যালয়গুচ্ছ ঃ ধারণা এবং প্রয়োগ

পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যালয় শিক্ষার যে ব্যাপক প্রসার ঘটেছে তা সকল স্তরের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পিছিয়ে পড়া মানুষদের মধ্যেও সন্তান-সন্ততিদের সাধারণের জন্য বিদ্যালয়ে পাঠাবার আগ্রহ বেড়েছে এবং সমাজের দরিদ্রতম অংশের মধ্যেও গণতান্ত্রিক শিক্ষার আলো লাভের আকাঙ্ক্ষা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু পরিকাঠামোর অভাব এবং শিক্ষার্থীদের জন্য শিখন প্রকৌশলের মান সর্বত্র সমান না থাকার ফলে শিক্ষার গুণগত মান অর্জনে একই ধরনের ফল লাভ করা যাচ্ছে না। কিন্তু শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ব্যতীত শিক্ষার অগ্রগতি সম্ভব নয়।

ডঃ ডি এস কোঠারির নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪ - ৬৬) উল্লেখ ক'রেছে দেশের বিদ্যালয়গুলির মধ্যে সামাজিক সমন্বয় নেই, তাই কমিশন প্রতিবেশী বিদ্যালয়গুলির (neighbourhood school) সমন্বয়ের সম্পর্ক স্থাপনের সুপারিশ করেছিল। বিভিন্ন কারণে এই ব্যবস্থাকে বাস্তবায়িত করা যায় নি। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত ধারণা স্পষ্ট করে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমেই বিদ্যালয়গুলির গুণমানের উন্নতি সাধন সম্ভব। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয়গুচ্ছ তৈরি করার পরিবেশ প্রশস্ত, তার কারণগুলি মুলতঃ

ক) সরকার পোষিত বিদ্যালয়গুলির পরিচালন সমিতির গঠন প্রায় একই ধরনের

খ) কেন্দ্রীয়ভাবে School Service Commission (এস এস সি) বিদ্যালয়গুলির শূন্য পদের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করে। শহর ও গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়ে এখন সমানভাবে মেধা সম্পন্ন শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী কাজে যোগ দিচ্ছেন।

গ) সরকারী অনুদান দেওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়গুলির প্রয়োজনের কথা বিবেচিত হ'চ্ছে ।

ঘ) শিখন-শেখানোর কাজে বর্তমান পরিকাঠামোকে পরিকল্পিতভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষ পরিবেশ ও মানোন্নয়ন করার কথা ডঃ কোঠারি, ডঃ অশোক মিত্র ও অধ্যাপক রঞ্জু গোপাল মুখোপাধ্যায় কমিটি বলেছে। বিদ্যালয়গুচ্ছ এই প্রক্রিয়ায় সদর্থক ভূমিকা পালন করতে পারে ।

ঃ প্রস্তাবনা ঃ

বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়া উপাদান এবং ধারার সামঞ্জস্য রক্ষা করার লক্ষ্যে ও যতখানি সম্ভব তাদের চেতনার সুষম বিকাশের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় গুচ্ছের ধারণা সৃষ্ট হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক বা প্রশাসনিক সীমার অন্তর্গত সকল জুনিয়ার হাই, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে নিয়ে বিদ্যালয়গুচ্ছ তৈরি করা সম্ভব। এই ব্যাপারে উপরিউক্ত দুটি শিক্ষা কমিশন, রাজ্য শিক্ষা কমিটি (২০০১-০২) ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্গণ যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তা এখন আর দেরি না করে বাস্তবায়িত করতে হবে সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে।

সরকার পোষিত বিদ্যালয়গুলি এলাকার মানুষের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। সরকারী অনুদান সত্ত্বেও

বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পরিকাঠামোগত ঘাটতি রয়েছে। এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে নানা রকমের তারতম্য বিদ্যমান। এই তারতম্য ও পরিকাঠামোগত ঘাটতির পরিপূরক ব্যবস্থা হিসাবে বিদ্যালয়গুচ্ছের প্রয়োজন অত্যন্ত গভীরভাবে রয়েছে। পরিকাঠামোগত বৈষম্য ও বিভিন্ন তারতম্যের ফলে অভিভাবকদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিদ্যালয় এই ধরনের ধারণার সৃষ্টি হ'চ্ছে এবং এই প্রবনতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত ও পরিমানগত সুযোগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যৌথ চিন্তা ভাবনা শুরু করার প্রয়োজন রয়েছে এবং তা যত তাড়াতাড়ি করা সম্ভব ততই মঙ্গল। এটা সুবিদিত যে সাধারণের জন্য বিদ্যালয় ব্যবস্থার ওপর ধারাবাহিক ভাবে আক্রমণ চলছে, সেগুলিকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টাও অব্যাহত। এটাকে ঠেকাতে বিদ্যালয়গুচ্ছের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অন্যথায় সমগ্র গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে একটা নঞর্থক ধারণা তৈরি করা হবে এবং ফলশ্রুতিতে এই ব্যবস্থা সম্পর্কে সমাজেরও অনাস্থা তৈরি হবে।

নতুন বিদ্যালয়গুলির মধ্যে পরিকাঠামোর সাজুয্য নেই — এটা স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের পাঠদান ও শৃঙ্খলা রক্ষার আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও আর্থ-সামাজিক কারণে অথবা সম মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর অভাবে প্রয়োজনীয় অগ্রগতি (মেধা ও আর্থসামাজিক বিভাজনের কারণে) না পাওয়ায় বিদ্যালয়-এর ভাবমূর্তি সম্পর্কে নানা মহল থেকে অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য করা হ'য়ে থাকে। এই ধরনের মন্তব্য শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের নিত্যদিনের মানসিক পীড়ার ও উৎসাহহীনতার কারণ হ'চ্ছে।

কোনো কোনো বিদ্যালয়ে একই বিষয়ের একাধিক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী রয়েছেন। আবার কোনো কোনো বিদ্যালয়ে একজনও নেই — এ রকম বহু উদাহরণ রয়েছে। পরীক্ষাগার, গ্রন্থাগার, খেলার মাঠ, খেলার সরঞ্জাম ইত্যাদির ঘাটতি রয়েছে, আবার কোনো কোনো বিদ্যালয়ে এগুলি রয়েছে কিন্তু পরিপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয় না। বিদ্যালয়গুলির পার্থক্যের ফলে কাম্য মানে শিক্ষার্থীদের নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। বিদ্যালয়গুচ্ছ সম্পদ ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে এই পার্থক্য কমাতে সক্ষম।

বিগত কয়েক বছর ধরে রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তর ও মধ্যশিক্ষা পর্যদের পক্ষ থেকে বিদ্যালয়গুচ্ছ গঠনের বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা হ'চ্ছে। বিচ্ছিন্নভাবে কোনো কোনো অঞ্চলে বিদ্যালয়গুচ্ছ তৈরি হ'চ্ছে কিন্তু সামগ্রিকভাবে সকলস্তরে এই কাজটি সুসংহত করা যায়নি।

ঃ বিদ্যালয়গুচ্ছের গঠন ঃ

নির্দিষ্ট এলাকার ৬ - ১০ টি বিদ্যালয় নিয়ে এটা গঠন করা যেতে পারে। সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হবে যাগাযোগ ব্যবস্থা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট ইত্যাদির ওপর দৃষ্টি রেখে। নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নিয়ে এটি তৈরি করা সঙ্গত।

ঃ বিদ্যালয়গুচ্ছের কার্যাবলী ঃ

ক) শিখন - শেখানোর কৃৎকৌশল সম্বন্ধে সকলের জন্য প্রযোজ্য কর্মকান্ড, মূল্যায়ন কার্যক্রম, সহ-পাঠক্রমিক, সমাজসেবা মূলক কাজ ও শিবির সম্বন্ধে যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ ও রূপায়ণ।

খ) সদস্য বিদ্যালয়গুলির মধ্যে গ্রন্থাগার, পরীক্ষাগার, শিক্ষা উপকরণ, খেলার মাঠ, সভাগৃহ ইত্যাদির প্রয়োজন ভিত্তিক ব্যবহার সাধারণের জন্য গণ্য ক'রে।

গ) শারীর শিক্ষা, খেলাধূলা, সঙ্গীত, কর্ম শিক্ষা, ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শিক্ষক - শিক্ষয়িত্রীদের অভিজ্ঞতা ইত্যাদির প্রয়োজনানুগ ব্যবহার।

ঘ) অভিভাবক, পিতামাতা, স্থানীয় অধিবাসী ও সদস্য বিদ্যালয়গুলির মধ্যে কার্যকরী সম্পর্ক স্থাপন।

ঙ) সদস্য বিদ্যালয়গুলির যৌথ দায়িত্বে পরিদর্শন ও মানোন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ।

তবে সমস্ত কর্মকান্ডই হবে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে। একে অপরকে সম্মান প্রদর্শন করে প্রসারিত গণতান্ত্রিকতার পথেই এগিয়ে যেতে সাহায্য করবেন।

ঃ বিদ্যালয়গুচ্ছ গঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য ঃ

ক) সর্বজনীন শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করবে সমস্ত শিশুকেই বিদ্যালয়ে ভর্তি করা ও বিদ্যালয় ছুটদের সংখ্যা যথা সম্ভব হ্রাস করার মাধ্যমে।

খ) পরিস্থিতির চাহিদানুযায়ী সমস্ত শিক্ষার্থীদের উন্নতমানের শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা।

গ) শিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য সামাজিক ন্যায় বিচার সুনিশ্চিত করা ও সমাজের সমস্ত শ্রেণির মানুষকে যুক্ত করে সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগ বিস্তৃত করা।

ঘ) সদস্য বিদ্যালয়গুলির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার পরিমন্ডল সৃষ্টি করা — সেই সঙ্গে পারস্পরিক সাহায্যের হাত প্রশস্ত করা।

ঙ) বিদ্যালয়গুচ্ছের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহমর্মিতা ও স্বাস্থ্য চেতনাসহ সামাজিক চেতনার প্রসার ঘটানো।

চ) দেশীয় ও আঞ্চলিক সংস্কৃতির বিকাশ।

ছ) সদস্য বিদ্যালয়গুলির পরিচালন সমিতির সদস্যের মধ্যে অঞ্চলের সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষার আরও উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি।

ঃ বিদ্যালয়গুচ্ছের প্রধান করণীয় বিষয় ঃ

ক) এলাকার সমস্ত বিদ্যালয়ের সর্বপ্রকারের সমস্যা চিহ্নিতকরণ।

খ) . সমস্যাগুলির সমাধানের সম্ভাব্য ও যথার্থ উপায় নির্ধারণ।

গ) সহমতের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের রূপায়ন।

ঘ) সিদ্ধান্তগুলিকে কার্যকর করার জন্য সদস্য বিদ্যালয়গুলিকে উৎসাহ প্রদান।

ঙ) যৌথভাবে কাজকর্ম করার মানসিকতা বৃদ্ধি।

ঃ কর্মসূচি ঃ

ক) সার্বিক শিক্ষাবর্ষপঞ্জী প্রস্তুত করা, শিক্ষাবর্ষের শুরুতে শিক্ষার্থীদের সময়-সারণি, পর্যায় ভিত্তিক বিভাজিত পাঠক্রম প্রদান, সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমের যৌথ পরিকল্পনা।

খ) অভিন্ন পরীক্ষাসূচি, প্রশ্নপত্র রচনা ও মূল্যায়ন। অভিন্ন পাঠ্য পুস্তক তালিকা প্রণয়ন।

গ) অভিন্ন ছুটির তালিকা প্রণয়ন ও সম্পদের যৌথ ব্যবহারের পরিকল্পনা। দরিদ্র ও দুস্থ শিক্ষার্থীদের স্বার্থে 'বুক ব্যাঙ্ক' গঠন।

ঘ) ভর্তিযোগ্য শিক্ষার্থীদের সদস্য বিদ্যালয়গুলিতে ভর্তি করার ব্যবস্থা যৌথভাবে গ্রহণ। দেখতে হবে ছাত্র-ছাত্রীরা যেন অসুবিধায় না পড়ে।

ঙ) শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের বৃত্তিগত সমস্যা সমাধানে সদস্য বিদ্যালয়গুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার বাতাবরণ গড়ে তোলা।

চ) নানা প্রকারের শিক্ষামূলক অভিমুখীকরণ কর্মসূচী গ্রহণ ও তার রূপায়ন।

ছ) শিক্ষার্থী সহায়তার জন্য বিদ্যালয়ের মধ্যেই সময়-সারণির বাইরে শিখনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

জ) মাঝে মাঝেই বিষয় শিক্ষয়িত্রী - শিক্ষকদের মধ্যে পঠন-পাঠন নিয়ে পারস্পরিক আলোচনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়।

ঝ) ক্রীড়া, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, পরিবেশ ও বিজ্ঞান নিয়ে যৌথ কর্মসূচি, প্রদর্শনী, সেমিনার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।

ঃঃ সাংগঠনিক রূপরেখা ঃঃ

বিদ্যালয়গুচ্ছের নামকরণ কোনো প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ অথবা মনীষীর নামাঙ্কিত হ'তে পারে।

সদস্য বিদ্যালয়ের প্রধানবৃন্দ সাধারণ সভা আহ্বান করবেন। বিদ্যালয়গুচ্ছের সমস্ত শিক্ষয়িত্রী-শিক্ষক শিক্ষাকর্মী আমন্ত্রিত হবেন। এই সভা শিক্ষাবর্ষের বেশ আগেই আহূত হতে পারে যাতে সকলে মত বিনিময় করে শিক্ষা সংক্রান্ত বিস্তৃত আলোচনা করতে পারেন।

বিদ্যালয়গুচ্ছের কাজ সম্পন্ন করার জন্য নিম্নলিখিত কমিটিগুলি গঠন করা যেতে পারে ঃ

ক) বিদ্যালয়গুচ্ছ কার্যকরী সমিতি (Council) – (প্রশাসনিক ও কার্যকরী)

খ) শিক্ষা উপ-সমিতি

গ) আর্থিক ও উন্নয়ন উপ-সমিতি

ঘ) সহ-পাঠক্রমিক উপসমিতি ঃ স্বাস্থ্য, ক্রীড়া, বিজ্ঞান চেতনা ও মেলা, কুইজ ইত্যাদি।

১) বিদ্যালয়গুচ্ছ সংসদ (Council) (প্রশাসনিকও কার্যকরী) ঃ এই সমিতি সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক সংগঠন। এই সমিতি গঠিত হতে পারে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে ঃ

ক) সদস্য বিদ্যালয়ের প্রধান ও সহ-প্রধান।

খ) পরিচালন সমিতির সম্পাদক, স্টাফ কাউন্সিল মনোনীত ১ জন করে ভাষা, বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান শাখার শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী এবং একজন শিক্ষাকর্মী।

ঘ) একজন অভিভাবক প্রতিনিধি যিনি পরিচালন সমিতির সদস্য।

ঙ) পঞ্চায়েত / পৌর সভার শিক্ষা স্থায়ী সমিতির একজন সদস্য।

চ) স্থানীয় শিক্ষা বিভাগের একজন প্রতিনিধি।

ছ) অবসরপ্রাপ্ত একজন করে প্রধান শিক্ষক / শিক্ষয়িত্রী ও শিক্ষয়িত্রী / শিক্ষক।

জ) একজন গ্রন্থাগারিক।

ঝ) গ্রাম শিক্ষা সমিতি / পৌর শিক্ষা সমিতির প্রধান।

এই সংসদ বছরে অন্ততপক্ষে দুবার (মে ও অক্টোবর) সভা করবেন। উপ-সমিতিগুলি এরা সাধারণ সভায় গঠন করবেন। সভার এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিই কোরাম হ'য়েছে বলে মনে করতে হবে।

এই সমিতি তিন বছরের জন্য গঠিত হবে। সমিতিতে থাকবেন নিম্ন লিখিত পদাধিকারীবৃন্দ ঃ

ক) সভাপতি

খ) সহ-সভাপতি

গ) সম্পাদক

ঘ) সহ-সম্পাদক

ঙ) কোষাধ্যক্ষ

চ) সদস্যবৃন্দ ঃ সদস্য বিদ্যালয়ের স্টাফ কাউন্সিল একজন সাধারণ সংসদ-এর শিক্ষয়িত্রী / শিক্ষক/ শিক্ষাকর্মী মনোনীত করবেন।

২) উপসমিতি ঃ বিদ্যালয় গুচ্ছের সংসদ উপ-সমিতিগুলির পদাধিকারীদের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে মনোনীত করবেন। সংসদের পদাধিকারীদের মধ্যেই একজন উপ-সমিতিগুলির দায়িত্বে থাকবেন।

ঃঃ শিক্ষা উপ-সমিতি ঃঃ

ক) শ্রেণি ভিত্তিক শিখন -শেখানোর পরিকল্পনা কর্মশালার মাধ্যমে তৈরি করা।

খ) প্রশ্নপত্র রচনা, মূল্যায়নের রূপরেখা তৈরি করা, অভিন্ন বাৎসরিক শিক্ষাবর্ষের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন।

গ) বৎসরে অন্ততপক্ষে একবার সদস্য বিদ্যালয়গুলির শিক্ষা পরিবেশের পর্যালোচনা এবং আর অগ্রগতির জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ।

ঘ) সদস্য বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামোগত সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ।

ঙ) সদস্য বিদ্যালয়গুলির মধ্যে সুস্থ ও বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা।

:: আর্থিক ও উন্নয়ন উপ-সমিতি ::

ক) বিদ্যালয়গুচ্ছের কাজকর্মের জন্য সরকারী অনুদানের ব্যবস্থা বর্তমান অবস্থায় হয়ত সম্ভবপ নয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ও জনগণের সাহায্যে অর্থের সংস্থান করার প্রচেষ্টা সংসদকে চালাতে হবে। এ বিষয়ে গণউদ্যোগের ভূমিকা অপরিসীম। সদস্য বিদ্যালয়গুলি মূল্য দি প্রশ্নপত্র ও পরীক্ষার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করবে।

খ) এই উপ-সমিতি হিসাবপত্র রাখবে এবং বিদ্যালয় গুচ্ছের সংসদের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে।

গ) এই উপ-সমিতি সদস্য বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়ন ও পাঠক্রমিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে প্রয়োজনে পঞ্চায়েত / পৌর প্রতিষ্ঠান - এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে।

:: সহপাঠক্রমিক উপসমিতি ::

ক) সদস্য বিদ্যালয়গুলিকে বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্বাস্থ্য পরীক্ষার শিবি শিক্ষা উদ্ভাবনীমূলক কৌশল সংগঠিত করা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান মেলা, কুইজ্ ইত্যাদির ব্যবস্থা কর

খ) সদস্য বিদ্যালয়গুলির মধ্যে আন্তঃ বিদ্যালয় বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।

গ) সফল ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ যাতে আঞ্চলিক, জেলা ও রাজ্য স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্র করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

ঘ) সদস্য বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষার্থীদের শারীরিক, সামাজিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশের জ পরিকল্পনা গ্রহণ।

ঙ) সদস্য বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সাহায্য করা।

চ) যাদের খেলার মাঠ, খেলার সরঞ্জাম ও অন্য অনুষ্ঠান করবার উপযুক্ত জায়গা নেই তাদের সহায় করা।

বিদ্যালয় গুচ্ছ তৈরি করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ শিক্ষার সার্বিক অগ্রগতির স্বার্থে। এটা গঠন কর ধারণা জনপ্রিয় করে তুলতে হবে, তাতে সকলের সমর্থন লাভ করার সুযোগ রয়েছে।

ইতোমধ্যে রাজ্যের কিছু স্থানে বিদ্যালয় গুচ্ছ গঠন করা হ'য়েছে। অভিজ্ঞতার ফল অনেক ক্ষেত্রে

আশাব্যাঞ্জক। সুতরাং বলা যায় এটা একেবারে নতুন কোনো ধারণা নয়।

প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যাতে সত্ত্বর আবশ্যিকভাবে বিদ্যালয়গুচ্ছ গঠন করা যায়।

অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে পরস্পর সমৃদ্ধ হওয়া ও সহযোগিতার মাধ্যমে এলাকার সমস্ত স্তরের শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়ন করাই হবে বিদ্যালয় গুচ্ছের মুখ্য উদ্দেশ্য। এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয় গুচ্ছ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুচ্ছের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। এই দুই স্তরের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে পারলে সকলের জন্য উন্নত মানের শিক্ষা অভিযান আরও শক্তিশালী ও অর্থবহ হ'য়ে উঠবে সেটা দ্বিধাহীনভাবে বলা যায়।

ক. "সর্বশিক্ষা অভিযান ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্ব"

সকলের জন্য শিক্ষার (Education For All) লক্ষ্যে সর্বশিক্ষা অভিযান ভারত সরকারের শিক্ষা সম্পর্কি সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা পূরণের জন্য একটি কর্মসূচি। বস্তুতঃ ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের নির্দেশে ভার সরকারকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বা প্রারম্ভিক শিক্ষাকে (Elementary Education) সর্বজনীন করবার অঙ্গীক রূপায়ণ করতে পদক্ষেপ নিতে হয়েছে (সংবিধানের ৯৩ তম সংশোধনীর মাধ্যমে)। সর্বশিক্ষা অভিযান কর্মসূচি মূল লক্ষ্য হল ২০১০ সালের মধ্যে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সের সকল শিশুর জন্য কাঙ্ক্ষিত মানের প্রারম্ভিক শি সুনিশ্চিত করা। এই কর্মসূচিটিকে বাস্তবায়িত করবার জন্য, পরিমানগত দিক থেকে এবং শিক্ষার গুণগত মা দিক থেকে কর্মসূচিটিকে সফল করে তুলতে হলে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সমন্বিত, নিরন্তর এবং আন্তরিক প্রয়াসের প্রয়োজন। সর্বশিক্ষা অভিযান ত পরিচালিত হওয়া উচিত সকলের উদ্যোগে, সকলের জন্য এবং সর্ববিধভাবে সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা — এ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। এই সামগ্রিক পরিকল্পনায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব যে সর্বাধিক এ বিষয়টি উল্লেখের অপে রাখে না।

এটি আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য যে স্বাধীনতার পর বিভিন্ন সময়ে জাতীয় শিক্ষানীতির এবং বিভি শিক্ষা-কমিশন ও কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন সম্পর্কিত ঢাল প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও সর্বশ্রেণির আপামর জনসাধারণের জন্য শিক্ষার সুযোগ ও ব্যবস্থা কাঙ্খিত মাত্রায় প্রসারি হতে পারেনি।

সকলের জন্য শিক্ষা সুনিশ্চিত করবার পথে অজস্র প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান, সেগুলি কাটিয়ে উঠতে পারলে লক্ষ্য পূরণ সম্ভব নয়। এই ধরনের কয়েকটি বিষয় হল : (ক) সমাজের একটি অনুপেক্ষনীয় অংশে শোচনীয় আর্থসামাজিক অবস্থা (খ) গ্রামে, শহরে শিশুশ্রমের সমস্যা (গ) সমাজের পিছিয়ে পড়া কোনো কোনোও অংশে কন্যা শিশুর প্রতি অবহেলা এবং এই শিশুদের শিক্ষা বিষয়ে ঔদাসীন্য (ঘ) মাঝপথে অনে পড়ুয়ার বিদ্যালয় ছেড়ে দেওয়া (Drop-out) (ঙ) সমাজের পশ্চাদপদ শ্রেণিসহ অন্যান্য অংশেরও কিছু মানুষে মধ্যে শিক্ষার মূল্য সম্পর্কে চেতনার অভাব (চ) সকল শিশুকে শিক্ষাঙ্গনে নিয়ে আসা এবং ধরে রাখার জ প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যালয়, উপযুক্ত পরিকাঠামো এসব না থাকা ইত্যাদি। আর শিক্ষাখাতে ন্যূনতম অর্থ বরা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় চিরন্তন অনীহা তো আছেই।

গণতান্ত্রিক জীবনবোধের ধারাবাহিকতার ফলশ্রুতিতে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার অঙ্গনে এখন বঞ্চিত শোষিতদে একটা বড় অংশ প্রবেশের সুযোগ পেয়েছে। ২৭ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে দরিদ্রতম মানুষের কাছে শিক্ষা সুযোগ অনেকাংশে উন্মোচিত হয়েছে এবং বিশেষ করে গ্রামবাংলায় ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা প্রভূত পরিমা বেড়েছে।

কিন্তু সারাদেশের পরিস্থিতি সুস্থ স্বাভাবিক জীবন বিকাশের অনুকূল নয়, যার প্রভাব শিক্ষা ক্ষেত্রে কলুষিত করছে। তাছাড়া পশ্চাদপদ শ্রেণি বিশেষ করে তফসিলি ও উপজাতিভুক্ত ছেলেমেয়েরা আজও শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত India moving ahea

নামক পুস্তিকা থেকে জানা যায় যে ১৯৯৯-২০০০ সালে বিদ্যালয় ছুটের সংখ্যা প্রাথমিক বিভাগে ছিল শতকরা ৪০.২৫ ভাগ। ঐ সালে প্রারম্ভিক বিভাগে (প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত) বিদ্যালয় ছুট ছিল শতকরা ৫৪.৫৩ ভাগ।২০০০-২০০১ সালে প্রাথমিক বিভাগে বিদ্যালয় ছুট ছেলেদের ক্ষেত্রে ছিল শতকরা ৩৯.৭ ভাগ, মেয়েদের ক্ষেত্রে ছিল শতকরা ৪১.৯ ভাগ। ঐ সালে প্রারম্ভিক বিভাগে ছেলেদের বিদ্যালয় ছুট হল শতকরা ৫০.৩ এবং মেয়েদের শতকরা ৫৭.৭ ভাগ। এই পরিসংখ্যান গত ১৯৯৯-২০০০ এবং ২০০১ সালের। গত কয়েক বছরে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য এখনও দূরে।

আমাদের রাজ্যে উন্নত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক উল্লেখযোগ্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তথাপি বিদ্যালয় ছেড়ে যাওয়ার ঘটনা কম নয়। যারা ভর্তি হচ্ছে তাদের সবাইকে কাঙ্খিত মানে তুলে আনা যাচ্ছে না। একটি শিশুকে সুন্দর সুস্থ জীবনযাপনের জন্য এবং নিজেকে গণতান্ত্রিক সমাজের উপযোগী এবং সমাজ গঠনের অংশীদার হিসাবে গড়ে তোলার জন্য তাকে সাধারণ শিক্ষা (অর্থাৎ দশম মান পর্যন্ত) দেওয়া দরকার। এই শিক্ষা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা কমিটির মন্তব্য ঃ This is a broad based general education and also the terminal point of mass education. The aim of this arrangement was to help the hitherto neglected common people reach a minimum level of non- specialized education. The course of the Mdhyamik stage was developed following this concept of non specialized education................

It has to be realized that those boys and girls who leave school after the Madhyamik stage are also citizens of the country for whose enlightenment the society has spared chunk of its scarce resources with the objective of enabling them to live with dignity discharging their responsibility to the society. The subjects in the curriculum should help these citizens to acquire those proficiencies and values which equip them with knowledge, comprehension, skill, attitude etc necessary to play their role in the productive stream of social life. The selection of subjects for the secondary level has mainly followed this principle" .

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাকে উপরিউক্ত সামাজিক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। শিক্ষার লক্ষ্য হল এমন নাগরিক গড়ে তোলা যারা সামাজিক উৎপাদনে দক্ষতার সংগে অংশ নেবে। আজ সর্বত্র মূল্যবোধের অবক্ষয়। এর মূল কারণ সবকিছুই আর্থিক লাভ -লোকসান দিয়ে বিচার করা , সমাজের বহুলাংশের কাছে এটাই জীবনদর্শন। সমাধান- মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনা। হিংসামুক্ত শোষণমুক্ত সমাজ গড়া। সকলের জন্য শিক্ষার পরিকল্পনার সাথে উপরিউক্ত ভাবনাকে গুরুত্ব দিতে হবে। যদিও সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো বিদ্যালয় সর্বব্যাপী অবক্ষয়ের বাইরে নয়, তবুও বিদ্যালয় শিক্ষার গুরুত্ব সর্বাধিক। তাই মধ্যশিক্ষা পর্ষদ স্বীকৃত বিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষাকে সর্বজনীন করার প্রকল্পে অংশগ্রহণ অবশ্যই করতে হবে।২০১০ সালের মধ্যে যাতে বিদ্যালয় যাবার বয়সের সমস্ত শিশু বিদ্যালয় শিক্ষার অঙ্গনে প্রবেশ করতে পারে, অষ্টম মান পর্যন্ত বিদ্যালয়ে থাকতে পারে তা সুনিশ্চিত করা এবং তাদের জীবনোপযোগী ও উন্নত মানের প্রারম্ভিক শিক্ষা পেতে পারে তার উদ্যোগ গ্রহণে বিদ্যালয়গুলিকে আগ্রহী হ'তে হবে।

প্রান্তিক কিছু ক্ষেত্র ছাড়া পরিপূরক বিদ্যালয়গুলিকে দিয়ে এ কাজ হবে না। সরকার পোষিত বিদ্যালয়গুলিকে সাধারণ মানুষের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করার চক্রান্তে লিপ্ত অধিকাংশ প্রচার মাধ্যম। বিকল্প বিদ্যালয়, প্রথা বর্হিভূত শিক্ষাকে উৎকৃষ্ট হিসেবে প্রক্ষেপণ করা হচ্ছে রাষ্ট্রের দায় ঝেড়ে ফেলার কৌশলী বিকল্প হিসাবে। সাধারণ বিদ্যালয়ই আদর্শ। একে আরো উন্নত করতে হবে। তার জন্য দরকার বিদ্যালয়গুচ্ছ, একে সফল করতে পারলে অনেক দূর্বলতা কেটে যাবে। শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ককে একদল তথাকথিত শিক্ষাবিদ্ ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করছেন। অথচ ডেলর কমিশনের উপলব্ধি হল শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কের কোনোও বিকল্প নেই "(there is no substitute for the teacher-pupil relationship which is underpinned by authority and developed through dialogue)" ডেলর কমিশনের আরো বিশ্বাস একমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়েই শিশু নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে এবং নানা ধরনের জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

১৯৯০ সালে যখন রামমুর্তি কমিশন নিয়োজিত হয়েছিল তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের অভিজ্ঞতা ছিল যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ শিক্ষার অঙ্গানের বাইরে থেকে গেছে। অত্যন্ত লজ্জার কথা যে, সারা পৃথিবীর প্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষর মানুষের ৩৩.৮ শতাংশ মানুষ আমাদের দেশেই বাস করেন এবং বিরাট সংখ্যক শিশু প্রাথমিক শিক্ষাই সমাপ্ত করতে পারে না। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে চায় মানুষের অধিকার হিসাবে এবং সমাজের উপযোগী ও সমাজগঠণের জন্য নাগরিকদের প্রস্তুত করবার জন্য। শিক্ষার মধ্য দিয়েই মহিলাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব এবং পিছিয়েপড়া ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সমাজের উন্নয়নের অংশীদার করা সম্ভব। ১৯৯০ সালে সরকারের আরও উপলব্ধি ছিল যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি দিনের পর দিন জাত-পাত-ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। এই অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে সারাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ পরিবেশ তৈরী করার ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা সর্বাধিক। রামমুর্তি কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ছিল যে শিক্ষাউন্নয়ন, সমাজউন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিচ্ছিন্নভাবে চলতে পারে না। এইগুলির সমন্বয় সাধন করলেই দেশের উন্নয়ন সুনিশ্চিত করা যায়। ১৯৯৭ সালে সাইকিয়া কমিটি যে রিপোর্ট জমা দিয়েছিল তার মূল কথা ছিল যে সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করলে সমাধান হবে না বরং অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধ করা দরকার। তাঁরা সুপারিশ করেন যে প্রত্যেকটি নাগরিকের মৌলিক দায়িত্ব হবে তাদের শিশুদের ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা সুনিশ্চিত করা। এইভাবেই রাষ্ট্র ধীরে ধীরে তার দায়িত্ব অভিভাবকদের উপর অর্পন করার চেষ্টা চালিয়েছিল যা কোনো অবস্থাতেই মেনে নেওয়া চলে না। পরবর্তীকালে ১৯৯৮ সালের পরে কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষার মধ্যে ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিল যা ভারতের মৌলিক ঐতিহ্যের পরিপন্থী।

বস্তুতঃ শিক্ষাক্ষেত্রে একটি জনমুখী শিক্ষানীতি স্বাধীনতার পরে রূপায়িত হতে দেখা গেল না। শিক্ষাক্ষেত্রে চিন্তার এই অস্বচ্ছতার মধ্যে দাঁড়িয়ে সারাদেশের শিক্ষক সমাজকে বাস্তবভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা প্রসারের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। কাজটা কঠিন, কারণ সমাজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। সমাজের সমস্যা শিক্ষা ব্যবস্থাকেও প্রভাবিত করছে। সমাজজীবনের বিপর্যয় শিক্ষাক্ষেত্রেও সংক্রমিত হচ্ছে। সংবেদনশীল মন নিয়ে শিক্ষকদের শিখনপ্রক্রিয়া পরিচালনা করতে উদ্যোগী হতে হবে, মানবিক উষ্ণতায় সিক্ত হয়ে শিক্ষার্থী আনন্দের সাথে সবকিছু জানতে ও প্রায়োগিক দক্ষতা অর্জন করতে উদ্বুদ্ধ হবে। শিক্ষক সমাজ সকল শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা পূরণে প্রতিনিয়ত এগিয়ে আসছেন এবং আগামী দিনে বাড়তি দায়িত্ব গ্রহণ করে শিক্ষক শিক্ষাকর্মী

সকলেই সকল শিশুর শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে এগিয়ে আসবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

সর্বশিক্ষা অভিযানের মধ্য দিয়ে কিছু বাড়তি সুযোগ পাওয়ার প্রত্যাশা করা যায়, যেমন —

→ প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর প্রসার ও উন্নয়নের সুযোগ।

→ স্থানীয়ভাবে শিক্ষার চাহিদাভিত্তিক সমস্যা সমাধানে প্রথাগত বিদ্যালয় বা পরিপূরক বিদ্যালয় স্থাপনের সুযোগ।

→ বালিকাদের শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা ।

→ বিভিন্ন পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষার লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ।

→ ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ নীতির ভিত্তিতে গ্রাম সংসদ ও ওয়ার্ড শিক্ষা সংসদকে ক্ষমতা অর্পণ।

→ জনগণকে সঙ্গে নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণ।

→ শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন নতুন শিখন পদ্ধতি প্রকরণের নিবিড় অভিমুখীকরণের জন্য আর্থিক সহায়তা।

→ পরিকাঠামো ও পরিষেবা বৃদ্ধির জন্য 'চক্র সম্পদ কেন্দ্র' গঠন।

→ জেলার জন্য বরাদ্দকৃত বিভিন্ন উন্নয়ন খাতের টাকার একটা অংশ শিক্ষা খাতে ব্যয়ের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ।

→ গ্রাম সংসদ ও ওয়ার্ড সংসদ স্তরে শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা।

→ শিখন উপকরণ তৈরী করবার জন্য প্রারম্ভিক শিক্ষার সংগে যুক্ত শিক্ষক পিছু ৫০০্ টাকা অনুদান।

→ বিদ্যালয় গৃহের ছোটোখাটো সংস্কার ও অন্যান্য কাজের জন্য ২০০০্ টাকা অনুদান।

→ দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের জন্য বুক ব্যাংক গড়ে তোলার জন্য সর্বোচ্চ বিদ্যালয় পিছু ১০,০০০্ টাকা অনুদান।

→ বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শিক্ষক (প্যারা টিচার) নিয়োগের সহায়তা লাভ ইত্যাদি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে এই অভিযানকে কার্যকর ক'রবার উদ্যোগ নিয়েছে। প্রারম্ভিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করবার জন্য গঠিত হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে সাধারণ পরিষদ। জেলা থেকে গ্রাম পর্যন্ত সর্বস্তরে গঠিত হয়েছে সর্বশিক্ষা অভিযানের কমিটি। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের এই কর্মসূচির ইতিবাচক দিকগুলির সুযোগ নিয়ে সমাজের প্রত্যাশাকে পূরণ করতে সচেষ্ট হতে হবে। সর্বশিক্ষা অভিযানের কাঙ্খিত গতিবেগকে সংগঠিতভাবে চলমান করে আগামি দিনে সার্বিক উদ্যোগের মধ্য দিয়ে সুনিশ্চিত করতে হবে।

শিক্ষার অধিকার শিশুর জন্মগত অধিকার। প্রধানত আর্থ-সামাজিক ভারসাম্যহীনতার কারণে এই অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত থাকছে। বিশেষত আমাদের মত দেশে যেখানে চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র এখনো ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে আছে সেই দেশে ব্যাপকতম গণউদ্যোগ ছাড়া এই কাজে সফল হওয়া যাবে না। সুতরাং এই অভিযানকে সফল করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে শপথ গ্রহণ করতে হবে।

খ. সকলের জন্য শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে বিদ্যালয় প্রধান, পরিচালন সমিতি, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ও শিক্ষাকর্মীদের ভূমিকা

শিক্ষা ভিক্ষা নয়। শিক্ষা লাভের সুযোগ প্রত্যেক শিশুর জন্মগত অধিকার। শিক্ষা ব্যতিরেকে সমাজের অগ্রগতি কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয়। ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার দলিলে সকল শিশুর শিক্ষালাভের অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে।

স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৫০ সালে গৃহীত ভারতের সংবিধানের মৌলিক অধিকার রক্ষার অধ্যায়ে শিক্ষা স্থান না পেলেও নির্দেশাত্মক নীতি নির্ধারক অধ্যায়ের ৪৫ নং ধারায় বলা হয়েছিল দশ বছরের মধ্যে ভারতের ১৪ বছর পর্যন্ত সকল শিশুকে বিনা বেতনে প্রারম্ভিক শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হবে।

শিক্ষার বিভিন্ন দিক খতিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে করণীয় কাজ সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য ১৯৪৮ সালে নিযুক্ত খের কমিটি থেকে শুরু করে ১৯৬৪ সালের কোঠারী কমিশন সকলেই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন জাতীয় সরকারের মোট বাজেটের ১০ শতাংশ শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা দরকার। যে কোনো কারনেই হোক কোনো বছরই মোট ৩ শতাংশ অতিক্রম করেনি।

১৯৮৯ সালের ২০শে নভেম্বর সম্মিলিত জাতি পুঞ্জের সাধারণ পরিষদে শিশুদের অধিকার সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তা হল শিক্ষা শিশুদের মৌলিক অধিকার। অন্যান্য অনেক দেশের মত ভারতও এই প্রস্তাবে স্বাক্ষর করে।

১৯৯৩ সালে উন্নিকৃষ্ণণ মামলার বিচারে দেশের প্রত্যেক শিশুরই ১৪ বছর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষালাভের অধিকার রয়েছে এই সুস্পষ্ট রায় ছিল সুপ্রীম কোর্টের। ১৯৯৮ সালে দেশের শিক্ষা মন্ত্রীদের সম্মেলনে প্রারম্ভিক শিক্ষার জন্য সমন্বিত ও সার্বিক প্রয়াস গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরের বছর ১৯৯৯ সালে প্রারম্ভিক শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় কমিটির ঘোষণাতেও ঐ একই অঙ্গীকার করা হয়েছে।

সুপ্রীম কোর্টের উক্ত রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধান সংশোধন ক'রে ২০০২ সাল হতে ৬ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত সকল শিশুর শিক্ষা সুনিশ্চিত করার কাজ শুরু করেন।

প্রারম্ভিক শিক্ষার উচ্চ প্রাথমিক অংশকে (৬ ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি) সকলের কাছে পৌঁছে দেবার লক্ষ্যকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদ্ সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্পকে যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ ক'রে একটি পৃথক বিভাগের সূচনা করেছেন মে, ২০০৩ হতে।

এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডকে সঠিক দিশায় নিয়ে যেতে হলে প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত সকল স্তরের মানুষের উদ্যোগ আবশ্যিক পূর্বশর্ত। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে রূপায়িত করার জন্যই মধ্যশিক্ষা পর্যৎ বিদ্যালয় প্রধান, পরিচালন সমিতি, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী-শিক্ষাকর্মীদের অংশগ্রহণমূলক অভিমুখীকরণ কর্মশালার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই প্রেক্ষাপটে এই বিভাগের মাধ্যমে পর্যদের পরিচালনায় রাজ্যব্যাপী মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের প্রধান, পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দের ও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের সামগ্রিক অংশগ্রহণমূলক অভিমুখীকরণ কর্মশালা

পরিচালনা করার কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। রাজ্যের সমস্ত মহকুমায় এই বিষয় সমূহের কর্মশালাগুলির কাজ সম্পন্ন করার প্রয়াস অব্যাহত আছে ।

সকলের জন্য শিক্ষার চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট সকল বালক-বালিকাকে শিক্ষার অঙ্গনে নিয়ে আসা, তাদের অষ্টম মান পর্যন্ত ধরে রেখে উন্নতমানের শিক্ষা দেওয়া। এই বৃহৎ কর্মযজ্ঞে বিদ্যালয় প্রধান, পরিচালন সমিতি, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ও শিক্ষাকর্মী সকলের দায়িত্ব রয়েছে।

বিদ্যালয় শিক্ষায় বিদ্যালয়-প্রধান অগ্রণী ভূমিকা নেবেন। তিনি অবশ্যই উপলব্ধি করবেন যে তিনি শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, শিক্ষাকর্মী, পরিচালন সমিতি ও সমাজের সকল অংশের সহযোগিতা ছাড়া বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন ও এলাকার ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সের সব বালক-বালিকার শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে পারবেন না। এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য সুষ্ঠু ও বিজ্ঞান সম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ অপরিহার্য। বিদ্যালয়প্রধান ও বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নের সাথে যুক্ত সকলকেই যান্ত্রিক মানসিকতা মুক্ত হতে হবে । এই সমাজমুখী কর্মযজ্ঞে বহু মানুষকে যুক্ত করতে হবে এবং সবাইকে নিয়েই এই কাজ করতে হবে। এই পরিকল্পনা সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য প্রেষণা ও নেতৃত্বের তত্ত্বের (Theory of Motivation and leadership) মূল ধারণা সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।

পরিচালন সমিতির একটা বড় অংশ অভিভাবকদের প্রতিনিধি। জনগণের ব্যাপকতম অংশকে সঙ্গে নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে উন্নতমানে বিকশিত করার প্রয়োজনীয়তা তারা বুঝবেন এটা প্রত্যাশিত।

শিক্ষা একটি গতিশীল প্রক্রিয়া — সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে এই গতিশীলতা আরও বেশি অর্থবহ হ'য়ে ওঠে। একথা অনস্বীকার্য যে স্বাধীনতার পরে ভারতে জনগণের ভিতর ক্রমান্বয়ে শিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের রাজ্যে ১৯৭৭ সালের পর থেকে জনশিক্ষার বিষয়টিকে সর্ব্বোচ্চ অগ্রাধিকারদেবার ফলে ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার অঙ্গনে প্রবেশের চাহিদা সমাজের দুর্বলতর অংশের ভিতরও প্রভূত পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছে। সকলের জন্য শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্যগুলি পূরণের জন্য পরিচালন সমিতি শ্রেণিকক্ষে শিখন প্রক্রিয়ার উল্লেখযোগ্য উন্নয়নে এলাকার শিক্ষানুরাগী অবসর প্রাপ্ত ব্যক্তিদের সহায়তা গ্রহণ করতে পারে। এই কাজে যত সফল হওয়া যাবে ততই ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয় ছেড়ে যাওয়ার প্রবণতা রোধ করা সম্ভব হবে। সার্বিক মূল্যায়নের ফলাফল সম্পর্কে অভিভাবকগণের মতামত গ্রহণ ও সংশোধনের পরিকল্পনা করা, পঞ্চায়েত প্রধান, পৌর প্রতিনিধি, ওয়ার্ড ও গ্রাম শিক্ষাকমিটির প্রতিনিধিদের সাথেও আলোচনা করে কমিটি শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন। অবশ্য সর্বপ্রথমেই পরিচালন সমিতিকে নিজ নিজ এলাকাতে সকলের জন্য শিক্ষার লক্ষ্যে করণীয় সম্পর্কে গণ চেতনা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হতে হবে, নতুবা একাজ সম্পন্ন করা দুষ্কর।

সকলের জন্য শিক্ষার আকাঙ্খা পূরণ করতে হলে সাধারণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালয় ব্যবস্থায় সবচেয়ে প্রধান ভূমিকা শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীবৃন্দের। শিক্ষাকর্মীদের সহায়ক ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। একাজ সম্পন্ন করতে হলে সমাজের বর্তমান অবস্থা ও সমস্যা সম্পর্কে সম্যক ধারণার প্রয়োজন। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন মানব সমাজকে দিয়েছে উন্মত্ত ভোগবাদী জীবনের প্রতি আকর্ষণ যা প্রতিনিয়ত মানুষকে সংকীর্ণ, স্বার্থপর, সমষ্টিবিমুখ, আত্মসুখী জীবন যাপনে প্ররোচিত করে চলেছে। এরই অঙ্গ হিসাবে গণতান্ত্রিক জীবন বোধকে খর্ব করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। এরই ফলে মানুষ বিচ্ছিন্ন জীবন যাপনের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন— আর এই বিচ্ছিন্নজীবনবোধ

থেকে সৃষ্টি হচ্ছে নিজে একা বাঁচার তাগিদ যার অনিবার্য ফলশ্রুতিতে তৈরি হচ্ছে সবকিছুকে মুনাফার দৃষ্টিতে দেখার প্রবণতা। শিক্ষার মধ্যেও অনুপ্রবেশ ঘটে যাচ্ছে পণ্যমানসিকতার। প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নয়ন এবং তাকে মানুষের কল্যাণে না লাগিয়ে উদ্দোগপতিদের মুনাফা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবহারের ফলে গোটা বিশ্ব 'কর্মসংস্থানহীন উন্নয়ন' (Jobless growth) — এর যুগে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছে।

এই মানসিকতা ও পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বনিয়ন্ত্রক শক্তি সকলের জন্য শিক্ষার ধারণাকে লঘু করে দেখানোর ধারাবাহিক প্রচেষ্টা জারি রেখেছে, বিশেষ ক'রে সাধারণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার অসারতার তত্ব প্রতিমুহূর্তে সমস্ত রকম মাধ্যমের সাহায্যে প্রচার করে চলেছে। ধনী ব্যক্তিদের কথা স্বতন্ত্র, মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত এমনকি দরিদ্রব্যক্তিদের একটি অংশও ভাবতে শুরু করেছেন সাধারণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে আজ আর তেমন ভাল পড়াশুনা হয়না — এর ফলে আমাদের দেশের আনাচে কানাচে অসংখ্য মুনাফা শিকারী ব্যক্তিগত মালিকাধীন বিদ্যালয় তৈরি হচ্ছে — আর এই বিদ্যালয়ে সন্তানের ভর্তির জন্য মানুষের ভিতর আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে যদিও এই উচ্চ মাশুলের বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশের পঠন-পাঠনের মান সাধারণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের চেয়ে উচ্চমানের নয়— বিভিন্ন তথ্যে একথা প্রমাণিত। সুকৌশলে বিদ্যালয়ের শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের ভূমিকা নগণ্য করে দেখানোর প্রচেষ্টা চলছে যাতে রাষ্ট্র সম্পদ বরাদ্দ কমিয়ে এনে তার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে ।

এরূপ একটি জটিল পরিস্থিতির সম্মুখে সামাগ্রিকভাবে সকলের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে দাঁড় করানো হয়েছে। শ্রেণি শিখনের বিশ্বাসযোগ্যতাকে নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। পরীক্ষায় বেশি নম্বর পাওয়াকেই একমাত্র লক্ষ্য বলে গণ্য করার মানসিকতা এই অশুভ প্রচেষ্টার সহায়ক বাতাবরণ তৈরি করছে।

এই প্রেক্ষিতেই সকলের জন্য শিক্ষাকে সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্রে যে সামস্যাগুলির উদ্ভব হয়েছে এবং যেগুলি আগে থেকেই আছে তার সমাধানের চ্যালেঞ্জও প্রধানতঃ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদেরই গ্রহণ করতে হবে। সাধারণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা ও অপরিহার্যতা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই প্রসঙ্গে ডেলর কমিশনের এই উক্তিটি স্মরণ করা যেতে পারে — "There is no substitute for the teacher-pupil relationship, which is underpinned by the authority - it is the responsibility of the teacher to impart to the pupil the knowledge that mankind has acquired about itself and about nature, and the essence of human creativity and inventiveness".

সামগ্রিক পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রমূলক অবক্ষয় মোকাবিলা করতে শিক্ষকদের অপোষহীন বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে। এই ভূমিকা পালন করতে গেলে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। সমাজের প্রতিরূপ যে বিদ্যালয় সেই বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও তাঁদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্বগুলি সম্পর্কে পূর্ণ মাত্রায় সচেতন না থাকলে এই গুরুদায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। তাই শ্রেণি শিখনের গুরুত্ব ও বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে হবে, বিদ্যালয়ের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করতে হবে। শিক্ষার্থীদের শিখন প্রয়াসে তাদের সক্রিয় অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অঙ্গানে আসা দরিদ্রতম মানুষের ঘরের ছেলে মেয়েরা কখনো কখনো অবহেলা ও অপমানের সম্মুখীন হচ্ছে। সংগঠিত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে শিক্ষার অধিকারকে সকলের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

গ. পরিচালন সমিতির বিবর্তনের রূপরেখা

গণমুখী শিক্ষা-আন্দোলনের ইতিহাস সুদীর্ঘকালের। একথা অনস্বীকার্য শিক্ষা ব্যতিরেকে সংস্কারমুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজচেতনা গড়ে উঠতে পারে না। সর্বজনীন শিক্ষার চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজন পরিচালন ব্যবস্থায় জনগনের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিতকরণ ও তার উত্তরোত্তর প্রসার। ঔপনিবেশিক ভারতে বিদ্যালয় পরিচালন ব্যবস্থা তেমন জনমুখী ছিল না। ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে মাঝে মধ্যে আইনকানুনের সামান্য কিছু পরিবর্তন হলেও দৈনন্দিন পরিচালন ব্যবস্থায় তার প্রয়োগ তেমন হত না — এর অন্যতম কারন পরিচালন ব্যবস্থায় মধ্যসত্ত্বভোগীদের প্রভাবই ছিল প্রধান ও প্রবল।

স্বাধীনোত্তর ভারতে আশা করা হয়েছিল যে স্বাধীনতা সংগ্রামী সহ ভারতের আপামর জনসাধারণের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন বিদ্যালয় পরিচালন ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ঘটেনি। পরিচালন ব্যবস্থায় সমাজের বিত্তবান ও জমিদারদের প্রভাব ছিল অপরিসীম। এই ধরনের পরিচালন সমিতিতে মূলতঃ কায়েমী স্বার্থ রক্ষা করবেন তেমন প্রতিনিধি আসার ব্যবস্থা থাকত। পরিচালন সমিতির পদাধিকারীবৃন্দ পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রধানত কর্তৃত্বকারী ভূমিকা নিয়ে চলতেন। ফলে অভিভাবক ও শিক্ষক প্রতিনিধিবৃন্দের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অবকাশ থাকত না বল্লেই চলে। তাঁদের উপর নানা ধরনের চাপ থাকত। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের স্বার্থের অনুকূলে এই পরিচালন সমিতির তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা দেখতে পাওয়া যেত না। সামাগ্রিকভাবে শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কিত কোনো আলোচনা পরিচালন সমিতির সভায় সাধারণত স্থান পেত না। এমন কি শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের আইনানুগ অধিকার থেকেও বঞ্চিত করা হত — যেমন নিয়োগপত্র না দেওয়া, নিয়োগের সরকারী অনুমোদন আনার ক্ষেত্রে অনীহা, অধিকাংশক্ষেত্রে কমবেতন দিয়ে বেশী বেতন প্রাপ্তির স্বীকৃতি আদায় করে নেওয়া। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের ভবিষ্যনিধির অর্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, এমন কি ভবিষ্যনিধির অর্থ তছরূপ করবার দৃষ্টান্তও কম ছিল না। শিক্ষয়িত্রী ও মহিলা কর্মীদের আবস্থা ছিল আরও অসহায়। এছাড়াও ছিল বিশেষ গঠনতন্ত্র (Special constitution) পরিচালিত বিদ্যালয়। এই ধরনের বিদ্যালয়গুলিতে গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হত না। জনস্বার্থ, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের নায্য অধিকার রক্ষার ন্যূনতম দায়িত্ব পালনে সদিচ্ছা এই ধরনের বিদ্যালয়গুলিতে ছিল না।

সকলের জন্য শিক্ষার সংগ্রাম অব্যাহত থাকলেও কায়েমী-স্বার্থ তাদের কর্তৃত্ব রক্ষা করার প্রয়াসও চালিয়েছে বিরামহীনভাবে। বস্তুত প্রথম গণমুখী পরিচালন ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে ১৯৬৯ সালে।

বিগত (২৫-২৬) বছরে প্রসারিত গণতন্ত্রের সাথে সঙ্গাতি রেখে পরিচালন সমিতির গণতান্ত্রিক কাঠামো গণউদ্যোগের অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি রূপে আত্মবিকাশ করতে থাকে — এই প্রক্রিয়া আজও বিদ্যমান। প্রশাসনের আমলাতান্ত্রিকতা বর্জিত গণমুখী দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া ক্ষমতার সার্বিক বিকেন্দ্রীকরণ ও সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয় —এই অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সংগত কারণেই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এবং পুর আইন সংশোধন করা হয় —ফলে স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থায় নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। এলাকার উন্নয়নের দায়িত্ব অঞ্চলেরই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর ন্যস্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে চলেছেন। দ্বাদশ শ্রেণি

পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার সাথে সাথে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সমাজ গঠনে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্মরণে রেখে সম্মানজনক বেতনক্রম ও অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা সুনিশ্চিত করেন যা সারা দেশের কাছে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলিতে পঞ্চায়েত মনোনীত সদস্যের প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

সীমিত ভূমি সংস্কারের সুফল রূপে গ্রামীণ অভিভাবকদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ছাত্রস্ফীতির ফলে নতুন নতুন বিদ্যালয়ের চাহিদা বাড়ার ফলে একটি নির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। সকলের জন্য শিক্ষার চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে অতীত অভিজ্ঞতার নিরিখে বিদ্যালয় পরিচালন ব্যবস্থায় মূলতঃ অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীবৃন্দের প্রাধান্য সুনিশ্চিত করা হয়েছে। এর ফলে পরিচালন ব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়েছে।

বিদ্যালয় কর্মীসংসদ (Staff Council) ও শিক্ষা-সংসদ (Academic Council) গঠনের ভিতর দিয়ে শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে এই কমিটির শিক্ষাসম্পর্কিত সমস্ত বিষয়, বিদ্যালয়ের উন্নয়ন, ছাত্রভর্ত্তি, মূল্যায়ন, পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন, বিদ্যালয়ের শ্রেণিপঠনের সময় সূচি প্রণয়ন, সহপাঠক্রমিক কাজকর্মের উন্নতির জন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রূপায়িত করতে সক্ষম হচ্ছে। শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিচালন সমিতির ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। শ্রেণি পঠন-পাঠনের কাঙ্খিত মান সুনিশ্চিত করবার জন্য শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, সময়মত শিক্ষার উপকরণ সরবরাহ করা, বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নত করা - বিদ্যালয়ের পরিবেশের দুটো দিক আছে — একটা হচ্ছে পরিকাঠামোগত পরিবেশ যথা ঃ- বিদ্যালয় গৃহ ও উপকরণ, শৌচাগার, পরিচ্ছন্ন ও মনোরম পরিবেশ, আরেকটি পরিবেশ হচ্ছে অভিভাবক, ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকের মধ্যে সংবেদনশীল সম্পর্ক গড়ে তুলতে যথাযথ সাহায্য করা। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত উপস্থিতি সুনিশ্চিত করতে সহায়তা করা, মূল্যায়নের ফল নিয়ে অভিভাবক / অভিভাবিকাদের সাথে মত বিনিময় করা, অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া শিশুদের শিক্ষার অগ্রগতির দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া, বিদ্যালয়ের সকল কাজে মেয়েদের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের আরও আত্ম বিশ্বাস গড়ে তোলা, ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তায় স্বল্পমূল্যের / বিনামূল্যের শিখন উপকরণ সংগ্রহ বা তৈরী করতে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের উদ্বুদ্ধ করা, নিয়মিত সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠান এবং প্রদর্শনীর আয়োজনে উৎসাহ দান। সৃজনমূলক, উৎপাদনাত্মক প্রভৃতি কর্মসূচি গ্রহণে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে পরিচালন সমিতি সক্রিয় প্রচেষ্টা গ্রহণ করবেন।

সরকার ও জনসাধারণের যৌথ উদ্যোগ ছাড়া কোন শিক্ষা পরিকল্পনা কার্যকরী হতে পারে না - একথা স্মরণে রেখে সমাজের চাহিদা পূরণে পরিচালন সমিতি বিদ্যালয়গুলির সমাজের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করে সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করে তাকে সততা ও নিষ্ঠার সাথে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করে শিক্ষার সার্বিক অগ্রগতির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন।

সপ্তম অধ্যায়

ক) 'জীবন-শৈলী' শিক্ষা ঃ

পটভূমি — অন্য সব প্রাণীর মত একটি মানবশিশু স্বাভাবিক নিয়মেই বড় হয়। তার শরীর-মনের বৃদ্ধি ও বিকাশ কেমন হবে তা সেই শিশুর পরিবেশের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে। তার পুষ্টি, তার পরিবারের শিক্ষাসংস্কৃতির মান, তার সামাজিক পরিমন্ডলের প্রকৃতি প্রভৃতি নিয়ন্ত্রক উপাদান হিসাবে কাজ করে। এই সমগ্র পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই প্রত্যেক শিশু বড় হয়। বিশেষ বয়সে এসে বড় হওয়াটা এক নতুন মাত্রা পায়। কিশোর-কিশোরীরা একটি বিশেষ অর্থে বড় হয়ে ওঠে। তাদের জীবনে পর্যায়ান্তর ঘটে। কৈশোর থেকে যৌবন উত্তরণের এই প্রক্রিয়াটি কয়েক বছর ধরে চলে। এই সময়টাকেই বয়ঃসন্ধিকাল বলা হয়। জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ পর্বের বয়ঃক্রম নিয়ে মতপার্থক্য আছে। বর্তমানে সাধারণ ভাবে ১০ থেকে ১৯ বছর বয়স বয়ঃসন্ধিকাল বলে গণ্য হয়। এই সময়ে কিশোর-কিশোরীদের শরীরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। যৌবনপ্রাপ্তির এই লক্ষণগুলি পরিণত বয়স্কের সব মানুষই জানেন। বিশেষত শিক্ষককূল এ সম্পর্কে সম্যক অবহিত। তাই সেইগুলির বিবরণ দেওয়া বাহুল্য। কিন্তু শরীরে এই পরিবর্তনগুলির সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েদের যে মানসিক প্রতিক্রিয়া হয় সে বিষয়ে আমরা প্রায়শই অনবহিত অথবা উদাসীন থাকি। আকস্মিকভাবে যখন পরিবর্তনের পালা এসে পড়ে তখন ছেলেমেয়েরা এই অর্থ বুঝতে পারে না। এই বিকাশ যে স্বাভাবিক, সকলের জীবনেই এই পর্বে আসে সে উপলব্ধি তাদের থাকে না। এ বিষয়ে পূর্বে ধারণা না থাকার ফলে তাদের মনে নানারকম আশাঙ্কা, অনিশ্চয়তা, এমন কি অমূলক অপরাধবোধ জন্ম নেয়। কিন্তু বিষয়টা জেনে নেবার কোনো পথ তাদের কাছে খোলা থাকে না। শরীরের গোপন অঙ্গ নিয়ে খোলামেলা কথা বলা বাবা-মা বা অন্য গুরুজনদের পক্ষে অস্বস্তিকর। ছেলে-মেয়েরাও প্রশ্ন করতে লজ্জাবোধ করে। অবদমিত কৌতহূলে তারা দিশাহারা হয়ে পড়ে, তাদের মন অস্থির, জর্জরিত, ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে। তখন তারা অন্য উপায় খোঁজে। সমবয়সীদের কাছে কথা পাড়ে। তারাও সমান অজ্ঞ। সুতরাং ভুল তথ্য ও অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পেয়ে তারা চূড়ান্ত বিভ্রান্তির শিকার হয়।

জীবন গড়ে তোলার পথে এই অস্থির অবস্থার সুদূরপ্রসারী কুফল আছে। এই সমস্যা নিরসনের জন্য বিদ্যালয়স্তরে যৌনশিক্ষার ধারণাটি অনেকদিন আগেই রূপ নেয় এবং দেশে তা প্রবর্তিত হয়। এই শিক্ষাক্রম মূলতঃ যৌন অঙ্গাসমূহের বিকাশ, প্রজনন প্রক্রিয়া ও প্রজনন স্বাস্থ্যের (reproductive health) মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। পরবর্তীকালে বিশেষজ্ঞরা উপলব্ধি করলেই যে শুধু শারীরবৃত্তীয় জ্ঞান বয়ঃসন্ধির সব প্রশ্নের উত্তর দেয় না। বড় হয়ে ওঠার সময় শরীরের অজানা রহস্যজনিত উদ্বেগ ছাড়াও কিশোর-কিশোরীদের মনোজগতে অন্যতর পরিবর্তন আসে যার ফলে উত্তরজীবনে তাদের সামাজিক সুস্থতাও বিঘ্নিত হয়। তাদের মনের চাহিদা বেড়ে যায়। স্নেহ, ভালোবাসা, যত্ন, সাহচর্য, সমর্থন প্রভৃতি পাবার বাসনা তীব্র হয়ে ওঠে। বাবা-মায়ের নিঃসঙ্গতা ছেলেমেয়েদের এই যন্ত্রণাকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। এই বয়সের ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে। বড় হয়ে ওঠার স্বীকৃতি চায়। আবার সামান্য কারণে নিজেকে অবহেলিত ও অবাঞ্ছিত মনে করে। পরিবারে এবং অন্যত্র সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলাটা তাদের সামনে এক নতুন সমস্যা হিসাবে হাজির হয়। যৌবনপ্রাপ্তির সময় কিশোর-কিশোরীরা বিপরীত লিঙ্গের মানুষকে অন্য দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে। তাদের মনে যৌনতাবোধ ও কিছুটা যৌন চাহিদা জেগে ওঠে।

আসলে এগুলি সমস্যা নয়। বড় হয়ে ওঠার স্বাভাবিক লক্ষণ। এই পরিবর্তন, এই চাহিদা, প্রশ্ন ও সংশয়-সমূহকে বুঝে সঠিকভাবে মেটাতে এবং সঠিক দিকে পরিচালিত করতে পারলে তরুন তরুণীদের ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠ বিকাশ

ঘটবে,তারা সুস্থ সৃজনশীল জীবনযাপন করতে সক্ষম হবে। কিন্তু এই পরিচালনায় যদি ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা থাকে তাহলে এদের জীবনে নানাবিধ বিপত্তি আসবে, সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হবে। এই বয়সে কিশোরদের যে বিকাশ অনুভূতি তার কিছুটা মর্মস্পর্শীভাবে চিত্রিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ' ছুটি ' গল্পে--- মামাবাড়ীতে বড় হয়ে ওঠা ফটিকের কাহিনীতে।

অতএব যৌবনাগমের শারীরিক লক্ষণের সঙ্গো মানসিক ও সামাজিক দিকগুলিকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভূক্ত করার প্রয়োজনীয়তা এখন স্বীকৃত হয়েছে। আন্তর্জাতিক পর্যালোচনার সূত্রে কিছু বিবর্তনের পথ বেয়ে যৌন শিক্ষা এখন 'বয়ঃসন্ধির শিক্ষা' নামে বেশি গ্রহনযোগ্য। পরিবারে ও সমাজে যথাযথভাবে জীবনযাপনে সক্ষম করে তোলার জন্য এই বয়সের ছেলেমেয়েদের সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করা এই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। প্রসঙ্গিক দক্ষতাগুলিকে 'জীবন-দক্ষতা' বলা হয় এবং এগুলিকে সমন্বিত করে যে ব্যবস্থা তাকে বোঝাতে 'জীবনদক্ষতা শিক্ষা' (life skills education) নামটিও প্রচলিত আছে

বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে যৌনতা বিষয়ক শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রশ্নটি আমাদের দেশেও অনেকদিন আগেই উত্থাপিত হয়েছে। দীর্ঘ আলোচনা ও বির্তক চলেছে কিন্তু বরাবরই নেতিবাচক সিদ্ধান্ত হয়েছে। এরকম একটি শিক্ষাক্রম চালু করার পক্ষে সর্বভারতীয় স্তরে প্রথম সুপারিশ হয়েছে ১৯৯৩ সালে। কিন্তু তা রূপায়ণের উদ্যোগ দেখা যায় নি। এন্.সি.ই. আর.টি ঐ বছর এই বিষয়টি প্রবর্তন করার সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু তারাই যখন ২০০০ সালে বিদ্যালয়স্তরের জন্য জাতীয় পাঠক্রমের কাঠামো সুপারিশ করল তখনও এমন কোনো কার্যক্রম যুক্ত করতে বলে নি। পাঠক্রমের মাধ্যমে যে দৃষ্টিভঙ্গি ও দক্ষতাসমূহ গড়ে তোলার প্রয়োজন বলে তারা পরামর্শ দিয়েছে সেখানে শুধু বলা হয়েছে 'যৌনসংক্রান্ত বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা এবং বিপরীত লিঙ্গের মানুষের প্রতি সম্ভ্রমপূর্ণ মনোভাব গড়ে তুলতে হবে।"

আমাদের প্রচলিত মানসিকতায় নরনারীর যৌন সম্পর্কটি একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। এই সমাজের যুগলালিত মূল্যবোধ অবাধ, অনিয়ন্ত্রিত যৌনসম্পর্ককে অনুমোদন করে না। প্রাক্ -বিবাহ বা বিবাহ বহির্ভূত যৌনসম্ভোগকে আমরা অনৈতিক এবং সমাজ-বিধ্বংসী বলে গণ্য করি। স্বামী-স্ত্রীর যৌন সম্পর্কের মধ্যে একটি পবিত্র গোপনীয়তা আছে যাকে আমরা মর্যাদা দিয়ে থাকি। তাই যৌনতা নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করতে আমাদের জড়তা আছে। নরনারীর যৌন অঙ্গসমূহ সেই গোপনীয়তা আওতায় পড়ে। এই বিষয়গুলি পাঠক্রম-পাঠ্যসূচির অন্তর্ভূক্ত হলে পাঠ্যপুস্তকে লিখতে হবে, শ্রেণিকক্ষে পড়াতে হবে, পরীক্ষায় প্রশ্ন করতে হবে। আমাদের সমাদৃত মানসিকতা ও সংস্কৃতির সঙ্গো এগুলি মেলে না। তাই এ হেন শিক্ষা প্রচলনের ক্ষেত্রে আমাদের আড়ষ্টতা অস্বাভাবিক নয়।

সাম্প্রতিক তাগিদ ------- কিন্তু সমাজ তো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকছে না। কালের গতিতে নতুন-পুরাতনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তার রূপান্তর ঘটে চলেছে। নতুন পরিস্থিতি এনে দিচ্ছে নতুন সমস্যা ও সম্ভবনা, জেগে উঠছে নতুন নতুন চাহিদা, শিথিল হয়ে যাচ্ছে চিরায়ত মূল্যবোধ, ভেঙ্গো পড়ছে সমাজের অনুশাসন। আমাদেরও ঝেড়ে ফেলতে হচ্ছে কিছু পুরানো চিন্তা ও অভ্যাস ।

সামন্ততান্ত্রিক প্রথা ভেঙ্গো নারীসমাজকে যোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক সফল জীবনের সর্বক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকা প্রসারিত করার উদ্যোগ চলছে। এর অন্যতম ফল হিসাবে কিশোর-কিশোরী, তরুন-তরুণীদের মনোভাগ সরে যাচ্ছে, ঘুচে যাচ্ছে অর্থহীন অনাবশ্যক আব্রু। এটা অবশ্যই সমাজ বিকাশের এক সুস্থ লক্ষণ। কিন্তু এই কাম্য স্বচ্ছতা ও স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে নানা পন্থায় অনিয়ন্ত্রিত আচরণ ও

উদ্দাম জীবনধারায় প্ররোচনা সৃষ্টি হচ্ছে মূলতঃ বাণিজ্যিক স্বার্থের দিকে চোখ রেখে। যৌন সম্ভোগের ক্ষেত্রে কোনো সামাজিক অনুশাসন বা আচরণ বিধি থাকবে না, সবটাই অবাধ মুক্ত হবে---- এমন একটি বাতাবরণ পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। বিশ্বায়নের দাপটে যে শিকড়হীন সংস্কৃতির প্রবাহ আমাদের গ্রাস করছে, অমাদেব জীবনচর্যাকে চালিত করতে চাইছে তা এই বিকৃতিতে প্রভূত পরিমান ইন্ধন যোগাচ্ছে । গণমাধ্যমের শক্তিশালী অংশ এই অসুস্থ প্রবণতাকে শহর-গ্রামে ছড়িয়ে দিচ্ছে। অবাস্তব এক রঙীন স্বপ্নের ছবি তুলে ধরা হচ্ছে যার মর্মকথা-- নির্বিচার অবারিত যৌন সম্ভোগেই জীবনের সার্থকতা। নরনরীর জীবনের একান্ত গোপনীয় মাধুর্যকে হাটের পণ্যে পরিনত করা হচ্ছে ।

প্রবল আর্থসামাজিক টানা-পোড়েনের ভেতরে আমাদের তরুণ সমাজ এমনিতে গভীর বিভ্রান্তির শিকার। সেই সঙ্গে এইসব বর্ণাঢ্য প্রচার আর প্রলোভন-জাগানো সম্প্রচার তাদের পথভ্রষ্ট করছে, জাগিয়ে তুলছে অসুস্থ কৌতুহল, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ঔৎসুক্য। পারিবারিক সম্পর্ক ও সামাজিক অন্ধনগুলি বিপর্যস্ত হচ্ছে। মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে যৌন আনাচার। সমাজের কিছু মান্য-গণ্য অংশও ব্যক্তিস্বাধীনতার দোহাই দিয়ে এই যথেচ্ছাচারের পক্ষে সওয়াল করছেন। সামাজিক শৃঙ্খলাকে সেকেলে ধারণা বলে উড়িয়ে দিতে চাইছেন। এই অস্থির পরিমন্ডলে সৃষ্টি হচ্ছে নানাবিধ ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিপত্তি। মারাত্মক ড্রাগের নেশা, অবাঞ্ছিত গর্ভসঞ্চার, আর সর্বোপরি কালব্যাধি এইডস্ - এর দ্রুত বিস্তার আমাদের আতঙ্কিত করে তুলেছে। অনেক মানুষই এখন পুরানো চিন্তা ও অভ্যাস ঝেড়ে ফেলতে চইছেন। তাঁরা উপলব্ধি করছেন, যা কিছু পথে প্রকাশ্যে চলে আসছে, তাকে গোপন রাখার ব্যর্থ চেষ্টা না করাই সমীচীন। তাই বিজ্ঞানসম্মত যৌনবিষয়ক শিক্ষা সম্পর্কে সমাজের বিরোধিতা বা আপত্তি ক্রমশ কেটে যাচ্ছে ।

তথাপি বিতর্ক ---- পুরানো চিন্তায় কিছু নাড়াচাড়া পড়েছে এটা ঠিক। তথাপি অভিভাবক ও শিক্ষক মহলে এ বিষয়ে কিছু সোচ্চার আপত্তি আছে । পর্যদ বার্তার ডিসেম্বর ২০০৩ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি অত্যন্ত সুলিখিত নিবন্ধে এই মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে। ('বয়ঃসন্ধির সমস্যাপূরণ ঃ কিছু প্রশ্ন, কিছু সংশয়' - শ্রী জীবন কুমার মুখোপাধ্যায়)। এই চিন্তার কয়েকটি মূল ৱিষয় হল - -

ক) বিদ্যালয়ে যৌন শিক্ষা প্রবর্তনের প্রকৃতকারণ সামাজিক ভ্রষ্টাচারের সঙ্গো আপস করা এবং এই অনাচারের দায় অল্পবয়সী কিশোর-কিশোরীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া। এই প্রস্তাবে বয়স্ক অভিভাবকের সুবিধাবাদী মানসিকতার পরিচয় আছে। তাঁরা যেন বলে দিচ্ছেন — ' এই তো পরিস্থিতি, এখন তোমারা তোমাদের সামলাও' ।

খ) উপস্থিত কর্মেন্দ্রিয় সম্পর্কে সামাজিক শিষ্টাচারকে ভেঙ্গো ফেলার 'ষড়যন্ত্র বর্তমান বাণিজ্যিক সমাজব্যবস্থায় অত্যন্ত প্রবল এবং প্রকৃতপক্ষে বয়ঃসন্ধিকালের ছেলেমেয়েদের এই অভ্যাস-রিক্ততার সুযোগে তাদের প্রথমতঃ দিশাহারা করে, পরে তাদের যৌনশিক্ষার মধ্যে চিত্তপ্রশমনের উপায় খোঁজা হচ্ছে বাণিজ্য-শাসিত কিছু রাষ্ট্রব্যবস্থায় ।'

গ) যৌনশিক্ষার মাধ্যমে বিষয়টি সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের অবহিত করে তাদের নিজেদের বিষয়ে সতর্ক হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া এবং অজানা বিষয়ে কৌতূহল নিবৃত্ত করার লক্ষ্য নিয়ে এই শিকার

আয়োজন। কিন্তু সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে যে এর ফলে হিতে বিপরিত হতে পারে। এই শিক্ষা ছেলেমেয়েদের মধ্যে ' চিত্ত বিক্ষেপকারী তপ্ত ভাবনা চিন্তার বিষয়' হয়ে উঠতে পারে।

ঘ) একটি নতুন বিষয়ের প্রবর্তন পাঠক্রমের ভারবৃদ্ধি করবে। তাছাড়া 'এই গুরুভার বিষয়ের উত্তেজক প্রসঙ্গগুলি' নবযৌবন প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের 'বয়সোচিত কোমল এবং নির্দায় মানসিকতাকে' সংক্ষুব্ধ করে তুলতে পারে ।

ঙ) যৌন সম্পর্ক ঘটিত রোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বিদ্যালয়স্তরে যৌনশিক্ষা প্রবর্তনের চেয়ে বেশি কাম্য এমন একটি 'সামাজিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা, যার চরিত্রলক্ষণের মধ্যেই থাকবে প্রাক-বিবাহ বা বিবাহ-ব্যতিরিক্ত যৌন জীবনের উপর শাসন এবং নিন্দা যাতে বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা জীবনের অন্যান্য নীতিবোধ গড়ে তোলার মতো এ বিষয়েও তদনুযায়ী নীতিবোধ গড়ে তুলতে পারে।'

চ) 'মানুষের যৌনজীবন সম্পর্কে পারিবারিক পাঠশালাই সর্বাধিক কার্যকারী'। নানা কারণে সেই পরিবার ব্যবস্থাটি ভেঙ্গে যাচ্ছে। কিন্তু বিকল্প হিসেবে যদি স্কুলপাঠ্যের আশ্রয় নেওয়া হয় তবে সেই 'অকালীয় ব্যস্ততার কুফল' ফলতে পারে ।

ছ) বয়ঃসন্ধিকালের দেহমনের গোচরীভূত পরিবর্তনগুলি নিয়ে তাদের যাবতীয় জ্ঞাতব্য মা-বাবার কাছ থেকে খোলা মনেই জেনে নিতে পারে। এ জন্য 'ছেলেমেয়েদের যৌন শিক্ষার প্রয়োজন নেই, বরং কিছু প্রয়োজন থাকতে পারে তাদের মা-বাবার এ বিষয়ে কিছু শিক্ষার যাতে তাঁরা তাঁদের সন্তানদের প্রয়োজনীয় আলোর সন্ধান দিতে পারেন' ।

ওপরে সন্নিবেশিত মন্তব্যগুলি অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য এবং অনেক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের ভাবনার প্রতিফলন। এই যুক্তিগুলিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বিচার করে পর্ষদের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য নিচে দেওয়া হ'ল —

১/ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিকৃতি এবং তজ্জনিত সাংস্কৃতিক ও নৈতিকতার অবক্ষয় যে মূল সমস্যা সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। বাণিজ্যিক সমাজব্যবস্থাই নিঃসন্দেহে এই অধঃপতনের প্রধান কারণ। এর সামগ্রিক ফল হিসেবে মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক অনুশাসন ভেঙ্গে পড়ছে, বিপন্ন হচ্ছে সভ্যতা। এই অসুস্থতার লক্ষণ সমাজের সব ক্ষেত্রে প্রকট হয়ে উঠছে। তরুণ সমাজকে পরিকল্পিতভাবে বিপথচালিত করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সমাজ বদলের প্রয়োজনীয়তার কথা আজ সবার কণ্ঠেই শোনা যাচ্ছে। এমন কি বিদ্যালয় শিক্ষার পরামর্শদানের কেন্দ্রিয় সংস্থা এন. সি. ই. আর. টি ২০০০ সালের নভেম্বর মাসে জাতীয় পাঠক্রমের যে কাঠামো সুপারিশ করেছিল সেখানে ও শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, "It (education) must also lead to a non-violent and non-exploitative social system" (para 2.5, P. 39)

কিন্তু রাতারাতি তো এই সমাজটাকে পাল্টে দেওয়া সম্ভব নয়। সে এক দীর্ঘস্থায়ী কঠিন সংগ্রাম। এজন্য প্রয়োজনীয় চেতনা সঞ্চারের কাজই এখনও বিশেষ এগোতে পারে নি। কিন্তু এই মুহূর্তে এই

অধঃপতনের সর্বনেশে প্রভাবগুলি থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখার উপায় নেই। সামাজিক পরিবেশ যদি নিষ্কলুষ থাকত, বয়সোচিত কোমল, নির্দায় মানসিকতাকে সংক্ষুব্ধ করে কোনো কুটিল ক্লেদাক্ত উপকরণ যদি বাতাসে ছড়িয়ে না পড়ত, তাহলে শিক্ষা ব্যবস্থার এই উদ্যোগ প্রয়োজন হত না। পরিস্থিতি স্পষ্টতই তেমনটি নয়। বিশেষ স্বার্থবাহী নাগীনীদের নিঃশ্বাস দিকে দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে মারাত্মক গরল। তাই শিক্ষাব্যবস্থার উদার নিশ্চেষ্টতা পরিহাস না হলেও আগামী প্রজন্মের বিপর্যয়ের জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী থাকবেই ।

২/ রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা কমিটির (২০০১--০২) সুপারিশ অনুসারে মাধ্যশিক্ষা পর্ষদ যে নুতন কার্যক্রমটির প্রবর্তন করতে চলেছে তা নিছক যৌন শিক্ষা নয় । কোনো নতুন পাঠ্যবিষয়ও সংযোজিত হবে না। 'জীবন শৈলী' পাঠে জীবনবিজ্ঞানের পাঠ্যসূচিতে কয়েকটি নতুন অংশ যুক্ত হবে। বেশীরভাগ চর্চাই হবে সহপাঠক্রমিক কৃত্যভিতিক। এই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য সমাজমুখী মূল্যবোধসমৃদ্ধ ব্যক্তিত্ব বিকাশের মাধ্যমে একটি সুস্থ সাংস্কৃতিক বাতাবরণ গড়ে তোলা। প্রকৃত প্রস্তাবে এটিতে বিধৃত করার চেষ্টা হয়েছে মৌলিক শিক্ষার নানাদিকের নির্যাস, চিহ্নিত কিছু জীবনদক্ষতার সঙ্গে সামাজিক মূল্যবোধের সমন্বয়। এই প্রকল্পের অন্তর্নিহিত ধারণাটিকে সঠিক রূপ দিয়ে এখনও সর্বসাধারণের সামনে তুলে ধরা সম্ভব হয় নি। ফলতঃ বিষয়টির লক্ষ্য, চরিত্র ও ব্যাপ্তি নিয়ে ভুল বোঝার অবকাশ থেকে গেছে।

৩/ মারাত্মক 'এইড্স' রোগের দ্রুত বিস্তারে সকলেই উদ্বিগ্ন। এই তিক্ত বাস্তবতাকে উপেক্ষা করার উপায় নেই কোন কোন মহল যৌনসংসর্গজনিত রোগ প্রতিরোধ করাকেই বয়ঃসন্ধি শিক্ষার মূল লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেছেন, প্রচার করছেন। এই একপেশে ভাবনার পরিণতি হচ্ছে প্রচ্ছন্ন সেই বার্তা ---'যা খুশী করতে পারে, আত্মনিয়ন্ত্রণ বা সংযমের প্রয়োজন নেই, শুধু রোগটিকে এড়িয়ে চলতে শেখো।' পর্ষদের উদ্যেগ অবশ্যই সেই ধারণার অনুবর্তী নয়। পর্ষদের প্রস্তাবিত প্রকল্পের সামনে যে সুস্থ সামগ্রিক লক্ষ্য আছে তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ।

৪/ পারিবারিক পাঠশালাটি নানা কারণে যে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে এটা তো সাধারণ অভিজ্ঞতা । "ছোট পরিবার সুখী পরিবার"--- এই মন্ত্র গ্রহণ করতে হয়েছে অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতায়। তবে পরোক্ষভাবে তা যে কিছু অ-সুখেরও জন্ম দেয় তা তো অস্বীকার করা যাবে না। পরিবারে এখন আছেন শুধু বাবা-মা যাঁরা বয়ঃসন্ধির ছেলেমেয়েদের যথেষ্ট সঙ্গ দিয়ে তাদের নতুন ভাবনা, কৌতূহল, আবেগ ও অনুভূতির সম্পূর্ণ অংশীদার হতে পারেন না। অনেক ক্ষেত্রে সন্তান ঠিক কী চাইছে, কোথায় তার অভাববোধ তা-ও বুঝতে পারেন না। সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের পিতামাতাদের এ বিষয়ে ধারণারও অভাব আছে। তাঁদেরও শিক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু কোটি কোটি বয়স্ক নিরক্ষরের দেশে সেই শিক্ষা কবে কার দ্বারা কোন্ পদ্ধতিতে সম্পন্ন হবে ? আদৌ হবে কি ? কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা থাকলেও স্কুল ছাত্রছাত্রীরা আগামী দিনে যখন পিতামাতার ভূমিকা নেবে তখন তারা পারিবারিক বিদ্যালয়ের অভাব যথাসম্ভব মেটাতে পারবে ।

জীবনশৈলী শিক্ষার মূলে ধারণার ভিত্তিতে এই কার্যক্রমকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে - -

১) জৈবিক বা শারীরবৃত্তীয় - ঃ যৌন অঙ্গ সমূহ, তাদের কাজ, বিকাশ ও স্বাস্থ্যসমত যত্ন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য ও ব্যাখ্যা দেওয়া যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই সংক্রান্ত সমস্ত সংশয় নিরসন করা এবং ভুল ধারণা ও বিশ্বাসকে দূর করা যায়।

২) মানসিক -ঃ উপরিউক্ত প্রসঙ্গে ছেলেমেয়েদের কাছে তথ্য ও ব্যাখ্যা এমনভাবে তুলে ধরতে হবে যাতে তারা অজ্ঞতা এবং অবদমিত কৌতুহলজনিত উদ্বেগ, আংশকা এবং অন্যান্য মানসিক চাপ থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

৩) সামাজিক -ঃ পরিবার থেকে শুরু করে বৃহত্তর সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের সুস্থ সম্পর্ক গড়েতোলার জন্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত আচরণবিধি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করতে হবে। স্নেহশীল বাবামার সঙ্গে সন্তানের, শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীর সম্পর্ককে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। বন্ধুদের সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত লিঙ্গের মানুষের প্রতি মর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। লিঙ্গে সমতার গুরুত্ব সম্পর্কে তাদের মনে শুধু ধারণা নয় বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে হবে।

৪) সাংস্কৃতিক -ঃ সমাজকে বোঝার জন্য,সমষ্টিগত জীবনযাপনের মানসিকতা তৈরি করার জন্য উচ্চমানের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যান্য শাখার প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহী করা এবং তাদের সৃজনশীলতাকে যথোপযুক্ত অভিমুখে প্রবাহিত করা প্রয়োজন। সংস্কৃতির আস্বাদ ও তাতে সক্রিয় অংশগ্রহন শিক্ষার্থীদের মানুষের প্রতি সংবেদনশীল হতে এবং সুস্থ মানবিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে। জীবনের সর্বাবিধ মূল্যবোধ সঞ্চারের ক্ষেত্রে সংস্কৃতির চর্চার অবদান অনস্বীকার্য।

৫) নৈতিক -ঃ সামগ্রিক অর্থে জীবনশৈলী শিক্ষা ছাত্রছাত্রীদের মানসিক ও সামাজিক সুস্থতা বিধানের মাধ্যমে তাদেব নৈতিক মান উন্নত করবে। ফলে শিক্ষার্থীরা সমাজের সকলের সঙ্গে যৌথভাবে জীবনপথে চলার মানসিকতা অর্জন করবে। তারা সমষ্টির স্বার্থকে নিজের সংকীর্ণ প্রগতিশীল আচারণবিধিকে তারা শ্রদ্ধা করবে, অন্যদিকে ক্ষয়িষ্ণু- সমাজের ক্ষতিকর দিকগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার উপযুক্ত শক্তি অর্জন করতে পারবে।

৬)

জীবন দক্ষতার ধারণা

বয়ঃসন্ধির গুরুত্বপূর্ণ বছরগুলিতে ছেলেমেয়েদের শরীর যেমন বেড়ে ওঠে তেমনই তাদের মনন, চিন্তন,আবেগ ও মূল্যবোধ গড়ে ওঠার এটাই প্রকৃষ্ট সময়। জীবনশৈলী শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বয়সের ছাত্রছাত্রীদের চরিত্রে কয়েকটি বিশেষ আচরণগত গুণ সঞ্চারিত করা যার সমন্বয়ে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন যাপনের জন্য সুস্থ ও পূর্ণ সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব বিকাশিত হতে পারে। এই গুণগুলিকেই জীবনদক্ষতা বা জীবন কুশলতা নাম দেওয়া হয়েছে মানুষের চরিত্রের এই সম্পদগুলিকে কর্ম কুশলতা বা কাজের দক্ষতা থেকে পৃথকভাবে বিবেচনা

করতে হবে। বয়ঃসন্ধিকালের অস্থির মানসিক অবস্থার মধ্যে যে বিরাট সম্ভাবনা নিহিত থাকে তাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করতে পারলেই এই সমাজ -- সার্থক চরিত্র গড়ে তোলা সম্ভব। যে দক্ষতাগুলির কথা এই প্রসঙ্গে সাধারণতঃ আলোচিত হয় সেগুলির সংক্ষিপ্ত ধারণা নীচে দেওয়া হল ঃ

১। আত্মউপলব্ধি ঃ বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের মধ্যে নিজেকে নিয়ে কিছু সংশয়, প্রশ্ন ও কামনা-বাসনা জেগে ওঠে। আমি কে, আমি কী পেতে চাই, কী হতে চাই, তার জন্য কী করতে চাই, কোন কাজটা আমি পারি , কোথায় আমার দূর্বলতা---- এমন ধরনের অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নেবার কৌশল যদি তারা আয়ত্ত করতে পারে তাহলে জীবনের লক্ষ্য স্থির করে নিয়ে কিছুটা ভারমুক্ত নিরুদ্বিগ্নচিত্তে তারা জীবনপথে এগিয়ে চলতে পারে। তবে উদ্বেগ উৎকন্ঠা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। বর্তমান সমাজের সার্বিক অবস্থা তার প্রধান অন্তরায় ।

২। আত্মমর্যদাবোধ ঃ নিজেকে জানার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষার্থীদের নিজের সম্পর্কে একটি বাস্তবোচিত মূল্যায়ন করতে শেখা দরকার যা তাকে সমাজে-সংস্কারে নিজের স্থান বুঝে নিতে সাহায্য করবে। একদিকে অহমিকা, অন্যদিকে হীনমন্যতা------- এই দুই চরম মনোভাব পরিহার করে তারা নিজেদের মর্যাদার উপযুক্ত করে নিজেকে অন্যের চোখে হেয় হতে দেব না----- এই অঙ্গীকার তাদের ব্যক্তিত্বকে সমৃদ্ধ করে তুলবে।

৩। আত্মপ্রকাশ -ঃ অনেক আশা-নিরাশা, স্বপ্ন - কৌতুহল, বিস্ময় - জিজ্ঞাসা এই সব নিয়ে বয়ঃসন্ধি এগিয়ে চলে। কবি সুকান্তর অনন্য বর্ণনায় 'বাস্পের বেগে স্টীমারের মত চলে'। মন খুলে এসব কথা বলা, সুখের অনুভূতি বা অব্যক্ত যন্ত্রণা অন্যদের কাছে প্রকাশ মন কিছুটা হালকা করে তোলে। কিছুটা প্রসঙ্গচ্যুত হলেও রবীন্দ্রনাথের গানের দুটি কলি বোধহয় এখানে উদ্ধৃত করা যায় —

'আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল, শুধাইল না কেহ'

বা

'আমার ইচ্ছে করে তোদের মত মনের কথা কই'

আমার কথা কে শুনবে, কে আমাকে বুঝবে ? —
এই প্রশ্ন তাদের পীড়িত করে ।

তাই মনের কথাগুলি সঠিক সময়ে সঠিকভাবে সঠিক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এক মূল্যবান কুশলতা। এই দক্ষতা ছেলেমেয়েদের মনের ভাব লাঘব করবে, তদুপরি তাদের আত্মবিশ্বাস ও সৃজনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করবে।

এখানে একটি সতর্কবার্তা উচ্চারণ করা প্রয়োজন। উপরে লেখা তিনটির দক্ষতা নিজেকে কেন্দ্র করে। ধারণার অস্বচ্ছতা থাকলে এগুলি আত্মকেন্দ্রিকতার জন্ম দিতে পারে যা বর্তমান প্রতিযোগিতা-জর্জর সমাজের বড়

ব্যাধি। এই তিনটির অনুশীলনই সমাজ সংসারের বৃহত্তর প্রেক্ষিতে স্থাপন করা দরকার। একজন সুনাগরিক তার নিজের আশা ও নিজের চাহিদাকে যেমন বুঝবে, তার কাছে সমাজের কী প্রত্যাশা সে সম্পর্কেও অবহিত ও সজাগ থাকবে। নিজের অধিকার এবং মর্যদাবোধ যেমন গড়ে তুলতে হবে তেমনই তা অর্জন করার জন্য প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালনেও প্রস্তুত থাকতে হবে।

৪) সিদ্ধান্তগ্রহণ ও সমস্যার সমাধান ঃ শৈশব থেকে সব মানুষই পদে পদে নানা বিষয়ে নিজের বিচার বুদ্ধির সাহায্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। একটি কিশোর বা কিশোরী তার স্কুলে যাওয়া, খোলার মাঠে অংশগ্রহন করা, বাড়ীর কাজ করা, গুরুজনদের মান্য করা, সকলকে লুকিয়ে কিছু করে ফেলা – এমন সব কাজের ক্ষেত্রেই সবসময় কিছু স্থির করছে। যেভাবেই হোক, সে তার বুদ্ধি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, তার সমস্যার সমাধান করে চলেছে। প্রতিক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের যথার্থ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিবেচনাশক্তির উপর মূলতঃ নির্ভর করে। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি আছে যার প্রধান ধাপগুলি হল —

ক) সমস্যাটিকে সঠিকভাবে চিনে নেওয়া ঃ অনেক সময় আমরা দু-একটি লক্ষণকেই সমস্যা বলে ধরে নেই, মূল সমস্যাটিকে বুঝতে পারি না। এমন হলে উপযুক্ত সমাধান পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং লক্ষণ বা উপসর্গগুলির গভীরে গিয়ে সমস্যাটিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা প্রথম পদক্ষেপ।

খ) সমস্যাটিকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ ঃ সমস্যাটিকে চিহ্নিত করার পরে তার পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করা দরকার। সমস্যার উৎপত্তি, তার মুখ্য ও গৌণ কারণসমূহ, স্বল্পকালীন ও দীর্ঘমেয়াদী পরিণাম প্রভৃতি দিক থেকে বিচার করলে তার স্বরূপটি উন্মোচিত হবে।

গ) বিকল্প সমাধানসমূহ অনুসন্ধান ঃ প্রায় সব সমস্যার একাধিক সমাধানের পথ থাকে। সাধারণতঃ মানুষের বেশি চিন্তা ভাবনা না করে হাতের কাছে যে সহজ সমাধানটি দেখা যাচ্ছে সেটির দিকে ঝুঁকে পড়ে। এর ফলে সবচেয়ে ভালো সমাধানটি পাওয়া যায় না। সুতরাং সমস্যার প্রকৃতি অনুযায়ী যতগুলি সমাধানের পথ থাকতে পারে তার সবগুলিকে খুঁজে নেওয়া দরকার।

ঘ) বিকল্প পথগুলির মূল্যায়ন ঃ যে বিকল্প সমাধান গুলিকে সন্ধান পাওয়া যাবে তার সব কটিকে বাঞ্চনীয়তা ও সম্ভাবতার নিরিখে বিচার করে দেখতে হবে।

ঙ) শ্রেষ্ঠ বিকল্পটি বেছে নেওয়া ঃ এই প্রক্রিয়ায় পাওয়া তুলনামূলক চিত্র থেকে সবচেয়ে কাম্য পথটিকে বেছে নিতে পারলে সিদ্ধান্তগ্রহন প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হবে।

একথা ঠিক যে অনেক ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত নেবার সময় ওই কেতাবী পন্থা অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু পদ্ধতিটির সঙ্গো পরিচয় থাকলে এবং সচেতনভাবে প্রয়োগ করলে এটি চিন্তনঃ অভ্যাসের অঙ্গা হয়ে যায়। তখন সচেতনভাবে না হলে অধিকাংশক্ষেত্রে আমাদের সিদ্ধান্ত অনেক বেশি সুশৃংখল ও ফলপ্রসু হবে।

বয়ঃসন্ধির সময় এই দক্ষতাটির বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা আছে। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে, সব বয়সের মানুষই প্রায় সারা জীবন ধরে সিদ্ধান্ত নিয়ে চলে। কোনো সিদ্ধান্ত ঠিক হয়, কোনোটা ভুল হয়, তবে অধিকাংশভাবে সিদ্ধান্ত হয় আংশিকভাবে ঠিক, অংশত ভুল। প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে বয়ঃসন্ধির শিক্ষায় আলাদা করে এই বিশেষ দক্ষতার উল্লেখ করা হচ্ছে কেন ।এই দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা দু-দিক থেকে বিচার করা যায়। প্রথমতঃ এই বয়সের ছেলেমেয়েরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়। কিছু সমস্যাকে তারা একান্তভাবে ব্যক্তিগত মনে করে। ছোটদের মত সব কথা বাবামাকে বলতে তাদের দ্বিধা হয়। পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজে সিদ্ধান্ত নেওয়া, নিজের সমস্যা নিজেই মেটাবার তাগিদ তারা অনুভব করে। অপরদিকে এই বয়সেই ছেলেমেয়েদের যুক্তি দিয়ে বিভিন্ন বিষয়কে বুঝে নেবার ক্ষমতাও বিকাশিত হয়ে ওঠে। প্রয়োজন ও যোগ্যতার ব্যক্তিত্বের পরিণমনে সহায়তা করে।

৫) মত প্রকাশের দৃঢ়তা ঃ অনেক সময় ছেলেমেয়েরা কর্তব্য অ-কর্তব্য স্থির করতে পারে, কিন্তু নিজের মত নির্দ্বিধায় জোরালোভাবে বলতে পারে না। একটি কিশোর তার বন্ধুকে ধুমপান বা অন্য কোনো অবাঞ্ছিত কাজে প্ররোচিত করতে চাইছে। প্রথমেই নিজের আপত্তি প্রকাশ করলেও অনেক ক্ষেত্রে সেই বন্ধুর অনুরোধে,বন্ধুর প্রতি দুর্বলতার জন্য অথবা সর্ম্পক রক্ষার খাতিরে নিজের সিন্ধান্তে দৃঢ় থাকতে অক্ষম হয়। সুতরাং অকারণ রূঢ়তা এড়িয়ে নিজের মত স্পষ্ট করে জানানো এবং সেই অবস্থানে অবিচল থাকার অভ্যাস গড়ে তোলা বিশেষ প্রয়োজন। এ ব্যাপারেও একটু সর্তকতা আবশ্যক। যে নিজের আপত্তি জোর দিয়ে বলতে শিখবে সে তো নিজের অন্যায় চাহিদাতেও সমানভাবে অনড় থাকতে চাইবে। সুতরাং এই দক্ষতাটি প্রয়োগের পূর্ব সর্ত হচ্ছে উচিত -অনুচিত, কাম্য- অকাম্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলা।

৬) আবেগ নিয়ন্ত্রণ ঃ মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সমাজজীবনে আবেগ একটি মূল্যবান সম্পদ। মানুষের প্রতি ভালোবাসা, অপরের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে সহযোগী মনোভাব নিয়ে সুস্থ সমষ্টিবদ্ধ জীবনযাপন করার ভিত্তিই হচ্ছে আবেগ। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত আবেগের প্রাবল্য কখনো কখনো মানুষের বিবেচনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তখন মানুষ জীবনযাত্রায় সঠিক পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়, পথভ্রান্ত হয়। তাই আবেগকে সঙ্গাত মাত্রায় মধ্যে নিবন্ধ রাখার দক্ষতা অত্যন্ত মূল্যবান।

৭) চাপ সহ্য করা ঃ বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের মনে স্বাভাবিক ভাবেই নানারকম চাপ সৃষ্টি হয়। অনেক রঙীন স্বপ্ন তারা দেখে, কিন্তু নির্মম বাস্তবের আঘাতে তার অধিকাংশই ভেঙে যায়। জীবনের অনেক আশা পূরন হয় না। দৈনন্দিন জীবনে ছোট-বড় নানা ব্যর্থতা তাদের অন্তরকে পীড়িত করে। বর্তমান যুগের জটিল অর্থসামাজিক পরিস্থিতি আগামীদিনের নাগরিকদের এক বিরাট অংশের কাছে ক্রমশঃ বেশিমাত্রায় প্রতিকূল হয়ে উঠেছে। জীবিকার অনিশ্চয়তা তাদের আত্মবিশ্বাস ভেঙে দিচ্ছে সুস্থাভাবে বেঁচে থাকার সাধারণ সুযোগগুলি থেকে বঞ্চিত হয়ে তারা অসহায় বোধ করছে। সমাজে সংসারে নিজেদের মূল্যহীন মনে করছে, দুর্বল হয়ে যাচ্ছে তাদের আত্মমর্যদাবোধ অন্যদিকে মুষ্টিমেয় কিছু তরুন-তরুণী প্রাচুর্যের সমুদ্রে ভাসছে। শুধু জীবনধারায় নয় ভোগবিলাসের সব উপকরন

তাদের হাতের মুঠোয়। আত্মমগ্ন এই শ্রেনি সমাজের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। প্রতিকারের পথ খুঁজে পায় না। তরুণমনে এই অস্বাভাবিক চাপ ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছে ।

এই আরোপিত চাপের যথাযথ মোকাবিলা করতে না পারলে তরুন তরুণীরা বিপথে চলে যায় ভেঙে পড়া মন নিয়ে তারা অবসাদ বা বিষন্নতায় ভোগে। আত্মহরণকারী বিবিধ প্রবণতা গ্রাস করে। মাদকাশক্তি, যৌন অনাচার, হিংস্র প্রতিবাদ প্রভৃতি সেই দুর্বলতার পরিনাম। সুতরাং বয়ঃসন্ধির ছেলেমেয়েদের পরিস্থিতির প্রতিকূলতা অনুধাবন করতে হবে, তার কারণগুলি যুক্তিবাদী মন দিয়ে বুঝতে হবে এবং সমষ্টিগতভাবে বেঁচে থাকার সংগ্রাম থেকে পালিয়ে না যাবার মত মানসিক শক্তি অর্জন করতে হবে। পক্ষান্তরে বিত্তবান পরিবারের আত্মকেন্দ্রিক জীবনে অভ্যস্ত তরুন তরুণীদেরও অনুভব করতে হবে 'স্বার্থমগ্ন যে-- জন বিমুখ বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখে নি বাঁচিতে।' সেই ছেলেমেয়েরাও অন্যরকম চাপের মধ্যে থাকে ---- তাদের আকাংঙ্ক্ষা আকাশচুম্বী কোনো বৈভবই তাদের সীমাহীন চাহিদাকে তৃপ্ত করতে পারে না। তাই তাদের হতাশাও হয় অতলস্পর্শী।

সব মহলের নাগরিকদের নিয়েই আমদের সমাজ, সব শ্রেণির ছেলেমেয়েরাই আমাদের লক্ষ্যদল। চাপের মুখে অবিচল দক্ষতা তাদের অর্জন করতেই হবে। এই দক্ষতা তারা আয়ত্ত করবে জীবন থেকে যে জীবন গড়ার একটি স্তম্ভ শিক্ষাব্যবস্থা। তারা শিখবে, কবির ভাষায় ---

'ভালোমন্দ যাহাই আসুক, সত্যেরে লও সহজে'

৮) সহমর্মিতা ঃ এটি মূলত শিল্প-- সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত একটি বিমূর্ত ধারণা। সাধারণভাবে এর অর্থ হচ্ছে নিজের আবেগ--- অনুভূতিকে অন্য কোনো ব্যক্তির সমস্তরে নিয়ে এসে তদনুযায়ী প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা। একজন মানুষ রেগে গেলে অন্যজন তাকে ব্যঙ্গ করে ভেঙিয়ে আরো রাগিয়ে দিতে পারেন। অথবা নিজেকে সেই ব্যক্তির জায়গায় প্রতিস্থাপন করে তার ক্ষোভের কারণ বুঝে নিয়ে তার প্রতি ইতিবাচক আচরণ করতে পারে। এই আচরণ অনেকটাই স্বতঃস্ফূর্ত হয়। কিন্তু সচেতনভাবে অভ্যাস করলে এই প্রতিক্রিয়াকে সর্বদাই সদর্থক করে তোলা যায়। সেক্ষেত্রে কেউ দুঃখ প্রকাশ করলে নির্বিকার থাকা অথবা তাকে বিদ্রুপ করার বদলে তার দুঃখের সঙ্গে নিজের অনুভূতিকে মিলিয়ে দেওয়াটা স্বাভাবের অঙ্গ হয়ে উঠবে। এই দক্ষতা ছেলেমেয়েদের সামাজিক করণের পথে এগিয়ে দেয়। মানুষের সঙ্গে সুসর্ম্পক বজায় রাখতে সাহায্য করে।

৯) সহিষ্নুতা -ঃ সব মানুষের ক্ষেত্রেই সহিষ্নুতা একটি মৌলিক চারিত্রিক গুণ। কিন্তু বয়ঃসন্ধির জীবন কুশলতা হিসেবে এটিকে স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। কারণ এই বয়সে ছেলেমেয়েদের মধ্যে আত্মসচেতনতার ফলে অসহিষ্নুতার ঝোঁক দেখা যায়। তারা যখন আত্মমর্যাদা এবং মতামতের দৃঢ়তার দিকে দৃষ্টি দিবে তখন ছোট বড় কারো কথাই মেনে না নিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রবণতাও বাড়বে। এই ঝোঁক এড়াতে না পারলে সামাজিক সুসম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে তারা সমস্যায় পড়বে ।

জীবনশৈলী নামের তাৎপর্য ঃ বয়ঃসন্ধির শিক্ষা প্রসঙ্গে সাধারণত 'জীবন দক্ষতা' বা 'জীবন কুশলতা' নামটিই ব্যবহার করা হয়। সেদিন থেকে বিচার করলে 'জীবন শৈলী' নামকরণে অভিনবত্ব আছে। পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে এই শিরোনাম গ্রহণ করা হয়েছে। এই অভিধ জীবনকুশলতাগুলি যুক্তি সঙ্গত। সারা দেশের কিশোর কিশোরীরা বিভিন্ন রকম অর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে বড় হয়ে ওঠে। তাই জীবনকুশলতাগুলি আয়ত্ত করার সুযোগ সকলে সমানভাবে পায় না। স্বভাবতই এই দক্ষতাগুলি অধিগত করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তারতম্য থাকবে। কেউ হয়ত দৃঢ়ভাবে মতপ্রকাশে পটু হয়ে উঠল, কিন্তু তার সহমর্মিতায় ঘাটতি থেকে গেল। কারো বা আত্মমর্যদা প্রখর হল, কিন্তু সিন্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে দূর্বলতা রয়ে গেল। এইভাবে বিভিন্ন মাত্রায় জীবনকুশলতাগুলি আত্মস্থ করে ব্যক্তির জীবনচর্যার অভিমুখ গড়ে ওঠে। জীবনকুশলতাগুলি সমন্বয়ে নির্মিত হয় জীবন শৈলী। শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য হবে সকলের মধ্যে জীবনকুশলতাগুলি কাম্যস্তরে বিকশিত করা যা আদর্শস্থানীয় জীবনশৈলী রচনা করবে। কিন্তু বাস্তবে অনিবার্যভাবেই নানা মানুষের জীবনশৈলীর মধ্যে বৈচিত্র ও স্বাতন্ত্র থাকবে। আয়ত্ব করতে হবে কুশলতা, তার নির্যাস হিসাবে ফল পাওয়া যাবে জীবনশৈলীতে।

জীবনশৈলী শিক্ষার কার্যক্রম ঃ পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদ্ মনে করে বর্তমানে অনুসৃত পাঠক্রমকে আর ভারাকান্ত করা শিক্ষার্থীদের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। সুতরাং নতুন কোনো বিষয় সংযোজন না করা পর্যদের বিবেচিত নীতি। আগের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে জীবনশৈলী শিক্ষার বড় অংশেই মূল্যবোধ ও চরিত্র গঠনকে কেন্দ্র করে বিন্যাস্ত হবে। জাতীয় স্তরে সহমতের ভিত্তিতে স্থির হয়েছে যে যাবতীয় কাম্য মূল্যবোধ সঞ্চারের জন্য প্রচলিত পাঠক্রমের বিভিন্ন বিষয় এবং সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমকেই যথাযথভাবে ব্যবহার করা হবে।

জীবনশৈলীর ক্ষেত্রে শুধু শারীরবৃত্তের কিছু অংশ জীবন বিজ্ঞান বিষয়ের পাঠ্যসুচিতে যোগ করা হবে। অবশিষ্ট বড় অংশই নানবিধ সুপরিকল্পিত সহপাঠক্রমিক কৃত্যের ভেতর দিয়ে সম্পন্ন করার চেষ্টা হবে। এই ধরনের কিছু কৃত্যের রূপরেখা এই পুস্তিকায় দেওয়া হল। সবরকম পরিস্থিতিতে একই কার্যক্রম অনুসরণ করা বা ফলপ্রসু করা যাবে না। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট, প্রয়োজন ও সম্ভাব্যতা বিচার করে উপযুক্ত কার্যক্রম উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করতে হবে।

একথা পুনরুল্লেখের দাবী রাখে যে জীবনকুশলতায় সমৃদ্ধ হওয়া সব ছেলেমেয়েকে চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করায় না। বিত্তবান, অভিজাত এবং আলোকপ্রাপ্ত পরিবারের সন্তানদের সুযোগ-সুবিধা, স্বপ্ন ও সমস্যা এক রকম। আবার দরিদ্র পিছিয়ে-পড়া ঘরের প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে পরিস্থিতি সম্পূর্ণই ভিন্ন। ছেলেদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব এবং কন্যা সন্তান-এর প্রতি বঞ্চনার অভ্যাস সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে আছে। তাই আত্মমর্যদা প্রভৃতি দক্ষতা অর্জন করা ছাত্রীদের পক্ষে অনেক কঠিন কাজ। সব শ্রেণির ছেলেদের ও মেয়েদের সমানভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ক্ষেত্র অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন কর্মসূচি গ্রহন করা এবং দূর্বল অংশের জন্য বিশেষভাবে যত্নশীল হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

খ. বিদ্যালয় স্তরে পরিবেশ- শিক্ষা

ভূমিকা

কয়েক বছর পূর্বেই ভারতের মহামান্য সর্বোচ্চ আদালত একটি রায়ে শিক্ষার সর্বস্তরেই পরিবেশ শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু সেই নির্দেশ সর্বত্র সঠিকভাবে পালিত হচ্ছে না এই অভিযোগ ওঠায় ২০০৩ এর ১৮ ই ডিসেম্বর মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট রাষ্ট্রীয় শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদকে (NCERTকে) নির্দেশ দেন ২০০৪ এর ১৪ই এপ্রিলের মধ্যে বিদ্যালয় শিক্ষার সর্বস্তরের জন্য মডেল সিলেবাস করে জমা দেবার জন্য যাতে ওই সিলেবাসের ভিত্তিতে ভারতের সব রাজ্যেই বিদ্যালয় স্তরে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পরিবেশ-শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষ থেকেই শুরু হতে পারে। NCERT ঐ সিলেবাস আদালতে জমা দেবার পর সেটি গৃহীত হয়েছে এবং রাজ্যগুলির উপর বিদ্যালয় স্তরে অবিলম্বে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পরিবেশ-শিক্ষা চালু করার দায়িত্ব বর্তেছে। অবশ্য বলা হয়েছে যে, পরিবেশ-শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা গঠন, তাদের মধ্যে পরিবেশ সম্পর্কে কিছুটা চিন্তাভাবনার সামর্থ্য গড়ে তোলা, পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কাম্য দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ জাগানো, তাদের প্রাসঙ্গিক আচার-আচরণের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন নিয়ে আসার প্রয়াস। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ-শিক্ষা এবং কীভাবে বিভিন্ন সমস্যা কাটিয়ে উঠে এই শিক্ষা পরিকল্পনার রূপায়ণ সম্ভব হতে পারে সে সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা এখানে উপস্থাপিত হল।

পরিবেশ ও পরিবেশ-শিক্ষা

আমরা সকলেই জানি পরিবেশ হল ইংরেজি environment শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ। এই environment শব্দটি আবার এসেছে একটি প্রাচীন ফরাসি শব্দ environ থেকে, যার অর্থ encircling বা ঘিরে থাকা। অর্থাৎ আমাদের ঘিরে থাকা যা কিছুই আছে, যারা সব আছে তাদের সকলকে নিয়েই আমাদের পরিবেশ যার মধ্যে আমরাও অন্তর্ভুক্ত।

এই পরিবেশকে আমরা বিভিন্নভাবে দেখে থাকি, যেমন মহাবিশ্ব জাগতিক পরিবেশ, বিশ্ব পরিবেশ, স্থানীয় পরিবেশ, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ ইত্যাদি। কিন্তু মনে রাখা দরকার পরিবেশ এক ও অবিচ্ছেদ্য। ধারণার সুবিধের জন্যই কেবল একই পরিবেশকে বিভিন্ন ধরনের পরিবেশের সমষ্টি হিসাবে আমরা দেখে থাকি।

অনেকেই পরিবেশের যাবতীয় প্রাণ ও অপ্রাণ উপাদান সমূহ ছাড়াও আমাদের জীবনযাত্রার উপর প্রভাব ফেলে এমন যাবতীয় প্রক্রিয়া, উপাদানগুলির যাবতীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এসবকেও পরিবেশের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্তির পক্ষে ।

পরিবেশ-শিক্ষা বলতে স্বভাবতই পরিবেশ-সম্পর্কিত শিক্ষার বিষয়টিই আমরা ভাবব। তবে আসলে

পরিবেশ-শিক্ষা বলতে মূলত তিনটি বিষয়কে বোঝায় ঃ (১) পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষা (২) পরিবেশের মাধ্যমে শিক্ষা এবং (৩) পরিবেশের জন্য শিক্ষা।

পরিবেশ শিক্ষা কেন ?

কেন পরিবেশ-শিক্ষা এই বিষয়টিকে নিয়ে সম্ভবত কোনও দ্বিমতের অবকাশ নেই।

আমরা সকলেই জানি যে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানেই পরিবেশে যে অজস্র সমস্যা দেখা দিয়েছে, তা থেকে রক্ষা পেতে গেলে, আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে যথোচিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ ছাড়াও বিশ্বের আপামর জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে পরিবেশ-সচেতনতা গড়ে তোলা অবশ্য প্রয়োজন। নতুবা আমাদের প্রিয় নীল গ্রহটির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে।

বিশ্বের দিকে দিকে জল, বায়ু, মৃত্তিকা দূষিত হয়ে পড়ছে। বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং অন্যান্য কয়েকটি গ্যাসের (গ্রীন হাউস গ্যাসের) পরিমান ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে ভূতাপমাত্রা বৃদ্ধির আশঙ্কা এবং পরিণামে মেরু অঞ্চলের সঞ্চিত বরফ গলে সমুদ্র জলতল স্ফীত হয়ে পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ক্ষতিকারক রাসায়নিকের আঘাতে বায়ুমন্ডলের ওজোন স্তর বিশ্বের কোনও কোনও স্থানে ধীরে ধীরে পাতলা হয়ে আসায় সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির বায়ুস্তর ভেদ করে বিপজ্জনক মাত্রায় ভূপৃষ্ঠে পৌঁছে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, যার ফলে বহু অঞ্চলে অনেকেই ত্বক-এর ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে। অপরদিকে বনভূমি ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে থাকায় মরু বিস্তারের সম্ভবনা বাড়ছে, ভূমিক্ষয় দ্রুততর হচ্ছে, একদিকে খরা অন্যদিকে বন্যার সম্ভবনা বাড়ছে। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধিতে কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ কমে আসছে, পৃথিবীর খনিজ সম্পদ ভান্ডার জীবাশ্ম জ্বালানী ভান্ডার সহ দ্রুত নিঃশেষের পথে, জ্বালানী সঙ্কট তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের অজস্র প্রজাতি ইতিমধ্যেই বিলুপ্ত বা বিলুপ্তির পথে, ফলে পার্থিব বাস্তুতন্ত্রে ভারসাম্য নিদারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে - গুরুতর বিপদের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

এই ধরনের অজস্র সমস্যা আজ পার্থিব পরিবেশকে বিপর্যস্ত করে তুলছে। উল্লেখ্য যে পার্থিব পরিবেশে এই যেসব সঙ্কট দেখা দিচ্ছে সেগুলির বড়ো অংশই প্রকটভাবে দৃশ্যমান হয়েছে গত প্রায় ষাট বছরে। (মনে রাখতে হবে পৃথিবীর ন্যূনতম বয়স প্রায় সাড়ে চারশো কোটি বছর, পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব প্রায় সাড়ে তিনশো কোটি বছর আগে আর এই গ্রহে মানুষের আবির্ভাব প্রায় ২০ লক্ষ বছর আগে আর এখনকার মতো মানুষ-হোমো স্যাপিয়েন্স্ এসেছে মাত্র ১ লক্ষ বছর আগে)।

সম্মিলিত জাতিপূঞ্জের প্রাক্তন মহাসচিব উ. থান্টের মতে পার্থিব পরিবেশে ঘনীভূত সংকটের মূল কারণ তিনটি ঃ জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, দ্রুত নগরায়ন এবং প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগ, বিশেষত ঃ এগুলি সুপরিকল্পিতভাবে না হওয়া। যাই হোক না কেন, পৃথিবীর পরিবেশ যাতে আর ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয় সেজন্য পরিবেশ সম্পর্কিত এ যাবৎ অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলির সুপারিশ সমূহের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে আশু ব্যবস্থাদি নেওয়া অত্যাবশ্যক তো বটেই সেই সঙ্গে আপামর জনসাধারণের মধ্যেও ব্যাপক পরিবেশ-সচেতনতা গড়ে তোলা জরুরী - সব রকম পন্থার মাধ্যমে, সর্বস্তরের সব ধরনের শিক্ষার মধ্য দিয়েও।

মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের, ১৩.০৭.২০০৪ তারিখের রায় অনুযায়ী রাজ্যের সব বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণির জন্য আবশ্যিক বিষয় হিসাবে NCERT প্রবর্তিত সিলেবাস অনুসরণ করে পঠন-পাঠন ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয় শিক্ষার স্তরে পরিবেশ-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিতর্ক না থাকলেও কীভাবে এই শিক্ষা দেওয়া হবে সে বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ বিতর্ক ছিল ঃ পাঠক্রমে একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে না কি পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের সিলেবাসে উপযুক্ত স্থানে (plug points -এ) পরিবেশ সম্পর্কিত ধ্যানধারণা প্রদানের মাধ্যমে পরিবেশ-শিক্ষার ব্যবস্থা করা ? ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের রায় ও নির্দেশ অনুসারে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের এ বিষয়ে পাঠক্রম-পাঠ্যসূচি প্রণয়ন এবং সুপারিশের পর এই বিতর্ক এখন নিরর্থক হয়ে পড়েছে। এখন, আমাদের প্রচেষ্টা চালাতে হবে মহামান্য সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ অনুসারে বিদ্যালয় শিক্ষার সর্বস্তরে কীভাবে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পরিবেশ-শিক্ষার প্রচলন সম্ভব করা যায় সে সম্পর্কিত পরিকল্পনা করা ও সেটি দ্রুত রূপায়ণ করা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের রাজ্যের বর্তমান ব্যবস্থার সামান্য পর্যালোচনা প্রয়োজন।

❖ প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ-শিক্ষা

আমাদের রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে সমগ্র শিক্ষাক্রম-পাঠ্যসূচিটি পরিকল্পিতই হয়েছে পারিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি (environmental approach) নিয়ে। পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত প্রায় সমস্ত বিষয়গুলির মাধ্যমেই পরিবেশ-শিক্ষার এবং পরিবেশ সচেতনতা গঠনের উপাদান ও সুযোগ রাখা হয়েছে। যেমন, স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা বিষয়ের সঙ্গে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক, সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজের মধ্যে, পঠন-পাঠন নির্ভর বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে। তবে একেবারে পৃথক বিষয় হিসাবেই পরিবেশ-পরিচিতি রয়েছে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য, যে বিষয়টিতে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সমন্বিতভাবে শেখা ও শেখানোর ব্যবস্থা রয়েছে। তৃতীয় শ্রেণি থেকে প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রকৃতি বিজ্ঞান হিসাবে ও সামাজিক পরিবেশ ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নবীকৃত শিক্ষাক্রম-পাঠ্যসূচিতে মূল্যবোধ গড়ে তোলার জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে যেসব আবশ্যিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে পরিবেশ ভাবনা (concern for the environment) এবং পরিবেশের উপাদানগুলির সঙ্গে সুসামঞ্জস্য সম্পর্ক বিধান করে চলতে শেখার (learning to live together) উপর বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। পরিবেশ সম্পর্কে ছোটোখাটো প্রকল্পের পরিকল্পনা ও রূপায়ণের নির্দেশিকাও এই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে রয়েছে।

অতএব উদ্ভুত পরিস্থিতিতে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তেমন কোনও বড়ো ধরনের সমস্যা দেখা যাবে না। তবে পরিবেশ সম্পর্কে এবং পরিবেশের মাধ্যমে শিক্ষার উপর এই স্তরে যতখানি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে পরিবেশের জন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে হয়তো ঠিক ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, পাঠ্য/কৃত্য বিষয়ের এই দিকটিকে আরো জোরদার করার অবকাশ আছে ।

❖ নিম্ন মাধ্যমিক (প্রারম্ভিক), মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পরিবেশ শিক্ষা

একেবারে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা স্তরের ক্ষেত্রে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে পরিবেশ-শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, এই অবস্থায় প্রারম্ভিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাঠক্রমে পরিবেশ-শিক্ষা পাঠ্যসূচি / কৃত্যসূচি সংযোজন ভিন্ন গত্যন্তর নেই। এই বিষয়ে কয়েকটি প্রধান সমস্যার মোকাবিলার কথা আমাদের ভাবতে হবে ঃ (ক) পাঠক্রম খুব বেশি ভারাক্রান্ত না করে কীভাবে পরিবেশ বিষয়টিকে রাখা যায়, (খ) কোন শিক্ষকেরা পরিবেশ বিষয়টিকে শেখাবেন (গ) মূল্যায়ন ব্যবস্থা কীভাবে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যাবে (ঘ) শ্রেণি দিবস আর না বাড়িয়ে এই নতুন বিষয়টি শেখা-শেখানোর ব্যবস্থা করা যাবে কীভাবে ইত্যাদি।

প্রথম সমস্যাটি সম্পর্কে কারও কারও পরামর্শ হল ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির মধ্যে পরিবেশ-শিক্ষার যে উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়ে রয়েছে, সেগুলিকে ওই বিষয়গুলি থেকে নিয়ে এসে পৃথক পরিবেশ-শিক্ষা পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। তবে মনে হয় প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির মধ্যে স্বতস্ফুর্তভাবে পরিবেশ সম্পর্কিত যেসব বিষয়বস্তু বা ধারণা এসে গেছে সেগুলি সম্পূর্ণভাবে সেখান থেকে বাদ দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমনতরো দু-একটি বিষয়বস্তু পৃথক পরিবেশ পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকলে ওই অংশগুলির পঠন-পাঠন পরিচালনার দায়িত্ব প্রাসঙ্গিক বিষয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা নিতে পারেন, তাহলে সময় এবং পুনরাবৃত্তি কিছুটা কমিয়ে আনা যেতে পারে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তরে বলা যায় যে যেহেতু বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলাই মূল লক্ষ্য, তাদের পরিবেশ বিশেষজ্ঞ হিসাবে গড়ে তোলা নয়, কাজেই যে কোনো শিক্ষক/শিক্ষিকা বা সকল শিক্ষক /শিক্ষিকাই এই বিষয়টি পড়াতে/শেখাতে পারবেন যদি সুপরিকল্পিতভাবে বিষয়টির পঠন-পাঠন পরিচালনা সম্পর্কে তাঁদের অভিমুখীকরণের / স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা যায়। এ বিষয়ে পর্ষদ্ শিক্ষক সংগঠনগুলির সঙ্গে আলোচনা করবেন যাতে শিক্ষক সমাজের পূর্ণ সহযোগিতা এ বিষয়ে লভ্য হয়।

ভারতের মহামান্য সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, রাষ্ট্রীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ প্রণীত ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পরিবেশ-শিক্ষা বিষয়ক পাঠক্রম-পাঠ্যসূচিটি পুরোপুরি গ্রহণ করে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই এটি প্রবর্তনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং সেই অনুযায়ী পাঠ্য পুস্তকের পান্ডুলিপি প্রস্তুতির কাজটি চলছে। যেহেতু পাঠক্রম -পাঠ্যসূচি সম্পর্কে আর কোনও চিন্তাভাবনার, অবকাশ নেই। সুতরাং সে বিষয়ে মন্তব্য প্রদান এখন নিরর্থক। তবে পঠন-পাঠনের ভার কমানোর গুরুদায়িত্ব এখন বর্তাবে অনেকাংশে সেইসব বিশেষজ্ঞদের উপর যাঁরা পরিবেশ-শিক্ষার পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত থাকবেন এবং পঠন-পাঠন কৃত্য বিষয়, মূল্যায়ন পরিকল্পনার রূপরেখা প্রস্তুত করবেন। পরিবেশ-সচেতনতা গড়ে তোলা, স্থানীয় পরিবেশের উপর সর্বাধিক গুরুত্বপ্রদান ও পরিকল্পিত ছোটোখাটো কাজকর্ম সম্পাদন করানো এই বিষয়গুলি নিয়ত চিন্তায় রাখতে পারলে আশা করা যায় পঠন-পাঠনের ভার কিছুটা লাঘব করা সম্ভব হবে।

বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে ইতিমধ্যে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ প্রাথমিকভাবে পরিবেশ-শিক্ষা সম্পর্কে যেসব চিন্তাভাবনা করেছেন সেগুলির কয়েকটি হল ঃ

- ✔ ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পরিবেশ-শিক্ষা পৃথক এবং আবশ্যিক বিষয় হিসাবে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে। NCERT-র এই বিষয়ে পাঠক্রম -পাঠ্যসূচিটিই অনুসৃত হবে।
- ✔ আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই এইসব শ্রেণিতেই বিষয়টির পঠন-পাঠনের প্রচলন প্রচেষ্টা হবে।
- ✔ মাধ্যমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে এবং সকল শ্রেণির ক্ষেত্রেই পরিবেশ-শিক্ষা বিষয়টিতে পরীক্ষায়/মূল্যায়নে পূর্ণ মান হবে ১০০। এই ১০০ নম্বরের বিভাজন হবে ঃ লিখিত পরীক্ষায় ৫০, অন্তর্মূল্যায়নে ২০, পরিবেশ বিষয়ক প্রকল্পের জন্য ২০ এবং পরিবেশ বিষয়ক কাজকর্মের (সক্রিয়তার) জন্য ১০।
- ✔ প্রতি শ্রেণিতে পরিবেশ-শিক্ষা বিষয়টি পঠন-পাঠনের জন্য শিক্ষাবর্ষে মোট ৬০টি পিরিয়ড লভ্য হবে।

শ্রেণিভিত্তিক প্রকল্প এবং কাজকর্মের পরিকল্পনা স্থানীয় পরিবেশের বিষয়টি ভাবনায় রেখে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরই করতে হবে, পাঠ্যপুস্তকগুলিতে প্রকল্প ও কাজকর্মের কিছু নমুনা প্রদত্ত হতে পারে। এই প্রসঙ্গে এখানে সাধারণভাবে কাজকর্ম বা প্রকল্পের বিষয় প্রস্তাবিত হল মূলত ঃ শিক্ষক -শিক্ষিকাদের চিন্তাভাবনার জন্য ঃ

- ✔ পরিবেশ সমীক্ষা (শিক্ষার স্তর অনুযায়ী নিকট পরিবেশ, গ্রাম/শহরের ওয়ার্ডের পরিবেশ, বৃহত্তর পরিবেশ - শিক্ষক-শিক্ষিকা ঠিক করবেন) জনসংখ্যার অবস্থা, মানুষের পেশা, জল সরবরাহ ব্যবস্থা, নিকাশী ব্যবস্থা, জঞ্জাল অপসারণ ব্যবস্থা, গাছপালা বাগবাগিচা বনভুমি এসবের অবস্থা, শিল্প কলকারখানা, যানবাহন ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ক।
- ✔ ছোটোখাটো কিছু পরীক্ষাদি ঃ জল আম্লিক না ক্ষারীয়, বায়ু আম্লিক কিনা, বায়ুতে দু-একটি দূষক গ্যাস (যেমন নাইট্রোজেন-ডাই - অক্সাইড, সালফার-ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি) আছে কি না এসব বিষয়ক পরীক্ষা, মাটি পরীক্ষা, শব্দ দূষণের মাত্রা পরীক্ষা (শ্রেণি অনুযায়ী ও লভ্য উপকরণ অনুযায়ী এসব পরীক্ষার কথা ভাবা যেতে পারে)।
- ✔ কিছু কর্মসূচি পালন ঃ বৃক্ষরোপণ ও সঠিক রক্ষণ, বাগান তৈরি, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ক প্রদর্শনীর আয়োজন, মডেল প্রদর্শনী ইত্যাদি।
- ✔ পর্যবেক্ষণ ঃ গোবর গ্যাস প্লান্ট, সৌরশক্তির প্রয়োগ, বনজঙ্গল, বন্যপ্রাণী-উদ্ভিদ, চাষের ক্ষেত, শিল্প কারখানা, তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র, জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইত্যাদি।
- ✔ দু-একটি পরিবেশগত অসুখের উৎস সন্ধান ইত্যাদি ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য বিদ্যালয়ের পরিবেশ, পরিস্থিতি, বাস্তব অবস্থা এসবের প্রেক্ষিতে এবং নির্দিষ্ট শ্রেণি ও শিক্ষার্থীদের মানসিক স্তরের বিষয়টি ভাবনায় রেখেই কাজকর্মের পরিকল্পনা করতে হবে-সব কাজই সব শ্রেণির শিক্ষার্থীদের দিয়ে সম্পাদনা করাতে হবে এমন সুপারিশ এখানে রাখা হচ্ছে না।

মূল্যায়ন ঃ

প্রারম্ভিক পর্যায়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে (অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত) পরিবেশ-শিক্ষার মূল্যায়ন অন্তর্মূল্যায়নেই সীমাবদ্ধ রাখা যেতে পারে। তবে পাঠ্য অংশের মূল্যায়নে (নম্বর সহ) পরোক্ষ গ্রেড পদ্ধতি (৫ বিন্দুমাত্রিক স্কেলে) এবং পরিবেশ-সম্পর্কিত প্রকল্প সহ কৃত্য (সম্পাদনীয় কাজকর্ম) অংশের ক্ষেত্রে (নম্বর প্রদান ব্যতীত) প্রত্যক্ষ গ্রেড পদ্ধতি (৪ বিন্দুমাত্রিক স্কেলে) অনুসৃত হতে পারে। এছাড়া সার্বিক নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন পদ্ধতি এই পর্যায়ে অবশ্যই কাম্য। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বহিপরীক্ষা রাখা হবে কি না সে বিষয়ে পর্ষদ্ / সংসদই সিদ্ধান্ত নেবেন। তবে বহিপরীক্ষা বা মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত হলে এ বিষয়টির বহির্মূল্যায়ন পাঠ্য অংশের ক্ষেত্রে পরোক্ষ গ্রেড পদ্ধতি অনুসরণ করে হতে পারে, আর পরিবেশ সম্পর্কিত করণীয় কাজকর্মের ক্ষেত্রে অন্তর্মূল্যায়ন হতে পারে ৩ বিন্দুমাত্রিক বা ৪ বিন্দুমাত্রিক প্রত্যক্ষ গ্রেড পদ্ধতি অনুসরণ করে। একসাথে মিলেমিশে কাজ করতে পারা, নেতৃত্ব দেবার সামর্থ্য, প্রকল্প রূপায়নে বা অন্যবিধ কাজকর্মে দক্ষতা প্রদর্শন, কাজকর্মের গুণগত মান, আচার আচরণ পরিবর্তন এসব নিয়মিতভাবে লক্ষ করে গ্রেড প্রদান করা যেতে পারে। তবে এসব বিষয়েই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন পর্ষদ্ (বা সংসদ), পারস্পরিক আলোচনার জন্যই এখানে বিষয়টি উপস্থাপিত হল।

শিক্ষায় মূল্যবোধ, মূল্যবোধের শিক্ষা

সমাজ ও সমাজবোধ ঃ পরিবেশের বাধা-বিঘ্ন ও প্রতিকুলতার মুখোমুখী হয়ে এককভাবে বেঁচে থাকা যে সম্ভব নয় এটা আদিম যুগেই মানুষের উপলব্ধিতে এসেছিল। বংশানুক্রমে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মানুষে-মানুষে সহযোগিতা অপরিহার্য। তাই তাগিদ জেগেছিল যৌথ জীবনযাপনের, যার প্রথম ধাপ পরিবার। তারপরে পরিস্থিতি ঘাত-প্রতিঘাতে সৃষ্টি হল নানা স্বার্থের ও চরিত্রের গোষ্ঠীসমুহ। জাতি, ধর্ম, বৃত্তি ইত্যাদির ভিত্তিতে পরিচিত হ'ল খণ্ড-সমাজ-বাঙালী সমাজ, বৌধ সমাজ, শিক্ষক সমাজ এবং আরো অনেক। এই অংশ সমুহের সামগ্রিক রূপ মহান মানবসমাজ। পরিবার থেকে শুরু করে বিশ্ব মানবসমাজ গড়ে তোলার এই যে সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া তার মূল তাগিদ ছিল পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সর্বজনীন উন্নয়ন, সমষ্টিগত অগ্রগতি। এই লক্ষ্যে পৃথিবীর নানা প্রান্তে অগণিত মানুষের চিন্তা ও সৃজনশীল শ্রমের ফলেই আমরা মানবসভ্যতার অংশ, সেই গৌববের অংশীদার। আমরা বিশ্বনাগরিক।

পারিবারিক বন্ধন নির্ভর করে একের প্রতি অন্য সদস্যের মনোভাব ও অনুভুতির ওপর। পিতা-মাতা ও সন্তানদের নিয়ে গঠিত যে-কোনও পরিবারের সুস্থ লক্ষ্য থাকে, যেন সব সদস্য যথাসম্ভব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে স্বমর্যাদায় জীবনযাপন করতে পারে এবং সম্ভাব্য সমৃদ্ধির পথে এগোতে পারে। এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে সমষ্টির স্বার্থকে ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধে স্থান দিতে হয়। দুর্বলকে রক্ষা করার জন্য সক্ষমতরকে কিছু স্বার্থত্যাগ করতে হয়। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে স্নেহপ্রীতি-শ্রদ্ধার যে সম্পর্ক তা এই একাত্ম হবার উদার মানসিকতা গড়ে তোলে। এই পবিত্র আবেগসমূহই সুস্থ পরিবারের ভিত্তি। একাধিক প্রজন্ম এবং বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার সমন্বয়ে যৌথ পরিবারের চিত্র আমাদেরই অনেকেরই পরিচিত। সেখানে আরও অনেকের চাহিদা, সুবিধে-অসুবিধের দিকে দৃষ্টি রেখে পরিবারের স্বাভাবিক পরিবেশ সুনিশ্চিত করতে হয়। প্রয়োজন হয় সহনশীলতা, মানিয়ে চলার মনোভাব, ব্যক্তির কিছু স্বার্থকে পেছনের সারিতে রাখা। এই পরিমণ্ডলে জন্ম নিতে পারে মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা, সমবেত-ভাবে বেঁচে থাকার উপযোগিতা সম্পর্কে গভীর বিশ্বাস। এই মনোভাব প্রসারিত হতে পারে প্রতিবেশীদের দিকে। তখন গড়ে ওঠে গ্রামের বা পাড়ার সংহতি। মূর্ত হয়ে ওঠে নিরুচ্চার প্রতিজ্ঞা-প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। জাতি, ভাষা, ধর্ম বা অন্যবিধ ভেদাভেদ অতিক্রম করে প্রতিষ্ঠিত হয় স্থায়ী অন্তরঙ্গ সম্পর্ক।

কিন্তু যা হওয়া কাম্য তা সবসময় হয় না, বা স্থায়ী হয় না, শোষণভিত্তিক সমাজের ছিদ্রপথে আসে বিভাজনের বিষ। লোভ, স্বার্থপরতা, অসহিষুতা, হিংসা প্রভৃতি মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে নেতিবাচক মাত্রা যোগ করে। স্নেহ ভালবাসা, আবেগ-অনুভূতি শুকিয়ে যায়। বিরোধ বাধে যৌথ পরিবারে। 'পরিবার' বা 'আপনজন'-এর সংজ্ঞা পাল্টে যায়। জীবনে প্রতিষ্ঠিত সন্তানের সঙ্গে বৃদ্ধ অশক্ত পিতামাতার যান্ত্রিক সম্পর্কের সুত্র ধরে জেগে ওঠে বৃদ্ধাবাসের সংস্কৃতি। জন্মসূত্রে স্বাভাবিক সম্পর্ককে ঘিরে এই মনোভাব বৃহত্তর সমাজে সম্প্রসারিত হতে থাকে। সব সম্পর্কই হয়ে ওঠে স্বার্থকেন্দ্রিক। সমাজের সংহতি দুর্বল হতে থাকে।

সমষ্টিগত জীবনযাপন সম্পর্কে ব্যক্তির বিশ্বাস ও আগ্রহই হচ্ছে সমাজবোধের মূল কথা। সেই বিশ্বাসের

অনুসারী আচরণে প্রতিফলিত হয় তার দায়বদ্ধতা। এই দায়বদ্ধতা যত গভীর ও ব্যাপক হবে, মানুষে-মানুষে সম্পর্ক তত নিবিড় হবে, সমাজ সংহত হবে, সমষ্টির এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তির ক্রমোন্নতি সহজ হবে। এই দায়বদ্ধতার একমাত্র উৎস মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা, সর্বজনের কল্যাণ সাধনের আগ্রহ। সমাজে সক্ষম-দুর্বল, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত শিক্ষাহীন প্রভৃতি নানা অবস্থার মানুষ আছে। সমাজ ব্যবস্থাই যুগে যুগে এ বিভাজন সৃষ্টি করেছে, তাকে টিকিয়ে রেখেছে, বাড়িয়ে তুলেছে। 'আমি' এই সমাজের অংশ। 'আমার' চেয়ে বিত্তবান, সুযোগপ্রাপ্ত মানুষ কিছু আছে। কিন্তু তারচেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায় আছে দীন-দরিদ্র, বঞ্চিত, অসহায় মানুষ। 'আমাদের' আচরণ যদি সমস্যার মূলোৎপাটন করে সকলের স্বার্থ রক্ষার দিকে চালিত হয়, সমাজ উন্নত হবে, তার সুষম অগ্রগতি হবে। আখেরে সেটা 'আমার' স্বার্থকেও সুরক্ষিত করবে। এই চেতনাই সমাজকে ধরে রাখার মূলমন্ত্র।

কিন্তু মুনাফা-তাড়িত বাজার-চালিত আর্থব্যবস্থা মানুষের এই সুস্থ সমাজ-চেতনাকে বিধ্বস্ত করছে। বিশ্বায়নের প্রভাবে মানুষের মধ্যে যে সাধারণ প্রবণতা ছড়িয়ে পড়ছে তার সার কথা হল আত্মকেন্দ্রিক ভোগলিপ্সা। নিত্যনূতন পণ্য ও পরিষেবার বাজার সৃষ্টি করার জন্য পুঁজিপতিরা নিরলস চেষ্টা চালাচ্ছে। বর্নাঢ্য মোহময় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ভোগবিলাসের বাঁতা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে শহর-গ্রামের মানুষের কাছে। জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখায় (২০০০ সালের নভেম্বর) ৩৯ পৃষ্ঠায় 'শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য' অংশে এন. সি. আর. টি. বলেছে " It (education) must also lead to a non-violent and non-exploitative social system.", বণিককূলের এই মায়াজালে মানুষ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। তাদের তুলে ধরা স্বপ্নের জীবনমানকে স্পর্শ করার ঐকান্তিক আগ্রহে অন্যসব বিবেচনা মন থেকে সরে যাচ্ছে। আরো সম্ভোগ, আরো সম্পদ, আরো অনেক বিলাসিতা - একেই মনে হচ্ছে জীবনের চরম সার্থকতা। ভাগীদারের সংখ্যা কমাবার জন্য পরিবার-পরিজনের পরিধি সঙ্কীর্ণ করে শুধুই নিজের অলীক স্বপ্ন সার্থক করার চেষ্টায় মানুষ নিমগ্ন থাকছে। চটকদার বিজ্ঞাপনের একটি পরিচিত সুর-'পড়শির ঈর্শা, আপনার গর্ব । [Neighbour's envy, Your Pride]. হ্যাঁ, এই মনোভাবটাই জাগিয়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কে থাকবে না প্রীতি, আনন্দ বা সহমর্মিতার ছোঁয়া। থাকবে শুধু সম্পদ দেখিয়ে তার ঈর্ষা জাগানোর তৃপ্তি, আর তার সুখ দেখলে ঈর্ষায় দগ্ধ হবার যন্ত্রণা।

পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অনিবার্য পরিণামেই বিরাট সংখ্যক মানুষের অতি সাধারণ মান-প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতিকে সমাজের সার্বিক কল্যাণের পরিবর্তে মুনাফার লক্ষ্যে নিয়োজিত করার ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় মানুষের ভূমিকা কমে যাচ্ছে। 'কর্মসংস্থানহীন বিকাশ'-এর পরিস্থিতি সাধারণ মানুষের স্বপ্নকে চুরমার করে দিচ্ছে। ক্রমবর্ধমান কামনা-বাসনার সঙ্গে ক্রমহ্রাসমান সুযোগের দ্বন্দ্বে সবাই ইঁদুর দৌড়ে প্রতিদ্বন্দ্বী। জীবন সংগ্রামে সকলেই পরস্পরের প্রতিপক্ষ, কেউ সহযোগী মিত্র নয়। আবেগ-অনুভূতিহীন, আত্মকেন্দ্রিক সমাজবিমুখতার এই ব্যাধি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংক্রামিত হচ্ছে শিশু-কিশোরদের মধ্যে। তাদের মনে সঞ্চারিত হচ্ছে এই বিশ্বাস যে সহপাঠীরা সকলেই প্রতিপক্ষ, সবাইকে হারিয়ে প্রথম হতে হবে। তাই কারোকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করাটা বোকামী। এভাবে শুধু এই প্রজন্ম নয়, আগামীদিনের নাগরিকদেরও সমাজবোধ বা সামাজিক দায়বদ্ধতার উৎসমুখ রুদ্ধ করে দেওয়া হচ্ছে।

একথা স্বীকার্য যে এই সর্বনেশে ঝোঁক সমাজের সংখ্যালঘিষ্ঠ একটি মহলেই প্রকট হয়ে উঠেছে। তবে

তারাই সমাজের কিছু কিছু বিষয়ে নিয়ন্ত্রক ভূমিকা পালন করছে। তারসঙ্গে রয়েছে পুঁজিপতিদের পরিকল্পিত অনলস প্রচার অভিযান। গ্রামের সাধারণ মানুষকে ডাব-খাওয়া ভুলিয়ে দিয়ে বোতল-কোলা ধরানোর কাজ অনেকটাই সফল হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র বর্ণিত হাসিম সেখ, রামা কৈবর্তের বংসধরেরাও এই বৃত্তে প্রবেশ করতে উন্মুখ হচ্ছে। ধীর বিষক্রিয়ায় তাদের মধ্যেও সোনালী স্বপ্ন পৌঁছে যাচ্ছে। প্রত্যাশিতভাবেই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পরিণাম হচ্ছে স্বপ্নভগ্নজাত হতাশা আর হীনম্মন্যতা। এরই দৃশ্যমান উপসর্গ- সকলের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া লুকিয়ে রাখা, আর অভিশপ্তের মত বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করা। সমাজ সম্পর্কে এক বিচিত্র অনীহা এদের গ্রাস করে নেয়।

২। **সমাজবোধ ও নৈতিকতা ঃ** মানুষের সমাজবোধই নৈতিকতার তথা সামাজিক মূল্যবোধের উৎস। সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থকে দূরে সরিয়ে মানুষ যদি সবল-দুর্বল সকলের অগ্রগতি সুনিশ্চিত করার তাগিদ অনুভব করে তবে একটি সংবেদনশীল সংহত সমাজ গঠনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। সামাজিক জীব হিসেবে কোনো মনোভাব ও আচরণ সমষ্টির স্বার্থের অনুকুল সেই উপলব্ধিকেই বলা যায় মুল্যবোধ-মুল্যবান আচরণ সংক্রান্ত বোধ। একটি বিশেষ সমাজের কাঠামো মানুষে মানুষে সম্পর্কের প্রেক্ষাপট রচনা করে। এর ভিত্তিতে সেই সমাজের প্রাসঙ্গিক মূল্যবোধগুলি জন্ম নেয়। ব্যক্তি যদি নিজের স্বার্থ নিয়েই মগ্ন থাকে তাহলে সমষ্টির স্বার্থ লঙ্ঘিত হবে ; তাই নিঃস্বার্থপরতা একটি মূল্যবোধ। সবাই যদি সৎ থাকে তাহলে কারো ন্যায্য স্বার্থ ক্ষুন্ন হবে না ; তাই সততা একটি মূল্যবোধ। সমাজের একাংশ যদি নিজেরা পরিশ্রম না করে অন্যের শ্রমের ফল আত্মসাৎ ক'রে জীবনধারণ করতে চায় তবে শ্রমকারী মানুষের স্বার্থ ব্যাহত হবে ; তাই শ্রমের মর্যাদা একটি মূল্যবান বিশ্বাস। কেবল পুরুষের স্বার্থকে প্রধান্য দিয়ে নারীজাতিকে অবহেলা করলে সমাজের একাংশের প্রতি অবিচারই শুধু করা হয় না, সমাজের সুষম বিকাশও অসম্ভব হয়ে পড়ে। লিঙ্গাসমতা, অতএব অন্যতম মূল্যবোধ। এইভাবেই সহিষ্ণুতা, সমানাধিকার, যুক্তিবাদিতা, অহিংসা প্রভৃতি প্রচলিত মুল্যবোধগুলির সঙ্গে আমরা পরিচিত। এই বাঞ্চিত আচরণ সম্পর্কে কিছু সাধারণ নীতি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যেগুলিকে মেনে চলাই নৈতিকতা মুল্যবোধ আর নৈতিকতা অনেকক্ষেত্রে সমর্থক শব্দ হিসাবে প্রযুক্ত হয়। ব্যক্তির নৈতিক মান-এর পরীক্ষা হয় যখন তার নিজের স্বার্থের সঙ্গে সমষ্টির স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

সভ্যতার সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের সমাজব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়েছে। এক একটি ব্যবস্থায় মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কেরও রূপান্তর ঘটেছে। সেই সঙ্গে বিবর্তিত হয়েছে মূল্যবোধের চরিত্র। দাস সমাজের মূল্যবোধের সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ মেলে না। পুঁজিবাদী সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় বুর্জোয়া মূল্যবোধ। সমাজতান্ত্রিক সমাজে নৈতিকতা অন্য চেহারা নেয়। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে এই নৈতিকতা ও আচরণবিধি মূলত শোষক শ্রেণির স্বার্থকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা ধর্মীয় অনুশাসন এবং রাষ্ট্রীয় আইনকানুন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। শোষণভিত্তিক কোনো সমাজ যখন অনিবার্য সঙ্কটের দিকে যায়, বৈষম্য-বঞ্চনা তীব্র আকার নেয়, তখন দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের ভেতর দিয়ে নতুন চিন্তা-চেতনা-দর্শন বিকশিত হয়। গড়ে ওঠে নবতর নৈতিকতার ভিত্তি।

চলমান সমাজে একই সময়ে একাধিক মূল্যবোধের দ্বান্দ্বিক অবস্থানও বিরল নয়। শিক্ষার আলো ও অন্যবিধ উদ্ঘাটনের ফলে প্রচলিত প্রথাকে ভেঙে ফেলার মানসিকতা প্রস্তুত হয়। এই প্রবণতা অনেক ক্ষেত্রেই

প্রগতির সূচক, কখনো হয়ত কায়েমী স্বার্থের চাপে প্রতিক্রিয়াশীল। বিয়ের সময় পাত্রপক্ষ পণের জন্য কন্যার পিতাকে হয়রান করবেন এটা প্রতিষ্ঠিত রীতি ছিল, এখনও তা ইতিহাস হয়ে যায় নি। এইরকম একটি সমাজে উন্নত চেতনাশীল কোনো পাত্র যদি বাবার নির্দেশ অগ্রাহ্য করে পণের হিসাব অস্বীকার করে বিয়ে করার স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশ করে, যুগের বিচারে সেই আচরণই অনৈতিক বলে গণ্য হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহুপঠিত 'দেনাপাওনা' গল্পে এর একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। ছেলের বাবা ঘোষণা করে দিলেন, বরপণের পুরো টাকা হাতে না পেলে বর সভাস্থ করা যাবে না। ছেলে হঠাৎ বাবার অবাধ্য হয়ে বলে বসল, "কেনা-বেচা-দরদামের কথা আমি বুঝি না, বিবাহ করিতে অসিয়াছি বিবাহ করিয়া যাইব।" মর্মাহত পিতার আক্ষেপ শুনে প্রবীন লোকেরা বললেন, "শাস্ত্র শিক্ষার নীতিশিক্ষা একেবারেই নাই, কাজেই।"

উচ্চমান-এর মানবিক মূল্যবোধ সুস্থ সমাজ গঠনের অন্যতম প্রধান উপাদান। এই উপাদানের উৎপত্তিও হয় সমাজ থেকেই। তাই সমাজ যখন ভাঙে, মূল্যবোধের উৎস শুকিয়ে যায় ; একইসঙ্গে মূল্যবোধের অবক্ষয় সমাজকে দূর্বলতর করে। ক্রিয়াশীল হয় অবক্ষয়ের এক দুষ্টচক্র। এই আলোচনার প্রথমাংশে দেখাবার চেষ্টা হয়েছে যে, বিশ্বায়নের আঘাতে মানুষের সমাজমনস্কতা হারিয়ে যাচ্ছে, বিধস্ত হচ্ছে মূল্যবোধের ভীত। পৃথিবীর সব দেশেই মানুষের নৈতিকতার অধঃপতন নজিরবিহীন মাত্রা নিচ্ছে। এর অনেক নিদর্শনই আমাদের গোচরে আছে। অবক্ষয়ের দুষ্টচক্র অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। একে সুস্থচক্রে রূপান্তরিত করতে হলে কোনো এক জায়গায় ভেঙে বেরোতে হবে। সেটাই সমাজ বদলের প্রক্রিয়া। শোষণহীন সমাজ ছাড়া এই ক্রমপ্রসারমান ব্যাধির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব নয় - একথা সম্প্রতি অনেক মহল থেকেই উচ্চারিত হচ্ছে।

৩। **নৈতিকতা ও শিক্ষা ঃ** সুস্থ সমাজের উপযুক্ত মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিক তৈরি করা শিক্ষা ব্যবস্থা স্বীকৃত লক্ষ্য। সুতরাং মূল্যবোধের এই গভীর সঙ্কটের জন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে দায়ী করা হয়। বলা হয় শিক্ষা তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। সেই সঙ্গে আশা করা হয় শিক্ষাব্যবস্থাই এই অধোগতি রোধ করে সমাজের বুকে নির্মল নৈতিকতার বাঞ্ছিত বাতাবরন ফিরিয়ে আনবে। এই প্রত্যাশা উচ্চারিত হয়েছে ১৯৯৮ সালের অক্টোবর মাসে ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শিক্ষা মহাসম্মেলনের মঞ্চ থেকে। এই কর্তব্য লিপিবন্ধ হয়েছে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (এন সি ই আর টি) কর্তৃক ২০০০ সালে প্রকাশিত জাতীয় বিদ্যালয় পাঠক্রম সংক্রান্ত সুপারিশে।

চেতনা ও মূল্যবোধে উদ্বুন্ধ মানুষ গড়ে তোলা যে শিক্ষার লক্ষ্য তা সর্বজনস্বীকৃত এবং বিতর্কাতীত। প্রথম দশ বছরের বিদ্যালয় শিক্ষার সাধারণ পাঠক্রমে সমাজে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রগুলোতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, বোধ, দক্ষতা প্রভৃতি অর্জনের পথে ছাত্র-ছাত্রীদের এগিয়ে দেবার পর্যাপ্ত উপাদান আছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক স্তরে যে পাঠক্রম চালু রয়েছে তার ভিত্তি অধ্যক্ষ হিমাংশু বিমল মজুমদারের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন। সেই মূল্যবান দলিলে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে "........শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজের উপযুক্ত সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধন, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তিশীল মনোভাব গঠনের এবং তদানুযায়ী নিজ জীবনচর্যায় অভ্যস্ত হওয়ার উপযুক্ত ভিত্তি স্থাপনই প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য। এই মূল লক্ষ্যের ভিত্তিতে আবার প্রাথমিক শিক্ষার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নির্ধারন করা হয়েছে যেগুলি তিনটি বিভাগে বিন্যস্তঃ (ক) জ্ঞানমূলক, (খ) দক্ষতা ও অভ্যাসমূলক এবং (গ) দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিকতা সংক্রান্ত। এই সাধারণ লক্ষ্য ও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহকে অনুসরণ করে পাঠ্যবিষয় সমূহ ও আনুষঙ্গিক

কর্মধারাকে সাজানো হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমের সাধারণ লক্ষ্য হিসাবেও বিবৃত হয়েছে 'ন্যায়ভিত্তিক সমাজের উপযুক্ত নাগরিক তৈরি করা, সৃজনশীল পূর্ণ মানুষ তৈরি করা পাঠ্যবিষয় সমূহের বিন্যাস লক্ষ্যানুসারী করা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ে পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত হয়েছে। সহ-পাঠক্রম কার্যক্রমও যথোচিত গুরুত্ব পেয়েছে। এই পরিকল্পিত পঠন-পাঠন ও কার্যধারা যদি সুচারু ও সম্পূর্ণরূপে অনুসৃত হয়, তবে মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিদ্যালয় শিক্ষার প্রচেষ্টা সম্পন্ন হবে। নীতিশিক্ষার জন্য কোনো স্বতন্ত্র বিষয় প্রবর্তনের প্রয়োজন নেই। বিদ্যালয়ের যাবতীয় কার্যকলাপ-শ্রেণিকক্ষে পঠন-পাঠনই হ'ক বা মাঠে খেলাধুলা চর্চা, সাংস্কৃতিক অনুশীলন, কিংবা বিতর্ক প্রতিযোগিতাই হ'ক-সব কিছুই মূল্যবোধ সঞ্চারের উপায়। পাঁচ থেকে পনেরো বছর বয়সকালই চরিত্রের মূলভিত্তি গড়ে দেবার উপযুক্ত সময়। কিন্তু এই অতীব দুরূহ দায়িত্বপালনে বিদ্যালয়ের প্রভাব নিরঙ্কুশ নয়। পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে, কমিটি-কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পাঠক্রম-পাঠ্যসূচিকে নতুনভাবে সাজিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাপ করা যা করতে চান সার্থকভাবে তার সবটুকু করে ওঠা তদের সাধ্যের বাইরে। অবক্ষয়ী সমাজে সামগ্রিক পরিবেশ মূল্যবোধ গড়ে তোলার আদৌ সহায়ক নয়। প্রতিকূল শক্তিগুলি ক্রমশ জোরদার হয়ে উঠছে, বিপরীত স্রোতকে রোধ করা যাচ্ছে না। বিদ্যালয়গুলি এই পরিস্থিতির বাইরে অবস্থান করে না। স্বভাবতই সমাজের যাবতীয় ত্রুটি-দুর্বলতা, গ্লানি ও কলুষ থেকে ঐ প্রতিষ্ঠানও মুক্ত নয়। অতএব বিদ্যালয়ের পক্ষে এত বাধা অতিক্রম করে নৈতিকতায় সমৃদ্ধ প্রজন্ম গড়ে তোলা প্রায় অসম্ভব কাজ। তবু আশা করা যায় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষকসমাজ এবং শিক্ষাব্যবস্থাপকরা পরিস্থিতির কাছে আত্মসমর্পণ করবেন না। সীমাবদ্ধ সুযোগের মধ্যে যতখানি সম্ভব আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন এবং তার মধ্যদিয়েই মৌলিক পরিবর্তনের পথ খুঁজে পাবেন।

এই প্রচেষ্টার অভিমুখ নির্ধারিত হবে পাঠ্যবিষয়ের কিছু লক্ষ্য সমূহের দ্বারা মাধ্যমিক স্তরের সব আবশ্যিক পাঠ্য বিষয়ের কিছু লক্ষ্য উল্লিখিত আছে। এর সবগুলিই দায়িত্বশীল নাগরিক গড়ে তোলার সাধারণ লক্ষ্যের অনুসারী; বিষয়-বিশেষজ্ঞতার ভিত্তি স্থাপনের জন্য নয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় আবশ্যিক গণিতের পাঠ সকল ছাত্র-ছাত্রীকে ঐ বিষয়ে পন্ডিত করে তোলার জন্য নির্দিষ্ট হয় নি ; দৈনন্দিন জীবনের গাণিতিক সমস্যার সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিসম্মত চিন্তার অভ্যাস, সিদ্ধান্ত নেবার উপযুক্ত সুশৃঙ্খল মানসিকতা ও বৃহত্তর ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা তৈরি করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। অনুরূপভাবে বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি সব বিষয়েই মূল্যবোধ সংক্রান্ত কিছু উপাদান আছে। তবে নিঃসন্দেহে এই সুযোগ সবচেয়ে বেশি আছে সাহিত্যপত্রে। একটি সার্থক গল্প, কোনো মর্মস্পর্শী নাটক বা মরমী কবিতার বার্তা তরুন মনে স্থায়ী ও গভীর ছাপ ফেলতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা' গল্পে নিরুপমার জীবনদীপ নিভে যাওয়া শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পে গফুরের শেষ প্রার্থনা, 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় জমিদারের অন্যায় লোভের ফলে অসহায় উপেনের ভিটেছাড়া হওয়া-এগুলি সামাজিক অবিচার সম্বন্ধে যে উপলব্ধি জাগিয়ে তোলে কোনো তাত্ত্বিক আলোচনা সেই ফল দিতে পারে না। সাহিত্যের সুপরিকল্পিত পঠন-পাঠন কিছু মানবিক অনুভূতি, কিছু সামাজিক দায়বদ্ধতা এনে দিতে পারে। শ্রেণিকক্ষে সব বিষয়ের উপস্থাপনে এবং সর্বস্তরের মূল্যায়নে মানসিকতা গড়ে তোলার লক্ষ্যকে প্রাধান্য দিতে হবে। আক্ষরিক অর্থে সিলেবাস শেষ করা বা পরীক্ষায় প্রচুর নম্বর জোগাড় করা শিক্ষায় সার্থকতার চিহ্ন নয়, যদিও বাজার-শাসিত সমাজের সেটাই চাহিদা।

শ্রেণীকক্ষের বাইরে সহ-পাঠক্রমিক কর্মধারাও তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রক্রিয়ায় কম

প্রয়োজনীয় নয়। মাঠে সমবেতভাবে খেলাধুলার চর্চা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পত্রিকার মাধ্যমে সাহিত্য চর্চা, বিতর্কের আসরে যুক্তিবিচার, বিবিধ চারুকলার অনুশীলন-প্রকৃতপক্ষে এগুলির কোনো বিকল্প নেই। মাঝে মাঝে শিক্ষামূলক ভ্রমণ এবং শিবির জীবনের আয়োজন করলে শিক্ষার্থীদের মানসিকতায় উল্লেখযোগ্য মাত্রা যোগ হয়। আজকের পটভূমিকায় দেলর কমিশনের যে সুপারিশটি সবচেয়ে বেশী প্রাসঙ্গিক তা হল যৌথভাবে বাঁচতে শেখা। (Learning to Live together)। সমবেত ভ্রমণ ও শিবিরের অভিজ্ঞতা মানুষ হয়ে ওঠার পথে এক অমূল্য পাথেয়। সার্বিক শিক্ষার আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল পাঠ্যসূচির বাহিরে স্বাধীনভাবে নানাবিধ বিষয়ের বই পড়া। সমাজকে চেনার জন্য, জীবনের সমস্যা, সম্ভাবনা, সম্পর্কের ঘাত-প্রতিঘাত প্রভৃতির স্বাদ পাবার জন্য, মানসিক পরিণমনের স্বার্থে সৎ সাহিত্যপাঠ একান্ত প্রয়োজন। আজকের দিনে পরীক্ষার তাড়নায় এবং আধুনিক বিনোদনের অমোঘ আকর্ষণে কিশোর-কিশোরীদের মুক্তপাঠের অভ্যাস লক্ষণীয়ভাবে কমে যাচ্ছে। পাঠ্যের বাইরের বই পড়ার মূল্য সম্পর্কে রবিন্দ্রনাথের উক্তি আমাদের চোখ খুলে দেয়। 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে এই প্রশ্নটিকে বিশ্লেষণ করে তিনি মন্তব্য করেছেন, 'অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীনপাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না ।"

বাস্তবে অবশ্য অনেক স্কুলের পক্ষেই মূলত সঙ্গতির অভাবে এই কর্মসূচি হাতে নেওয়া সম্ভব হয় না। স্কুলের এই সীমাবদ্ধতার কথা মুদলিয়র কমিশনও তাদের প্রতিবেদনে (১৯৫২) উল্লেখ করেছিলেন। এই অভাব মেটাবার উদ্দেশ্যে কমিশন স্কুলের সঙ্গে সামাজিক সংগঠনের সংযুক্তি ঘটানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমাদের রাজ্যে শিশু-কিশোরদের সার্বিক কল্যাণসাধনে ব্রতী বেশ কয়েকটি ঐতিহ্যসম্পন্ন নির্ভরযোগ্য সংগঠন আছে। সারা বছর শরীরচর্চা, সাহিত্য চর্চা, বই পড়া, সাধারণ জ্ঞান, পরিবেশ ও বিজ্ঞান চেতনার উন্মেষ, নাচ-গান - অভিনয় প্রভৃতি নিয়মিত কার্যধারার মধ্যদিয়ে এই স্বেচ্ছাসেবামূলক সংস্থাগুলি আগামী প্রজন্মকে সুনাগরিক করে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে। ব্রতচারীর 'পণ-মানা' ; সব পেয়েছির আসর-এর 'সঙ্কল্প বাক্য', 'স্কাউটকাব' - এদের অঙ্গীকারসমূহ অনুধাবন করলে শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে এদের লক্ষ্যের অভিন্নতা স্পষ্ট বোঝা যায়। এদের আয়োজিত শিবিরে দেশের বিভিন্ন অংশের ছেলেমেয়েরা কঠোর শৃঙ্খলা এবং গভীর আনন্দের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেয়। কোনো কোনো সংগঠনের শিবিরে অন্য রাষ্ট্র থেকেও ছেলেমেয়েরা অংশগ্রহণ করতে আসে। এই অভিজ্ঞতা তাদের অন্তরকে নাড়া দেয়, সংবেদনশীল করে তোলে। যৌথ জীবনযাপনের মন্ত্রে তারা উজ্জীবিত হয়। এই কর্মসূচি প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালয় শিক্ষার পরিপূরক আয়োজন বলে গণ্য হবার দাবী রাখে। এ ধরনের সংগঠনগুলিকে স্বীকৃতি দিয়ে যদি বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত করা যায় তাহলে একটি বড় অপূর্ণতা ঘোচানো যেতে পারে।

নৈতিকতা ও ধর্মশিক্ষা ঃ মূল্যবোধ সঞ্চারের বিবিধ উপায়ের মধ্যে ধর্মসংক্রান্ত শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব এনে এন. সি . ই .আর. টি. (নভেম্বর, ২০০০) দেশব্যাপী তীব্র বিতর্কের সম্মুখীন হয়েছিল। ধর্মনিরপেক্ষ দেশে রাষ্ট্র-পোষিত শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মশিক্ষার আয়োজন স্পষ্টতই অযৌক্তিক। আপাতত সে প্রশ্ন সরিয়ে রাখলেও জ্ঞানের জগৎ ও ধর্মের রাজ্যের মধ্যে মৌলিক বিরোধের সম্পর্কটা তো মনে রাখতেই হবে। জ্ঞান সতত অগ্রসারী। জগৎ, জীবন, সভ্যতা, সংস্কৃতির সঙ্গেই জ্ঞানের বিকাশ ঘটে, তার দিগন্ত প্রসারিত হতে থাকে। আজ যে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হল আগামীকাল থেকেই তা প্রশ্নের সামনে দাঁড়াবে। চলবে বিচার-বিশ্লেষণ, নিরন্তর গবেষণা। সৃষ্ট হবে নিত্য নুতন জ্ঞান-বিজ্ঞান যা মানুষের জীবনকে আরো এগিয়ে দেবে। কিন্তু ধর্মের রাজ্যে

প্রশ্নের দ্বার রুদ্ধ, যুক্তি বিচার নিষিদ্ধ। মানুষের বিবেচনা শক্তিকে বন্ধক দিতে হবে বিশ্বাসের পায়ে। নতুন পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করে কোনো নতুন পথের দিশা ধর্ম দেখাতে পারে না। সে স্থান নিশ্চল। তাই ইতিহাসে বারে বারে যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আর উদ্ভাবনের সঙ্গে ধর্মের বিরোধ বেধেছে। যুক্তিবাদীদের শাস্তি পেতে হয়েছে ধর্মশাস্ত্রের বিচারে। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে ধর্মশিক্ষার এই সম্পর্কের দিকে রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন নানাভাবে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে 'ধর্মশিক্ষা' প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, " ....একদিন যে-ধর্মসম্প্রদায় দেশের বিদ্যাকে পালন করিয়া আসিয়াছে পরে তাহারাই সে বিদ্যাকে বাধা দিবার সর্বপ্রধান হেতু হইয়া উঠিল। কারণ, বিদ্যা যতই বাড়িয়া উঠিতে থাকে ততই সে প্রচলিত ধর্মশাস্ত্রের সনাতন সীমাকে চারিদিকেই অতিক্রম করিতে উদ্যত হয়। শুধু যে বিশ্বতত্ত্ব ও ইতিহাস সম্বন্ধেই সে ধর্মশাস্ত্রের বেড়া ভাঙিতে বসে তাহা নহে, মানুষের চারিত্র নীতিগত নুতন উপলব্ধির সঙ্গেও প্রাচিন শাস্ত্রানুশাসনের আগাগোড়া মিল থাকে না।

এমন অবস্থায় হয় ধর্মশাস্ত্রকে নিজের ভ্রান্তি কবুল করিতে হয়, নয় বিদ্রোহী বিদ্যা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে ; উভয়ের এক অন্নে থাকা আর সম্ভবপর হয় না।" কিন্তু ধর্মশাস্ত্র কী তার নিজের ভুল স্বীকার করবে? পরের অনুচ্ছেদেই রবীন্দ্রনাথ তার উত্তর দিয়েছেন — " ধর্মশাস্ত্র যদি স্বীকার করে যে কোনো অংশে তাহার জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত, তবে তাহার প্রতিষ্ঠাই চলিয়া যায়। কারন, সে বিশুদ্ধ দৈববানী, এবং তাহার সমস্ত দলিল ও পরোয়ানার উপর স্বয়ং সর্বজ্ঞ দেবতার সীলমোহরের স্বাক্ষর আছে, এই বলিয়াই সে আপন শাসন পাকা করিয়া আসিয়াছে। বিদ্যা তখন বিশ্বেশ্বরের বিশ্ব শাস্ত্রকে সাক্ষী মানে, আর ধর্মসম্প্রদায় তাহাদের সনাতন ধর্মশাস্ত্রকে সাক্ষী খাড়া করিয়া তোলে — উভয়ের সাক্ষ্যে এমনি বিপরীত অমিল ঘটিতে থাকে যে, ধর্মশাস্ত্র ও বিশ্বশাস্ত্র যে একই দেবতার বানী এ কথা আর টেঁকে না এবং এ অবস্থায় ধর্মশিক্ষা ও বিদ্যাশিক্ষাকে জোর করিয়া মিলাইয়া রাখিতে গেলে হয় মূঢ়তাকে নয় কপটতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়।"

অবক্ষয়ের দুষ্টচক্র ভেঙে নতুন সমাজ, নতুন জীবনবোধ জেগে উঠুক আমাদের শিক্ষাজ্ঞানের ঐকান্তিক সাধনায়।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত নমুনা প্রশ্ন থেকে পুনর্মুদ্রিত করা হল ঃ

বাংলা ঃ প্রথম ভাষা

প্রথম পত্র

পূর্ণমান — ৯০

সময় ঃ তিনঘন্টা

১. যে-কোনো ৩টি প্রশ্নের উত্তর লেখো প্রতিটি উত্তর অনধিক তিনটি বাক্যে লিখতে হবে। ৩×২ = ৬

১.১ ‘ নিজ গৃহ তাত দেখাও তস্করে ’ — এই উক্তিটি সাধারণ অর্থ ও কবিতায় বর্ণিত বিশেষ অর্থ —এই দুয়ের কোথায় মিল সেটা দেখাও ।

১.২ ‘দুই বিঘা জমি ’ কবিতায় জন্মভূমির বর্ণনা আছে এমন দুটি চরণ উদ্ধৃত করো।

১.৩ ‘ছেলের দল’ কবিতায় কবি ছেলেদের অনেকগুলো গুণের পরিচয় দিয়েছেন। তার মধ্যে যে-কোনো তিনটির উল্লেখ করো ।

১.৪ ‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি’ কবিতায় উল্লিখিত ‘চাঁদ’ ও ‘চম্পা’-র পরিচয় দাও ।

১.৫ ‘উঠবি কি তুই পাষাণ ফুঁড়ে বনস্পতি মহিরুহ’ — ‘পাষাণ ফুঁড়ে বনস্পতি’ বাক্যাংশটি কবিতায় বর্ণিত অগ্রদূতদের সম্বন্ধে কীভাবে খাটে বুঝিয়ে দাও ।

১.৬ ‘রবীন্দ্রনাথের প্রতি’ কবিতায় উদ্ধৃত অন্য কবির কবিতার পঙ্‌ক্তিটি উদ্ধার করো

২. যে-কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রতিটি উত্তর কমবেশি ছয়টি বাক্যে লিখতে হবে ৪ × ৫ = ২০

২.১ ‘গুণবান্ যদি পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ’ — গুণবান পরজন ও গুণহীন স্বজনদের পরিচয় দাও । এখানে ‘তথাপি নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ’ কেন বলা হয়েছে বুঝিয়ে দাও । ২ + ৩

২.২ ‘আমি শুনে হাসি, আঁখি জলে ভাসি এই ছিল মোর ঘটে,
তুমি মহারাজ, সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে।’ ২ + ৩
— প্রসঙ্গ উল্লেখ করো । বক্তার এ কথা বলবার কারণ বুঝিয়ে দাও ?

২.৩ 'ও রূপ-মাধুরী পিরিতি-চাতুরী
তিল আধ পাসরিতে নারি ।

'ও রূপ-মাধুরী'র বৈশিষ্ট্য বোঝাতে গিয়ে কবি কীসের তুলনা করেছেন ? কবি যাঁর সম্পর্কে এ কথা বলেছেন তাঁর আর কোন্ মহিমা কবির চোখে ধরা পড়েছে ? ২ + ৩

২.৪ 'নিজকর্মদোষে, হায়, মজাইলা
এ কনকলঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি।'
— এই অংশটির অর্থ কী ? এখানে এই উক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে কেন বুঝিয়ে দাও । ২ + ৩

২.৫ 'এমনি করিয়া জানিনা কখন জীবনের সাথে মিশে'— 'এমনি করিয়া' বলতে কী বোঝায় ? কোন্ কোন্ কাজের মধ্য দিয়ে দাদি বক্তার জীবনের সাথে মিশে গিয়েছেন বুঝিয়ে দাও। ২ + ৩

২.৬ 'এসব নিশানা ধরেই
এখন ফিরছি আমি'— নিশানাগুলো উল্লেখ করো । বক্তা কোথায় ফিরছেন লেখো। ২ + ৩

২.৭ 'ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল'— 'ছিন্ন খঞ্জনার মতো' কেন বলা হয়েছে ? এই নাচের মধ্য দিয়ে কবি কীসের পরিচয় দিয়েছেন । ২ + ৩

৩. যে-কোনো ১টি প্রশ্নের উত্তর দাও। উত্তর কমবেশি পনেরোটি বাক্যে লিখতে হবে ১ × ১০ = ১০

৩.১ কোন্ সামাজিক পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের 'উজ্জ্বল উপস্থিতি' কবিকে উদ্বেলিত করছে —'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতা অবলম্বনে তা বুঝিয়ে দাও।

৩.২ 'মাটিরে আমি যে বড়ো ভালোবাসি মাটিতে মিশায়ে বুক,
আয় আয় দাদু, গলাগলি ধরি, কেঁদে যদি হয় সুখ।'
— 'কবর' কবিতা অবলম্বনে উদ্ধৃতাংশের তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।

৩.৩ 'উলঙ্গ রাজা' কবিতায় 'শিশু' ও অন্যান্যদের যে পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে সেটা বিশদভাবে বুঝিয়ে দাও।

৪. উৎস উল্লেখ করে যে-কোনো ২ টির টীকা লেখো। প্রতি উত্তর অনধিক চারটি বাক্যে লিখতে হবে। ২ × ২ = ৪

৪.১ নিছনি
৪.২ শান্তির নীড়
৪.৩ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার
৪.৪ কালাপাহাড়
৪.৫ হিবাচি
৪.৬ বেহুলা

৫. **যে-কোনো ১টি প্রশ্নের উত্তর দাও। কমবেশি পনেরোটি বাক্যে উত্তর লিখতে হবে।** ১×১০=১০

৫.১ 'সুখ যে দুখেরই ফুল' এই উক্তির সমর্থনে 'দুঃখের কবি' কবিতা থেকে মানবজীবনের তিনটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করো। 'দুঃখের কবি' কথাটিকে কবি 'সোনার পাথরবাটি' বলেছেন কেন ?

৫.২ 'ফ্যান' কবিতায় দুর্ভিক্ষের যে ছবি আছে তার বর্ণনা দাও। ক্ষুধাতুর মানুষকে 'অন্ন ছেঁকে' শুধু ফ্যানটুকু দেওয়ার কাজকে কবি পৈশাচিক ও নিষ্ঠুর মনে করেন কেন ?

৬. **নিম্নলিখিত যে-কোনো ১টি বিষয় সম্পর্কে কমবেশি পাঁচশো শব্দের মধ্যে একটি প্রবন্ধ লেখো ।** ২০

৬.১ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকা

৬.২ আধুনিক জীবনে বিজ্ঞান বনাম কুসংস্কার

৬.৩ গ্রন্থাগার

৬.৪ পাঠ সংকলন-এর যে-গদ্যরচনাটি তোমার সবচেয়ে ভালো লাগে

৭. **চলিত গদ্যে বঙ্গানুবাদ করো ।** ১০

Sister Nivedita, as Margaret Elizabeth Noble in earlier life, was born in Ireland in 1867. After finishing her education, she settled down in the teaching profession. During this period, she happened to meet Swami Vivekananda at a London home. Greatly attracted by his teachings, she accepted him as her Master and followed him to India for dedicating herself to the uplift of Indian women.

৮. **যে-কোনো ১টির উত্তর দাও ঃ** ৫

৮.১ ভাবার্থ লেখো (প্রদত্ত রচনার এক-তৃতীয়াংশ আয়তনের মধ্যে) :

আমার আনন্দে সকলের আনন্দ হউক, আমার শুভে সকলের শুভ হউক, আমি যাহা পাই তাহা পাঁচজনের সহিত মিলিত হইয়া উপভোগ করি — এই কল্যাণী ইচ্ছাই উৎসবের প্রাণ। অনেক ছোটোখাটো বিষয়েও আমি হয়তো একটুকু আনন্দ পাই, নিজের বাড়িখানি হইলে সুখী হই, পুষ্করিণীটি থাকিলে ভালো লাগে, গোরুগুলির কল্যাণ কামনা করি গৃহপ্রবেশ, জলাশয়-প্রতিষ্ঠা, গোষ্ঠাষ্টমী এইরূপ এক একটি উৎসব উপলক্ষ্যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ পন্ডিত, আত্মীয়স্বদন, পাড়াপ্রতিবেশী, পোষ্যপরিজন, দীনদুঃখীকে আহ্বান করিয়া যথাসাধ্য সৎকারে আমার সুখের ভাগী করিতে চাহি। আমি যে একজন গৃহহীনকে আশ্রয় দিতে পারি, তৃষ্ণার্তর পিপাসা নিবারণ করিতে পারি, অবোলা জীবদের কিছুমাত্র সুখ বিধান করিতে সমর্থ হই, আমার এ সৌভাগ্য যেন সকলের অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দিতে চাহে। সাবিত্রীব্রত, জামাইষষ্ঠী, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষ্যে আপন প্রিয়জন ও স্নেহাস্পদগণকে সৎকার করিয়া নিজেকে ধন্য মনে হয়; বিধাতা আমাকে যে এত সৌভাগ্যসুখ দিয়াছেন তাহা সকলের সহিত বন্টন করিয়া না লইলে ইহার সফলতা কোথায় ? উৎসব ইহারই উপলক্ষ্য। সেইজন্য আমাদের উৎসবে ভাবের প্রাধান্য — বাহিরের সমারোহ তাহার প্রধান অঙ্গ নহে।

৮.২ ভাবসম্প্রসারণ করো (কমবেশি দশটি বাক্যের মধ্যে) : ৫

ছোটো বালুকার কণা, বিন্দু বিন্দু জল
গড়ি তোলে মহাদেশ, সাগর অতল।

৯. **যে-কোনো ১টির উত্তর দাও (কমবেশি দশটি বাক্যে) ঃ** ৫

৯.১ সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করো :

তোমাদের এলাকায় অরণ্যসপ্তাহ পালন।

৯.২ তোমাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষক-দিবস উদ্‌যাপনের জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী-ছাত্রছাত্রী-শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে যে প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়েছে তার একটি সভার কার্যবিবরণী লেখো ।

বাংলা ঃ প্রথম ভাষা

দ্বিতীয় পত্র

সময় ঃ তিনঘন্টা
পূর্ণমান — ৯০

১. যে-কোনো ৩টি প্রশ্নের উত্তর লেখো (প্রতিটি উত্তর কমবেশি তিনটি বাক্যে) ৩×২ = ৬

১.১ ' সাগরসংগমে নবকুমার ' গল্পের নৌকাযাত্রীরা কী কারণে ভয় পেয়েছিল ? ২

১.২ নদীর জলকণা কীভাবে সমুদ্রে মহাদেশ তৈরি করে ? ' ভাগীরথীর উৎস ' সন্ধানে রচনা অনুসরণ করে লেখো। ২

১.৩ 'ঘর ও বাহির' রচনার লেখক শ্যামের আঁকা খড়ির গন্ডিটাকে নিতান্ত অবিশ্বাসীর মতো উড়িয়ে দিতে পারতেন না কেন ? ২

১.৪ " বলাই চমকে উঠল। " — চমকে ওঠার কারণ কী ? ২

১.৫ "কেউ বললেও বিশ্বাস করবে না হয়তো।"
— কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তিটি করা হয়েছে ? ২

১.৬ "এই নিষ্ঠুর অভিযোগে গফুরের যেন বাক্‌রোধ হইয়া গেল।" অভিযোগটি কী ? ২

২. যে-কোনো ৫টি প্রশ্নের উত্তর দাও। (প্রতিটি উত্তর কমবেশি ছয়টি বাক্যে) ৫×৫=২৫

২.১ সমীরুদ্দি বিদেশে থাকত কিন্তু নিজের জন্মভূমি গ্রামটিকে সে সব থেকে ভালোবাসত সমীরুদ্দি বিদেশে থাকত কেন ? কীসে তার জন্মভূমি গ্রামকে ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া যায় ? ২+৩

২.২ 'অ্যাঁয় যেমন কায়দা করি মাইরবার চায়, মুইও বুদ্ধিকরি বাঁইচবো।' — অ্যাঁয় কোন্ কায়দায় মারতে চায় ? বক্তা কী বুদ্ধি করে বাঁচতে চেয়েছে ? ২+৩

২.৩ 'পিতা ও কন্যার মাঝখানে এই যে একটুখানি ছলনার অভিনয় হইয়া গেল' — এখানে কোন্ ঘটনার ইঙ্গিত আছে ? এই ঘটনায় কন্যার স্বভাবের কী পরিচয় পাওয়া যায় ? ২+৩

২.৪ ' তখন সে নিতান্ত হতাশ হইয়া প্রস্থান করিল। ' এখানে 'তখন' বলতে কোন্ সময়ের কথা বলা হয়েছে ? হতাশ হবার কারণ লেখো। ২+৩

২.৫ 'অগ্নিদেবের শয্যা' আগ্নেয়গিরি অগ্নিলীলা সংক্ষেপে বর্ণনা করো। অগ্নিলীলা দেখে শংকর 'রুদ্রদেব'কে প্রণাম করেছিল কেন তা লেখো। ২+৩

২.৬ বনাঞ্চলের প্রয়োজন কী ? দেশে বনাঞ্চল কমে গেলে কী ধরনের দূষণ হতে পারে ? 'পরিবেশ দূষণ' রচনা অনুসারে তা লেখো। ২+৩

২.৭ 'বাড়ির ভিতরে আমাদের যে বাগান ছিল তাহাকে বাগান বলিলে অনেকটা বেশি বলা হয়।' ওই বাগান সম্পর্কে একথা বলার কারণ কী ?শরৎকালে লেখক ওই বাগানটিকে কীভাবে উপভোগ করতেন ?২+৩

৩. **কমবেশি পনেরোটি বাক্যে যে-কোনো ১টি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ** ১×১০=১০

৩.১ 'হারুণ সালেমের মাসি' গল্প অনুসরণ করে গৌরবির মাতৃরূপের পরিচয় দাও । ১০

৩.২ 'মহেশ' গল্পের কোন্ কোন্ ঘটনায় আমিনার সেবাগুণ, নম্রতা ও সহ্যশক্তি প্রকাশ পেয়েছে তার বিবরণ দাও । ১০

৩.৩ যে ব্যথাগুলি বলাইয়ের নিজস্ব, সেগুলি যে অন্যদের ব্যথা হয়ে উঠতে পারে না তার মূল কারণটি নির্দেশ করে বলাই চরিত্রের পরিচয় দাও । ১০

৪. **অনধিক চারটি বাক্যে টীকা লেখো (যে-কোনো ২ টি) ঃ** ২×২=৪

৪.১ বসুন্ধরা শীর্ষ বৈঠক

৪.২ ওলডোনিয়ো লেঙ্গাই

৪.৩ শিব ও রুদ্র ! রক্ষক ও সংহারক

৪.৪ এমাক্

৪.৫ দিলরুবা

৪.৬ ফ্যারেস্তা

৫. **কমবেশি পনেরোটি বাক্যে যে-কোনো ১ টি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ** ১০

৫.১ 'অসহযোগী' গল্পে হর্ষনাথের আশা ছিল রমেন মানুষ হবে, সূর্যপদও রমেনকে মানুষ করে দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন — রমেন কি দুজনেরই মনের মতো মানুষ হয়েছিল ? হর্ষনাথের অনুপস্থিতিতে তার আড়তে যা ঘটেছিল তাতে কাকে কেন অসহযোগী মনে হয় ? ৬+৪=১০

৫.২ সময়ের আগে সিটি দেওয়া, টাকা পেমেন্ট অতিসতর্কতা ও চিমনির ধোঁয়া দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলা — এই সব ঘটনার মধ্যে খাজাঞ্চিবাবুর চরিত্রের কী পরিচয় পাওয়া যায় ? কারখানার ব্যবস্থাপনায় নূতন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব লেখক কীভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ? ৫+৫=১০

৬. **নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও ঃ** ১০

৬.১ নীচে উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে যেসব সন্ধিবদ্ধ পদ আছে তাদের সন্ধিবিচ্ছেদ করো।(যে-কোনো ২ টি)ঃ ২×১=২

৬.১.১ তুমিও, হে রক্ষোমনি, সহিছ কেমনে ? (বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিৎ)

৬.১.২ তৃষাতুর শেষে পঁহুছিনু এসে আমার বাড়ির কাছে। (দুই বিঘা জমি)

৬.১.৩ ভগবানের আশীর্বাদে বইতে পারে সকল ভারে। (ছেলের দল)

৬.১.৪ যাহা জগদীশ্বরের হাত, তাহা পন্ডিতে বলিতে পারে না। (সাগরসংগমে নবকুমার)

৬.১.৫ উঠানের কোণে যে উচ্ছিষ্ট ভাত পড়িয়াছে তাহারই উপর কাকের দলের সভা বসিয়া গেছে। (ঘর ও বাহির)

৬.১.৬ অপস্বরের প্রাবল্যে যে উচ্চস্বরের সৃষ্টি হয় তা বিপজ্জনক ।(পরিবেশ দূষণ)

৬.২ নীচে উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে যেসব সমাসবদ্ধ পদ আছে তাদের ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম লেখো (যে-কোনো ২টি) ঃ ২×১=২

৬.২.১ গৌরাঙ্গের নিছনি লইয়া মরি ।(পতিত হেরিয়া কাঁদে)

৬.২.২ জনম তব কোন্ মহাকুলে ? (বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিৎ)

৬.২.৩ সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বথ বট দেখেছিল ।(বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি)

৬.২.৪ তিনি বয়স্যগণের সঙ্গাভ্রষ্ট হইলেন।(সভ্য ও অসভ্য)

৬.২.৫ মোল্লাজি আমাদের সবাইকে বড্ড প্যার করেন ।(নোনাজল)

৬.২.৬ ওরে আমার মা-সোয়াগি ছেলে ! (হারুন সালেমের মাসি)

৬.৩ নীচের চিহ্নিত পদগুলির মধ্যে যার ক্রিয়াপদের সঙ্গো সম্পর্ক আছে তার কারক এবং যার ক্রিয়া ছাড়া অন্য পদের সঙ্গো সম্পর্ক আছে সেটি সম্বন্ধ না সম্বোধন পদ তা নির্ণয় করে সংশ্লিষ্ট পদের বিভক্তি নির্দেশ করো। (যে-কোনো ২টি) ঃ ২×১=২

৬.৩.১ সচকিতে বীরবর দেখিলা সম্মুখে।(বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিৎ)

৬.৩.২ দুটি পাকা ফল লভিল ভূতল।(দুই বিঘা জমি)

৬.৩.৩ তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।(কবর)

৬.৩.৪ ওরে ও গফরা, বলি ঘরে আছিস ? (মহেশ)

৬.৩.৫ ভোর না হতে বাড়ি পৌঁছে যাবে।(নোনাজল)

৬.৩.৬ বাসের চাকরি খুইয়ে জামাই বহুদিন ঘরে বসা।(হারুন সালেমের মাসি)

৬.৪ নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো ।(যে-কোনো ৪টি) : ৪×১=৪

৬.৪.১ গৌরবির কথা শুনে ওর সর্বাঙ্গা জ্বলে গেল ।(হারুন সালেমের মাসি) [জটিল বাক্যে]

৬.৪.২ সংগীতের সুস্বর এই শ্রেণিতে পড়ে না।(পরিবেশ-দূষণ) [ইতিবাচক বাক্যে]

৬.৪.৩ লোকের ধান এখনও সব ঝাড়া হয়নি ।(মহেশ) [কর্তৃবাচ্য]

৬.৪.৪. সেটা যে কোথায় তাহা আজ পর্যন্ত বাহির করিতে পারি নাই।(ঘর ও বাহির) [ভাববাচ্য]

৬.৪.৫ সহসা বাতাস ফেলি গেল শ্বাস শাখা দুলাইয়া গাছে।(দুই বিঘা জমি) [লেখ্য গদ্যে]

৬.৪.৬ আজ্ঞা করো দাসে, শাস্তি নরাধমে।(বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিৎ) [লেখ্য গদ্যে]

৬.৪.৭ বাল্যকাল হইতেই নদীর সহিত আমার সখ্য জন্মিয়াছিল।(ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে) [চলিত গদ্যে]

৬.৪.৮ একদিন সকালে একমনে খবরের কাগজ পড়ছি, বলাই আমাকে ব্যস্ত করে ধরে নিয়ে গেল বাগানে ।(বলাই) [সাধু গদ্যে]

৭. নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও ঃ

১×৫=৫

৭.১ যে-কোনো একটির উত্তর দাও :

৭.১.১ 'স্বরভক্তি' শব্দটির অর্থ কী ? ব্যাকরণের কোন্ প্রসঙ্গে শব্দটি ব্যবহৃত হয় ? ওই প্রসঙ্গে 'স্বরভক্তি'র আর কোন্ প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয় ? দুটি উদাহরণ দিয়ে 'স্বরভক্তি'র বিষয়টি বুঝিয়ে দাও ।১+১+১+২

৭.১.২ 'সমাস' শব্দটির প্রকৃতি -প্রত্যয় নির্দেশ করো। ভাষার কোন্ প্রক্রিয়াকে ব্যাকরণে 'সমাস' বলা হয় ? দুটি সমাসের উদাহরণের সাহায্যে সমাসের কাজ বুঝিয়ে দাও। ১+১+৩

১×৪=৪

৭.২ যে-কোনো একটির উত্তর দাও :

৭.২.১ নীচের শব্দগুলিতে ধ্বনিপরিবর্তনের কোন্ কোন্ নিয়ম কাজ করেছে তা নির্ণয় করো। (৪টি) ঃ
সততা ; বিলেত ; মেয়ে ; আস্তাবল ; ডুমুর ; ভাশুর ।

৭.২.২ নীচের শব্দগুলির দল বিশ্লেষণ করে কোন্ শব্দে কয়টি দল আথে তা নির্দেশ করো (৪টি) :
বৃন্দাবন ; গোবিন্দদাস ; নির্মূল ; নির্মলা ; জল ; জলধর।

৭.২.৩ দুটি কৃৎ প্রত্যয় ও দুটি তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠনের উদাহরণ দাও ।

৭.২.৩ উৎসের দিক থেকে নীচের শব্দগুলি কোন্ কোন্ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত তা নির্ধারণ করো (৪টি) :
বালিকা ; তালিকা ; শুক্কুরবার ; আলতা ; বালতি ; মহামিছিল।

১×৪=৪

৭.৩ যে-কোনো একটির উত্তর দাও :

৭.৩.১ আলাদা আলাদা বাক্যে প্রয়োগ করে যে-কোনো ৪টির উদাহরণ দাও :
আত্মবাচক সর্বনাম ; সাপেক্ষ সর্বনাম ; সমষ্টিবাচক সর্বনাম ; পারস্পরিক সর্বনাম ; প্রশ্নবাচক সর্বনাম ; অনির্দেশক সর্বনাম।

৭.৩.২ নীচের চিহ্নিত পদগুলি কী কী ধরনের বিশেষণ তা নির্ণয় করো (৪টি) :

৭.৩.২.১ বইটির দাম ষাট টাকা ।

৭.৩.২.২ সে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী।

৭.৩.২.৩ আচ্ছা মুশকিলে পড়া গেল।

৭.৩.২.৪ এ কাজ সে ছাড়া আর কেউ করবে না।

৭.৩.২.৫ কত টাকা চাই ?

৭.৩.২.৬ টনটনে জ্ঞান।

৭.৩.৩ নীচের যে-কোনে ৪টি উপসর্গ যোগে চারটি শব্দ তৈরি করো এবং চারটি আলাদা বাক্যে তাদের প্রয়োগ দখাও :
পরা ; আ ; অনু ; বে ; কু ; রাম ; খোশ ; হা ।

৭.৪ যে-কোনো <u>একটির</u> উত্তর দাও : ১×৪=৪

৭.৪.১ উদাহরণ দাও (৪টি) :

মৌলিক ধাতু ; নাম ধাতু ; যুক্ত ধাতু ; যৌগিক ক্রিয়া ; অসম্পূর্ণ ক্রিয়া ; দ্বিকর্মক ক্রিয়া।

৭.৪.২ নীচের বাক্যগুলিতে যেসব ক্রিয়াপদ আছে সেগুলির 'প্রকার' নির্ণয় করো (৪টি) :

৭.৪.২.১ গল্পটা সবাই জানে।

৭.৪.২.২ ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়।

৭.৪.২.৩ পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার।

৭.৪.২.৪ ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।

৭.৪.২.৫ সন্ধ্যা হইলেই একাকী নদীতীরে আসিয়া বসিতাম।

৭.৪.২.৬ আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।

৭.৫ যে-কোনো <u>একটির</u> উত্তর দাও : ১×৪=৪

৭.৫.১ বাক্য প্রয়োগ করে উদাহরণ দাও (৪টি) :

বৈকল্পিক অব্যয় ; সাপেক্ষ অব্যয় ; সংকোচক অব্যয় ; আলংকারিক অব্যয় ; সম্বোধনসূচক যোজক ; সাপেক্ষ শব্দজোড়।

৭.৫.২ যেটি শুদ্ধ সেটি লেখো (৪টি) :

পৈত্রিক / পৈতৃক ; প্রাতঃরাশ / প্রাতরাশ ; সমৃদ্ধশালী / সমৃদ্ধিশালী ; গীতাঞ্জলি / গীতাঞ্জলী ; অপরাহ্ন / অপরাহ্ণ ; মুখস্ত / মুখস্থ।

৮. যে-কোনে ১টির উত্তর দাও ঃ ১×৪=৪

৮.১ নীচের উদ্ধৃতাংশে উপযুক্ত বিরামচিহ্ন বসাও :

প্রথমটায় তিনিও কিছু বলতে চাননি পরে সমীরুদ্দির চাপে পড়ে সেই ধানখেতের মধ্যিখানটায় তাকে খবরটা দিলেন তার ভাই সব টাকা ফুঁকে দিয়েছে গোড়ার দিকে শ্রীমঙ্গল কুলাউড়া মৌলবিবাজারে শেষের দিকে কলকাতায় আমি থাকতে না পেরে বললুম বল কী সারেং এরকম ঘা মানুষ কি সইতে পারে কিন্তু বলো দিকিন গাঁয়ের কেউ তাকে চিঠি লিখে খবরটা দিলে না কেন

৮.২ আলাদা আলাদা চারটি বাক্যে যে-কোনো চারটি বাগ্‌ধারার প্রয়োগ দেখাও :

আকাশ থেকে পড়া ; টনক নড়া ; গোড়ায় গলদ ; পাকাধানে মই দেওয়া ; তীর্থের কাক ; মিছরির ছুরি।

English

Time - 3 hours | Full Marks - 100

<u>Section A</u> - Reading - 20 marks (seen) + 20 marks (unseen)

<u>Section B</u> - Grammar & Vocabulary - 20 marks

<u>Section C</u> - Writing - 40 marks

Section A

READING COMPREHENSION (SEEN)

(Answer all the Questions)

1. <u>Read the following text and do the tasks that follow</u> :

   1. Next on the agenda was how to solve the water problem. There was only one tubewell in the area and endless fights over water. They asked the Corporation to give them another tubewell. They were advised that to get something from the Corporation it was not enough to write them a letter or a petition. They would have to keep pursuing it.

   2. So they bought the Diary of the Kolkata Municipal Corporation that gives one the relevant information about the various offices and departments of the Corporation. One can find out who is in charge of lights, water, sanitation, etc. and exactly where this office is. Once you identify the person, it is a matter of following it up. They visited the person in charge frequently until they had everything they wanted. Now they have two tubewells plus a Corporation tap. So their water problem is solved.

   3. The next target was street lights. Most of the street lights were faulty, stolen, or not working. After two and a half years of continuing effort similar to what was put in to solve the water problem, they now have decent lights in the area.

   4. Another big problem was mosquitoes. Once more they went to the Corporation. The Mosquito Control Department was most helpful. The officer in-charge explained to them the basics of mosquito control - the need to get rid of stagnant water, areas which encourage mosquito

breeding. Then he brought in his team. Every fortnight, faithfully, on Monday morning the Corporation sent its Mosquito Control Team and got to work.

5. The locality now has a triangular patch of green-that too was a community effort. The CMDA now KMDA had a storage space which was left very dirty when they finished their digging and redigging of roads. The society approached the contractor who gave them permission to use the surplus bricks. Words went round. Someone gave a bag of cement, another load of bricks. Someone lent a lorry and one Sunday, in a picnic spirit, everyone went off to a nearby park and loaded waste mud into the lorry. They also got some grass seed from the nearby maidan and before they knew it, the locality had a park. A small patch of green, no doubt, but still their own pleasant area in the grey desert around.

1. Read the passage and complete the following chart : 2x5=10

cause	effect/result
Local people pursued their demand for an extra tubewell.	
	The locality had decent lights in the area
There was stagnant water in the area.	
The CMDA (KMDA) finished digging and redigging of roads.	

2. Make a list of the good things that the locality achieved : 1x4=4

(i) ____________________

(ii) ____________________

(iii) ____________________

3 Rearrange the following statements in the order of happenings : 1x6=6

(Write 1, 2, 3, ... in the boxes on the right hand side)

(i) Digging and redigging of roads. ☐

(ii) Continued effort to have decent light. ☐

(iii) Request for a second tubewell. ☐

(iv) Help rendered by Mosquito Control Department. ☐

(v) Grass seed strewn on the waste mud which filled the pit ☐

(vi) Water problem felt by the inhabitants of the locality. ☐

READING COMPREHENSION (UNSEEN)

Read the following text and do the tasks that follow :

"I lay down on the grass, which was very short, where I slept sounder than ever I remember to have done in my life, and, as I reckoned, above nine hours : for when I awakened it was just daylight. I attempted to rise, but was not able to stir for as I happened to lie on my back, I found my arms and legs were strongly fastened on each side to the ground; my hair, which was long and thick, tied down in the same manner.

I like-wise felt several slender ligatures across my body, from my armpits to my thighs. I could only look upwards, the sun began to grow hot, and the light offended mine eyes. I heard a confused noise about me, but in the posture I lay, could see nothing except the sky. In a little time I felt something alive moving on my left leg, which advancing gently forward over my breast, came almost up to my chin; when bending my eyes downwards as much as I could, I perceived it to be a human creature not six inches high, with a bow and arrow in his hands, and a quiver at his back. In the meantime, I felt at least forty more of the same kind (as I conjectured) following the first. I was in the utmost astonishment, and roared so loud, that they all ran back in a fright; and some of them, as I was afterwards told, were hurt with the falls they got by leaping from my sides upon the ground."

[an extract from *Gulliver's Travels*

4. (a) Read the above extract of a story about Gulliver and put a a tick (✓) in the right box: 2

The extract is .... (i) a fictional autobiography.
(ii) a biography.
(iii) a fable.

(b) Give a supportive statement to justify your answer. 1

5. Three of the following statements are false. Put a cross (X) against each false statement in the box given. Then, rewrite them to make them true in the space provided. (3x l=3)+(3x2=6)=9

(a) The narrator had a disturbed sleep.
(b) He woke up early in the morning.
(c) He tried to get up but he could not.
(d) It was a very cold day.
(e) He could not see who was standing on him till he moved forward.
(f) Only one person was able to stand on him.
(g) He shouted and frightened them all.

1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________

6. Complete the following chart with information from the passage : 8

What?	Why?
(a) Gulliver could see nothing except the sky.	(a).____________
(b) He bent his eyes as much as he could.	(b).____________
(c) The tiny human creatures ran back in fright.	(c).____________
(d) The tiny creatures fell and were hurt.	(d).____________

Section B

(GRAMMAR & VOCABULARY)

7. (a) The following words occur in Reading Comprehension (unseen). Choose the appropriate meaning from the list given below and write them in the space given against each word. 4

(i) ligatures : ______________________

(ii) posture: ______________________

(iii) quiver : ______________________

(iv) conjectured: ______________________

[to tremble; formed an opinion or idea; things that are used for tying; the position in *which* a person holds his body.]

(b) Now find words in the same unseen text and fill in the blanks in the following sentences. 1x4=4

The first letter of each word is given :

(i) Children are r______ to be more vibrant-nowadays.

(ii) Maya could paint extremely well with her thin and s________ fingers.

(iii) They will be o____________ if you don't go to their wedding.

(iv) People are getting c_____ about buying goods after seeing the different advertisements.

8. (a) Complete the following chart with proper forms of the words given. (You need not fill in the crossed (x) boxes : 1x6=6

Noun	Verb	Adjective	Adverb
Celebration		x	x
	succeed		successfully
	localise		locally
Enthusiasm	enthuse	enthusiastic	

(b) Now, fill in the blanks with the proper form of the words from the above chart : 1 x6=6

We ______Rabindra Jayanti last year in a grand manner. We invited _______ talents for the purpose. All of them participated_______ grand________. All the people of the___________enjoyed the in the function. It was a of the birthday.

Section C

Writing

9. Write a paragraph on the life of Vidyadhar Suraj Prasad Naipal in about 150 words, using the following information : (5x2=10)+(2x2=4)=14

1. Place of birth : Chaguanas, Trinidad
2. Date of birth : 17 August, 1902
3. Father's name : Seeparsad Naipal
4. Education : (a) Graduated from Queen's Royal College (1951 A.D.) in Port of Spain.
   (b) Received scholarship to Oxford University.
5. Novels: *The Mystic Masseur;MignelStreet; A House forMr. Biswas; The Middle Passage;*
   India; A Wounded Civilisation; A Bend in the River; In a Free State; *Magic Seeds.*
6. Central theme in his works : Damaging effects of colonialism upon the people of the Third World.
7. Awards : The Booker Prize in 1971; - Knighted (1989); First David Cohen British Literature Prize - Nobel Prize (2001)

10 Write a newspaper report based on the following information in about 100 words : 14

(i) Reporting date and place : 22nd September 2005
(ii) Organizers : Armed Forces Institute of Management
(iii) Occasion : Convocation (MBA and MCA Course) for the year 2005
(iv) Achievement : Women win Gold Medals.
(v) Names of winners : Mona Saraf (MCA), Aruna Basak (MBA), Sandip Thakur (All round performer and faculty award)

[Point to note : Female candidates fare better than male ones.]

11. You have come to Kolkata to study. You want to stay as a paying guest. You see an advertisement in an English daily.

Write an application in response to the advertisement : 12

Wanted paying guest - Student preferable - Host lives in South Kolkata – Apply with family background and range of payment. Write to : Mr. Asit Banerjee, 23 Gariahat Road, Kolkata - 700 029

ভৌতবিজ্ঞান

সময় ঃ তিনঘন্টা

পূর্ণমান — ৯০

'ক' বিভাগের উত্তর দেওয়া **আবশ্যিক**। 'খ' বিভাগ থেকে **অন্তত দুটি** এবং 'গ' ও 'ঘ' বিভাগের প্রতিটি থেকে **অন্তত তিনটি** করে প্রশ্ন নিয়ে মোট **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।

'ক' বিভাগ

1. **যে-কোনো দশটি প্রশ্নের অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ।** **1x10**

(i) পরমাণুর গঠনে উপস্থিত নিস্তড়িৎ কণার নাম লেখো ।

(ii) চাঁদে কোনে বস্তুর ভর 10 কিলোগ্রাম হলে পৃথিবীতে তার ভর কত হবে ?

(iii) কোনে বস্তুকে তাড়াতাড়ি ঠান্ড করার জন্য $0°$ সেলসিয়াস তাপমাত্রার বরফ $30°C$ সেলসিয়াস তাপমাত্রার জলের মধ্যে কোনটি বেশি কার্যকরী ?

(iv) একই তাপমাত্রা ও চাপে v লিটার অক্সিজেন ও $\frac{v}{2}$ লিটার কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস সংগ্রহ করা হল। সংগৃহীত অক্সিজেন গ্যাসের ভর 32 গ্রাম হলে $\frac{v}{2}$ লিটার কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের অণুর সংখ্যা কত ? (0 = 16)

(v) 273 K তাপমাত্রার সেলসিয়াস স্কেলে মান কত ?

(vi) $1 \ ms^{-2}$ ত্বরণযুক্ত 1 kg ভরের গতিশীল কোনো বস্তুর ওপর ক্রিয়াশীল বলের পরিমাণ কত ?

(vii) কিলোওয়াট ঘন্টা দিয়ে কোন ভৌতরাশির পরিমাপ করা হয় ?

(viii) সাদা আলোর বিশুদ্ধ বর্ণালির প্রান্তিক বর্ণ দুটি কী কী ?

(ix) বিটা-কণা পরমাণুর কোন অংশ থেকে নির্গত হয় ?

(x) পরীক্ষাগারে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড প্রস্তুতির সমিত রাসায়নিক সমীকরণটি লেখো ?

(xi) 3টি কার্বন পরমাণুযুক্ত অ্যালকেনে হাইড্রোডেন পরমাণুর সংখ্যা কত ?

(xii) নাইট্রিক অ্যাসিডের বলয় পরীক্ষায় কী রঙের বলয় উৎপন্ন হয় ?

(xiii) স্বর্ণকারের কারখানায় যে বায়ুদূষক গ্যাস উৎপন্ন হয় তার মান লেখো।

'খ' বিভাগ

2. (a) ঘনত্বের সংজ্ঞা দাও। SI এককে 4^o সে তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ জলের ঘনত্ব কত ? ত্বরণের মাত্রা লেখো।

(b) ভর ও শক্তির রূপান্তরের সম্পর্কিত সমীকরণটি লেখো। এর পরিপ্রেক্ষিতে ভর ও শক্তির নিত্যতা সূত্রটি বিবৃত করো।

(c) প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপে 7 গ্রাম নাইট্রোজেন গ্যাসের আয়তন কত ? [N = 14] 3+3+2

3. (a) যান্ত্রিক শক্তি তড়িৎশক্তিতে ও তড়িৎশক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরের একটি করে উদাহরণ দাও। দুটি অপ্রচলিত শক্তির উৎসের উল্লেখ করো।

(b) একটি উদারহণ দিয়ে নিউক্লাইড কাকে বলে লেখো।

(c) 9.8 গ্রাম সালফিউরিক অ্যাসিডকে প্রশমিত করতে কত গ্রাম কস্টিক সোডার প্রয়োজন ? [H = 1, O=16, Na=23, S= 32] 4+2+2

4. (a) $^{39}_{19}K$ পরমাণুটির প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন সংখ্যা কত ? পরমাণুটির কোন কক্ষপথে কয়টি করে ইলেকট্রন আছে ?

(b) অক্সিজেনের পারমাণবিক ভর 15.9998 এর অর্থ কী ?

(c) চাপ ও অপদ্রব্যের উপর তরলের স্ফুটনাঙ্ক কীভাবে নির্ভর করে ? 4+2+2

5. (a) একটি আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে PV = KT সম্পর্কটি প্রতিষ্ঠিত করো। [K একটি ধ্রুবক P, V,T চিহ্নগুলি প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।]

(b) 27^oC তাপমাত্রায় ও 750 mmHg চাপে কোনও গ্যাসের আয়তন 1000 cm^3 । কোন তাপমাত্রায় 700 mmHg চাপে গ্যাসটির আয়তন 1400 cm^3 হবে।

(c) লীনতাপের সংজ্ঞা দাও। এস আই পদ্ধতিতে লীনতাপের একক কী ? 3+3+2

'গ' বিভাগ

6. (a) দ্রুতি সুষম হলে গতিবেগ কি অসম হতে পারে ? 2

(b) প্রাথমিক 20 m/s বেগে গতিশীল 500g ভরের কোনো বস্তুর গতির বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করার 5s পরে বস্তুটির গতিবেগ 10 m/s হয়। বস্তুটির ত্বরণ কত ? এক্ষেত্রে গতির বিরুদ্ধে প্রযুক্ত বল কত ? 2+2

(c) ভরবেগের মাত্রা লেখো। 2

7. (a) নিউটনের প্রথম গতিসূত্রটি বিবৃত করো। এর থেকে বলের সংজ্ঞা দাও। 2+2

(b) একটি ফাঁকা লরি ও অনুরূপ একটি বালি বোঝাই লরি একই বেগে যাচ্ছে। কোনটির গতিশক্তি বেশি ? গাণিতিক সম্পর্কটি লিখে ব্যাখ্যা করো।

(c) নততলে যতটা বলপ্রয়োগ করা হয় তা বাধার সমান, কম না বেশি ? চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো।

8. (a) আপেক্ষিক তাপের সংজ্ঞা দাও। CGS পদ্ধতিতে এর একক কী ? 100g জলের তাপমাত্রা 10K বৃদ্ধি করতে কত জুল তাপ লাগবে ? (জলের আপেক্ষিক তাপ 4200J/kg/K)। 2+2

(b) ক্যালোরিমিতির নীতিটি বিবৃত করো। 2

(c) কোনো একদিন তোমার দেহের তাপমাত্রা ছিল $104^{o}F$ কেলভিন স্কেলে এই পাঠ কত ? 2

9. (a) কোনো আলোকরশ্মি একটি সমতল দর্পণের সঙ্গে 30^{o} কোণে আপতিত হলে প্রতিফলন কোণ কত হবে ? চিত্রসহ উত্তর দাও।

(b) অসদ্ প্রতিবিম্বের সংজ্ঞা দাও। সমতল দর্পণ কতৃর্ক গঠিত প্রতিবিম্বের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো। 2+2

(c) কোনো লেন্স উত্তল না অবতল কীভাবে সহজে চিনবে ? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। 2

10. (a) সুরযুক্ত ও সুরবর্জিত শব্দের মধ্যে দুটি পার্থক্যের উল্লেখ করো। 2

(b) শব্দের তীব্রতার কোন্ উর্ধ্বসীমা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর নয় ? শব্দদূষণের দুটি ক্ষতিকর প্রভাব লেখো। 1+2

(c) ডায়োড ভাল্‌ভে ক্যাথোড ও অ্যানোড হিসেবে কী কী ব্যবহার করা হয় ? ডায়োড ভাল্‌ভের একটি ব্যবহারের উল্লেখ করো । 1+2

11. (a) তড়িতের বিভবপ্রভেদ ও প্রবাহমাত্রার একক লেখো। উপযুক্ত শর্ত উল্লেখ করে এদের মধ্যে সম্পর্কটি বিবৃত করো। 1+1+2

(b) ভোল্টামিটারের সাহায্যে কীভাবে বিভবপ্রভেদ মাপা হয় একটি তড়িৎবর্তনীর চিত্রসহ দেখাও। 2

(c) বাড়িতে তড়িৎযন্ত্রগুলি সরবরাহ লাইনের সঙ্গে সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত থাকার সুবিধা কী ? 2

'ঘ' বিভাগ

12. (a) অনুঘটকের সংজ্ঞা দাও। একটি উদাহরণ দিয়ে দেখাও যে অনুঘটক কোনো শ্লথ বিক্রিয়ার গতিবেগ বৃদ্ধি করতে পারে।

(b) (i) ইউরিয়া একটি সাদা রঙের কেলাসীয় কঠিন, জলে দ্রাব্য এবং এর গলনাঙ্ক $132^{o}C$।

(ii) মিথানল একটি বর্ণহীন, উদ্বায়ী তরল পদার্থ ; জলের সঙ্গে যে-কোনো অনুপাতে মিশে যায় এবং সাধারণ বায়ুমন্ডলীয় চাপে এর স্ফুটনাঙ্ক $64^{o}C$।

উপরোক্ত ভৌতধর্মগুলির মধ্যে কোন ভৌতধর্ম ব্যবহার করে (i) ইউরিয়া ও (ii) মিথানলকে শনাক্ত করা যায় ?

(c) একটি কালো কালির নমুনা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন রঙিন পদার্থ দিয়ে তৈরি। পেপার ক্রোম্যাটোগ্রাফির সাহায্যে কীভাবে দেখাবে কালো রঙের কালির নমুনাটিতে তিনটি বিভিন্ন রঙিন পদার্থ আছে?

(2+2)+ (1+2)+2

13. (a) অক্সিজেন পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাসে K কক্ষে 2টি ও L কক্ষে 6টি ইলেকট্রন আছে এবং হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাসে K কক্ষে 1টি ইলেকট্রন আছে। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় জল উৎপন্ন হয়। ইলেকট্রন ডট গঠনের সাহায্যে দেখাও জলে তড়িৎযোজী না সমযোজী বন্ধন গঠিত হয়। যে প্রকৃতির বন্ধন জলে গঠিত হয় তার সংজ্ঞা দাও।

(b) তড়িৎ-ঋণাত্মকতার পাউলিং-এর সংজ্ঞা দাও। আধুনিক দীর্ঘ পর্যায় সারণির তৃতীয় পর্যায়ে বামদিকে থেকে ডানদিকে মৌলগুলির তড়িৎ-ঋণাত্মকতার কীরূপ পরিবর্তন হয়?

(c) অতিপৃক্ত দ্রবণের সংজ্ঞা ও একটি উদাহরণ দাও। 3+3+2

14. (a) অ্যাসিড ও ক্ষারক সম্পর্কিত আরহেনিয়াসের ধারণাটি বিবৃত করো।

(b) স্ফুটনের সাহায্যে জলের অস্থায়ী খরতা দূর করা যায় কেন?

(c) বায়ুতে একটি নিভু নিভু পাঠকাঠি অক্সিজেনের জারে প্রবেশ করালে শিখাসহ দপ করে জ্বলে ওঠে কেন? 4+2+2

15. (a) তোমাকে নিম্নলিখিত রাসায়নিক পদার্থগুলি দেওয়া হল :

NH_4Cl, $NaCl$, $CaCl_2$, $NaNO_2$, শুষ্ক $Ca(OH)_2$, $CaCO_3$, H_2O, HCl, H_2SO_4 এবং $Pb(NO_3)_2$।

উপরোক্ত রাসায়নিক পদার্থগুলির মধ্য থেকে পরীক্ষাগারে নাইট্রোজেন ও অ্যামোনিয়া গ্যাস প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় প্রারম্ভিক রাসায়নিক পদার্থগুলি বেছে নাও এবং গ্যাসদুটি প্রস্তুতির সমিত সমীকরণ লেখো।

[একটি রাসায়নিক পদার্থ একাধিক বার ব্যবহার করতে পারো।]

(b) বক্সাইটের সংকেত কী? বক্সাইটকে অ্যালুমিনিয়ামের খনিজ ও আকরিক দুইই বলা যায় কিনা যুক্তি দিয়ে বলো।

(c) অম্লবৃষ্টি ইমারত ও স্থাপত্যের ক্ষতি করে। অম্লবৃষ্টির কারণ কী? 4+2+2

16. (a) অ্যামোনিয়ার অনুঘটক-জনিত জারণের দ্বারা নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুতির শর্ত ও সমীকরণগুলি লেখো।

(b) নীচের তালিকাটি টুকে নাও এবং তালিকাটি সম্পূর্ণ করো। প্রথম স্তম্ভে দেওয়া পেট্রোলিয়ামের আংশিক পাতনের তাপমাত্রার পাল্লা অনুযায়ী দ্বিতীয় অংশে পাতিতাংশের নাম ও তৃতীয় স্তম্ভে তার ব্যবহার লেখো :

(একটি সম্পূর্ণ করে দেওয়া হল)

স্তম্ভ 1	স্তম্ভ 2	স্তম্ভ 3
তাপমাত্রার পাল্লা (°C)	পাতিতাংশের নাম	একটি ব্যবহার
	পেট্রোলিয়াম ইথার	দ্রাবক হিসেবে
25^{o} — 60^{o}		
60^{o} — 200^{o}		
175^{o} — 277^{o}		

(c) অ্যামোনিয়া সালফেট ও রেক্টিফায়েড স্পিরিটের একটি করে ব্যবহার উল্লেখ করো। 3+3+2

17. (a) কার্যকরী গ্রুপ কাকে বলে ? মিথানল ও ইথানোয়িক অ্যাসিডে উপস্থিত কার্যকরী গ্রুপের সংকেত লেখো।

(b) উদাহরণসহ মনোমার ও পলিমারের সংজ্ঞা দাও ।

(c) মিথেনের সঙ্গে ক্লোরিনের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার শর্ত উল্লেখ করো। বিক্রিয়াটির প্রথম ধাপের সমিত সমীকরণ দাও। 3+3+2

জীবনবিজ্ঞান

সময় ঃ তিনঘন্টা

পূর্ণমান — ৯০

'ক' বিভাগ

[প্রতিটি প্রশ্ন আবশ্যিক]

1. সঠিক উত্তর নির্বাচন করে বাক্যটি সম্পূর্ণ করে লেখো (যে-কোনো পাঁচটি) **1x5= 5**

(i) পেশীকোশে অবাত শ্বসনের ফলে নীচের কোনটি উৎপন্ন হয় ?

(a) অ্যাসিটিক অ্যাসিড

(b) ল্যাকটিক অ্যাসিড

(c) ইথাইল অ্যালকোহল

(d) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড

(ii) মানব হৃদপিন্ডের কোন প্রকোষ্ঠে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত গৃহীত হয় ?

(a) দক্ষিণ অলিন্দ

(b) দক্ষিণ নিলয়

(c) বাম অলিন্দ

(d) বাম নিলয়

(iii) মানবদেহে ইউরিয়া উৎপন্ন হয়

(a) বৃক্কে

(b) ফুসফুসে

(c) পাকস্থলীতে

(d) যকৃতে

(iv) নিম্নলিখিত গ্রন্থির মধ্যে কোনটি মিশ্র প্রকৃতির ?

(a) থাইরয়েড

(b) পিটুইটারি

(c) অগ্ন্যাশয়

(d) অ্যাড্রিনাল

(v) মানুষের দেহকোশে ক্রোমোজোমের সংখ্যা হল

(a) 46 জোড়া

(b) 23 জোড়া

(c) 22 জোড়া

(d) 12 জোড়া

(vi) ক্যাকটাসের পাতা কাঁটায় রূপান্তরিত হওয়ার কারণ

(a) সালোকসংশ্লেষের হার বৃদ্ধির জন্য

(b) বাষ্পমোচনের হার বৃদ্ধির জন্য

(c) বাষ্পমোচন রোধের জন্য

(d) শ্বাসকার্যের হার বৃদ্ধির জন্য

(vii) পৃথিবীর জল স্থল ও অন্তরীক্ষে অবস্থিত জীবসমূহ নিয়ে গঠিত হয়েছে

(a) বায়োস্ফিয়ার

(b) লিথোস্ফিয়ার

(c) অ্যাটমোস্ফিয়ার

(d) হাইড্রোস্ফিয়ার

2. একটি বাক্যে উত্তর লেখো (**যে-কোনো দশটি**) **1x10= 10**

(i) সালোকসংশ্লেষের ফলে উৎপন্ন খাদ্য উদ্ভিদের সঞ্চয় অঙ্গে __________ রূপে জমা হয়।

(ii) অ্যামিবার গমন অঙ্গ হল __________ ।

(iii) পরস্পর অবস্থিত দুটি নিউরোনের সংযোগস্থলকে __________ বলে।

(iV) ম্যালিরিয়া রোগ সংক্রামিত হয় ' __________ ' মাধ্যমে।

(V) কোরকোঙ্গাম পদ্ধতিতে বংশবিস্তারকারী একটি প্রাণীর নাম __________ ।

(Vi) কোন ভিটামিনের অভাবে রাতকানা রোগ হয়?

(Vii) মানবদেহে রোগজীবানু ধ্বংসকারী রক্তকণিকার নাম কী?

(Viii) মানবদেহে রোগজীবানু ধ্বংসকারী রক্তকণিকার নাম কী?

(ix) ACTH এর পুরো নাম লেখো।

(x) কোশ বিভাজনের সময় বেমতন্তু ক্রোমোজোমের কোন অংশে যুক্ত হয়?

(xi) 'অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণ' — কার মতবাদ ?

(xii) মাছের গমনে পুচ্ছ পাখনার ভূমিকা কী?

(xiii) মাটিতে নাইট্রোজেন স্থিতিকারী একটি মিথোজীবী জীবাণুর নাম লেখো।

3. নিম্নলিখিত **যে-কোনো ছয়টি** প্রশ্নের উত্তর দাও। **2x6= 12**

(i) ফোটোলাইসিস কাকে বলে?

(ii) মৌলবিপাক হার কাকে বলে?

(iii) চলন ও গমনের দুটি পার্থক্য লেখো।

(iV) অন্তর্বাহী ও বহির্বাহী স্নায়ুর একটি করে বৈশিষ্ট্য লেখো।

(V) লোহিত কণিকা ও শ্বেত কণিকার একটি গঠনগত ও একটি কার্যগত পার্থক্য লেখো।

(Vi) জীবের প্রকট প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য কাকে বলে ?

(Vii) জীবাশ্ম কী ?

(Viii) বাস্তুতন্ত্রে বিয়োজকের ভূমিকা উল্লেখ করো।

4. যে-কোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। **3x10=30**

(i) সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসনকে বিপরীতমুখী প্রক্রিয়া বলে কেন ?

(ii) সকল খাদ্যই পরিপোষক কিন্তু সকল পরিপোষক খাদ্য নয় — কেন ?

(iii) রসের উৎস্রোত বলতে কী বোঝ ?

(iV) কেঁচোর গমন পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

(V) উদ্ভিদের প্রধান তিনটি রেচন পদ্ধতি উল্লেখ করো।

(Vi) অ্যাক্সন ও ডেনড্রনের দুটি গঠনগত ও একটি কার্যগত পার্থক্য লেখো।

(Vii) হরমোনের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো। স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে অন্তঃক্ষরা তন্ত্রের একটি পার্থক্য লেখো।

(Viii) মিয়োসিস কোষ বিভাজন কোথায় দেখা যায় ? একে হ্রাস বিভাজন বলে কেন ?

(ix) যৌন ও অযৌন জননের তিনটি পার্থক্য লেখো।

(x) লুপ্তপ্রায় অঙ্গ কাকে বলে ? অভিব্যক্তিতে এর ভূমিকা কী ?

(xi) অভিব্যক্তি ও অভিযোজনের সম্পর্ক উল্লেখ করো।

(xii) সংক্রমণরোধে টীকাকরণ ও অনাক্রম্যতার ভূমিকা কী ?

(xiii) একটি বাস্তুতন্ত্রে খাদ্য-শৃঙ্খল ও খাদ্যজালের সম্পর্ক উল্লেখ করো।

'খ' বিভাগ

[প্রশ্নসম্বর 5 থেকে 11 মধ্যে যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

5. সালোকসংশ্লেষে প্রয়োজনীয় কার্বনডাইঅক্সাইড ও জলের উৎস ও ভূমিকা উল্লেখ করো। 2½+2½=5

6. উৎসেচক কাকে বলে ? মানবদেহে খাদ্যপাচনে অংশগ্রহণকারী প্রধান তিনপ্রকার উৎসেচকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। 2+3=5

7. ট্রপিকচলন কাকে বলে ? উদ্ভিদের আলোকবৃত্তিয় ও অভিকর্ষবৃত্তিয় চলন উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো। 2+(1½+1½)=5

8. মানবদেহে ইস্ট্রোজেন ও টেস্টোস্টেরন হরমোনের উৎস এবং দুটি করে কাজ লেখো। 1+4=5

9. মেন্ডেল-কৃত দ্বিসংকর জনন পরীক্ষাটি চেকারবোর্ডের সাহায্যে উল্লেখ করো এবং ওই পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে F_2 জনুর ফিনোটাইপিক অনুপাত উল্লেখ করো। 4+1=5

10. প্রাকৃতিক নির্বাচনতত্ত্বের প্রবক্তা কে ছিলেন ? এই মতবাদের সাহায্যে নতুন প্রজাতির উদ্ভব কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায় ?

11. বায়ুমন্ডলে উপাদান হিসেবে সর্বাধিক থাকা সত্ত্বেও কোন মৌলটিকে উদ্ভিদ ও প্রাণী সরাসরি গ্রহণ করতে অক্ষম ? প্রকৃতিতে মৌলটির আবর্তন পথটি চিহ্নিত ছকের সাহায্যে দেখাও। 1+4=5

'গ' বিভাগ

[যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও]

12. মানব কর্ণের অন্তর্গঠনের ছবি এঁকে যে-কোনো ছটি অংশ চিহ্নিত করো। 5+3=8

13. পদ্মউদ্ভিদের ছবি এঁকে যে-কোনো চারটি অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করো। 4+4=8

'গ' বিভাগ

[কেবলমাত্র দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীদের জন্য]

12. মানব কর্ণের বিভিন্ন অংশের গঠন বর্ণনা করো এবং তার দুটি কাজ উল্লেখ করো। 6+2=8

13. অভিযোজন কাকে বলে ? পদ্মের কান্ড মূল ও পাতার অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। 2+6=8

ইতিহাস

সময় ঃ তিনঘন্টা পূর্ণমান — ৯০

১। প্রদত্ত ভারতবর্ষের রেখা মানচিত্রে চিহ্নিত (•) স্থানগুলি দেখো। প্রশ্নপত্রে প্রদত্ত ঐতিহাসিক স্থানগুলি প্রত্যেকটির ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সঠিক স্থান নির্ণয় করে চিহ্নিত স্থানের সঙ্গে মিলিয়ে বসাও **(যে-কোনো দশটি)** :

গোয়া, ত্রিচিনপল্লি, লোথাল, লক্ষ্ণৌ, নালন্দা, গোলকুন্ডা, লাহোর, সুরাট, বক্সার, যোধপুর, কালিকট, পুরুষপুর, চন্দননগর। ১০×১=১০

অথবা

১। দু-এক-কথায় উত্তর দাও —

'ক' বিভাগ (নবম শ্রেণির পাঠক্রম থেকে)

(যে-কোনো সাতটি) ৭×১=৭

(ক) মেহেড়গড় সভ্যতার ভৌগোলিক অবস্থান কোথায় ?

(খ) কে সর্বপ্রথম অশোকের শিলালিপির পাঠোদ্ধার করেছিলেন ?

(গ) কনিষ্কের রাজধানীর নাম লেখো।

(ঘ) কোন গুপ্ত সম্রাট হুন আক্রমণ প্রতিরোধে সমর্থ হন ?

(ঙ) শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা কে ?

(চ) মিয়া তানসেন কেন বিখ্যাত ?

(ছ) শ্রীরঙ্গপত্তনের যুদ্ধে ইংরেজরা কাকে পরাজিত করেন ?

(জ) বাংলায় চিরস্থায়ী ব্যবস্থা কবে প্রবর্তিত হয় ?

(ঝ) কোন গভর্নর-জেনারেল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেন ?

'খ' বিভাগ (দশম শ্রেণির পাঠক্রম থেকে)

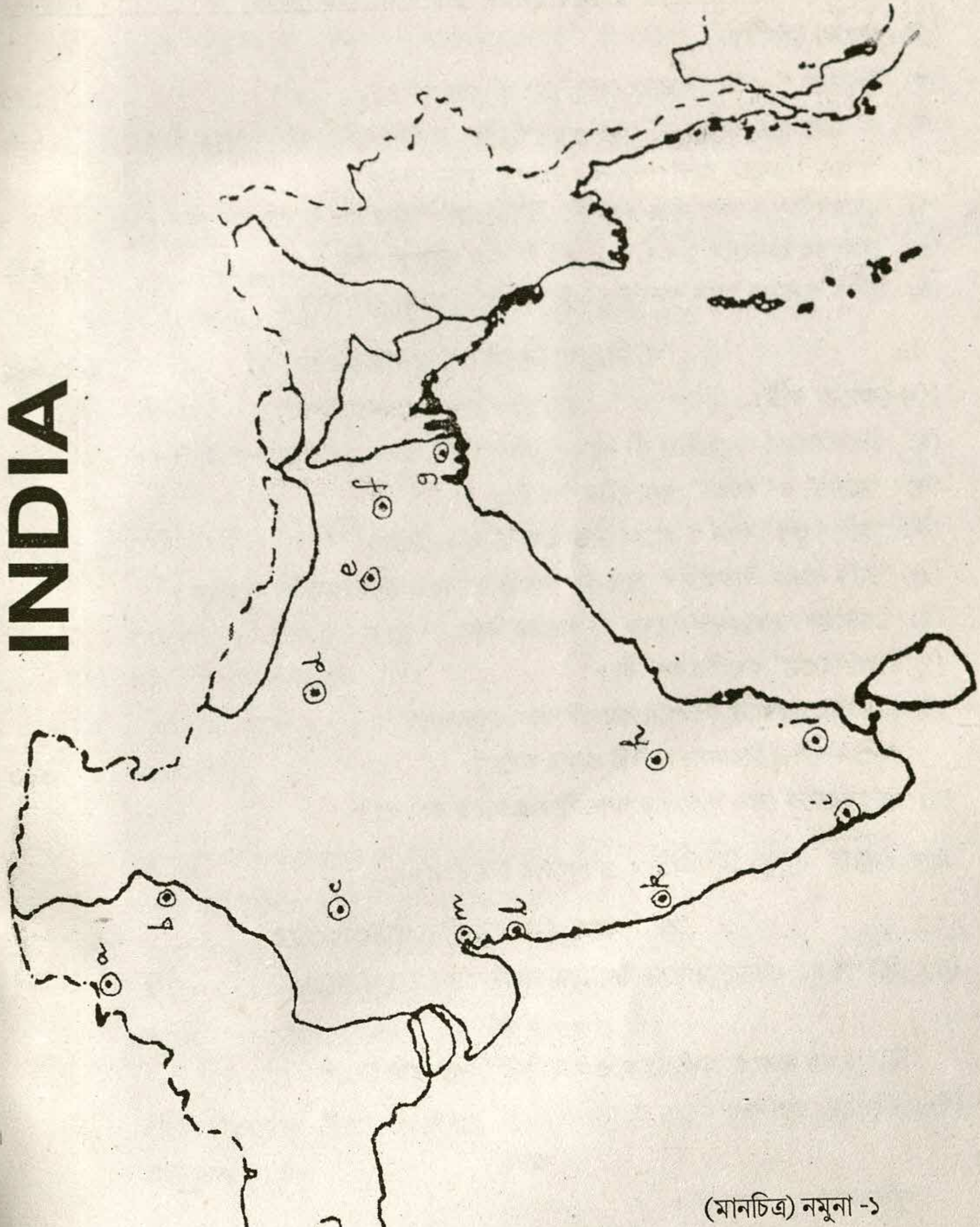
(যে-কোনো তিনটি) ৩×১=৩

(ঞ) প্রার্থনা সমাজ কে প্রতিষ্ঠা করেন ?

(ট) দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম অশ্বেতাঙ্গ প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন ?

(ঠ) ভারতের প্রধানমন্ত্রী কার দ্বারা নিযুক্ত হন ?

(ড) ভারতীয় পার্লামেন্টের নিম্মকক্ষের নাম কী ?



(মানচিত্র) নমুনা -১

২। দুই অথবা তিন বাক্যে উত্তর দাও —

'ক' বিভাগ (নবম শ্রেণির পাঠক্রম থেকে) ৪×২=৮

(যে-কোনো চারটি)

(ক) উপনিষদ কী ? উপনিষদকে কেন "বেদান্ত" বলা হয় ? ১+১

(খ) বৌদ্ধ সংগীতি বলতে কী বোঝ ? চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতির ঐতিহাসিক গুরুত্ব কী ? ১+১

(গ) বাংলার ইতিহাসে রাজা শশাঙ্কের স্থান গুরুত্বপূর্ণ কেন ? ২

(ঘ) মহম্মদ বিন তুঘলক তাঁর রাজধানী দৌলতাবাদে স্থানান্তরিত করেছিলেন কেন ? ২

(ঙ) ভারতের ইতিহাসে ১৭০৭ ও ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ গুরুত্বপূর্ণ কেন ? ১+১

(চ) ব্রিটিশ শাসনের প্রথম শতকে দুটি উপজাতি বিদ্রোহের নাম করো। ২

'খ' বিভাগ (দশম শ্রেণির পাঠক্রম থেকে) ৬×২=১২

(যে-কোনো ছটি) :

(ছ) ডিরোজিয়োর অনুগামীরা কী নামে পরিচিত ? ওই দলের প্রধান উদ্দেশ্য কী ছিল ? ১+১

(জ) "স্বদেশি" ও "বয়কট" কথা দুটির অর্থ কী ? ১+১

(ঝ) "অলিন্দ যুদ্ধ " কবে ও কাদের নেতৃত্বে সংঘটিত হয়েছিল ? ১+১

(ঞ) 'ডান্ডি যাত্রার' ঐতিহাসিক গুরুত্ব কী কবে ও কাদের নেতৃত্বে সংঘটিত হয়েছিল ? ২

(ট) গণতন্ত্রের সঙ্গে ফ্যাসিবাদের দুটি পার্থক্য বিবৃত করো। ২

(ঠ) "বর্ণ-বৈষম্য" কথাটির অর্থ কী ? ২

(ড) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে কতগুলি অঙ্গরাজ্য আছে ?
পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় কটি আসন আছে ? ১+১

(ঢ) ভারতবর্ষকে কেন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বলা হয় ? ২

৩। সাত-আটটি বাক্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও —

'ক' বিভাগ (নবম শ্রেণির পাঠক্রম থেকে) ৩×৪=১২

(ক) খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে মগধের উত্থানের চারটি কারণ উল্লেখ করো।

অথবা

খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনগুলি উল্লেখ করো।

(খ) ভক্তিবাদের মূল কথা কী ?

অথবা

সুফিবাদের মূল কথা কী ?

(গ) এনফিল্ড রাইফেল প্রবর্তনের ফলে ভারতীয় সিপাইরা ক্ষুব্ধ হয়েছিল কেন ?

অথবা

ব্রিটিশ শাসনের প্রথম শতকের কৃষক বিদ্রোহের কারণগুলি কী ছিল ?

'খ' বিভাগ (দশম শ্রেণির পাঠক্রম থেকে) ২×৪=৮

(ঘ) জাতীয় কংগ্রেসের আদিপর্বে 'মডারেট' বা নরমপন্থীদের অবদান কী ?

অথবা

জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থী এবং চরমপন্থীদের মধ্যে প্রধান নীতিগত এবং কর্মপন্থাগত পার্থক্য উল্লেখ করো।

(ঙ) জাতি সংঘের (লিগ অফ্ নেশনস) ব্যর্থতার কারণ নির্ণয় করো।

অথবা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে কী কী কারণে গণতন্ত্রের পতন ঘটে ?

৪। **'ক' বিভাগ (নবম শ্রেণির পাঠক্রম থেকে)** ৩×৬=১৮

(ক) হরপ্পা সভ্যতার দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। এই সভ্যতার ধ্বংসের দুটি কারণ আলোচনা করো।২+৪

অথবা

আর্য কারা ? প্রাচীন বৈদিক যুগে তাদের বাসভূমি কোথায় ছিল ? হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে বৈদিক সভ্যতার পার্থক্য উল্লেখ করো। ১+১+৪

(খ) সামন্তপ্রথা কাকে বলে ? প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে সামন্তপ্রথার তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। ৩+৩

অথবা

বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, এমন দুটি স্থানের নাম উল্লেখ করো। গান্ধার শিল্পের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য কী ? শিল্পের জগতে অজন্তা বিখ্যাত কেন ? ২+২+২

(গ) দস্তক কী ? ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং বাংলার নবাবদের মধ্যে বিরোধের প্রধান কারণ কী ছিল ? সময়ক্রম অনুসারে সাজিয়ে লেখো: বক্সারের যুদ্ধ ; পলাশির যুদ্ধ ; ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভ। তিনটি ঘটনার যোগাযোগ উল্লেখ করো। ১+২+১+২

অথবা

ইংরেজদের সঙ্গে সিরাজ-উদ্‌দৌলার বিবাদের তিনটি কারণ লেখো। পলাশির যুদ্ধের ফলাফল আলোচনা করো। ৩+৩

'খ' বিভাগ (দশম শ্রেণির পাঠক্রম থেকে) ২×৬=১২

(ঘ) বঙ্গাভঙ্গের পরিকল্পনায় লর্ড কার্জনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী ছিল ? ভারতবাসীরা কেন এই পরিকল্পনা মানতে পারেননি ? বঙ্গাভঙ্গ কোন্ বৎসরে রদ করা হয় ? ৩+২+১

অথবা

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বিপ্লবীদের মূল মন্ত্র কী ছিল ? ক্ষুদিরাম বসু এবং লালা হরদয়ালকে কেন মনে রাখা হয় ? ২+২+২

(ঙ) অ্যাটলান্টিক চার্টার কবে এবং কোথায় সই করা হয় ? এই চার্টারের দুটি নীতি উল্লেখ করো। অ্যাটলান্টিক চার্টারের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কী ? ২+২+২

অথবা

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হল ? জাতিপুঞ্জের প্রধান উদ্দেশ্য কী ? ৪+২

(কেবলমাত্র দশম শ্রেণির পাঠক্রম থেকে)

৫। যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ১×১০=১০

(ক) ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদ উন্মেষের দুটি কারণ সংক্ষেপে আলোচনা করো।

(খ) আইন অমান্য আন্দোলনের পটভূমি, কর্মসূচি ও গুরুত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

(গ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর ভিয়েতনামের এবং ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংক্ষেপে লেখো।

[বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের জন্য]

(দশম শ্রেণির পাঠ্যাংশ থেকে)

৬। যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ১×১০=১০

(ক) বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে ভারতে চরমপন্থী রাজনীতির উদ্ভবের কারণগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

(খ) ভারতের মুক্তিসংগ্রামে আজাদ-হিন্দ ফৌজের ভূমিকা সংক্ষেপে লেখো।

(গ) অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি বর্ণনা এবং ওই আন্দোলনের পরিণতি কী হয় আলোচনা করো।

ভূগোল

সময় ঃ তিনঘন্টা　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　পূর্ণমান — ৯০

'ক' বিভাগ

১। (ক) প্রশ্নপত্রের সঙ্গে প্রদত্ত ভারতের রেখা-মানচিত্রে নিম্নলিখিতগুলি উপযুক্ত প্রতীক ও নামসহ চিহ্নিত করে মানচিত্রটি উত্তরপত্রের সঙ্গে জুড়ে দাও : 　　　১×৫=৫

১.ক ১　বিন্ধ্য পর্বতমালা

১.ক ২　ব্রহ্মপুত্র

১.ক ৩　বছরে দুবার বৃষ্টিপাত হয় — এরূপ একটি অঞ্চল

১.ক ৪　একটি গুরুত্বপূর্ণ চা উৎপাদক অঞ্চল

১.ক ৫　চেন্নাই

(খ) প্রশ্নপত্রের সঙ্গে প্রদত্ত এশিয়ার রেখা-মানচিত্রে নিম্নলিখিতগুলি উপযুক্ত প্রতীক ও নামসহ চিহ্নিত করে মানচিত্রটি উত্তরপত্রের সঙ্গে জুড়ে দাও : 　　　১×৫=৫

১.খ ১　কাম্‌চাট্‌কা উপদ্বীপ

১.খ ২　ইউরাল পর্বত

১.খ ৩　তুন্দ্রা অঞ্চল

১.ক ৪　বেরিং প্রণালী

১.খ ৫　প্রশান্ত মহাসাগর

[দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীদের জন্য]

(যে- কোনো পাঁচটি) 　　　৫×২=১০

(ক) চারটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নাম লেখো।

(খ) সিন্ধু নদের যে-কোনো দুটি উপনদীর নাম করো।

(গ) দক্ষিণ ভারতের যে-কোনো দুটি গিরিপথের নাম করো।

(ঘ) ভারতের দুটি পশ্চিম বাহিনী নদীর নাম করো।

(ঙ) এশিয়ার যে-কোনো দুটি স্বাদু জলের হ্রদের নাম করো।

(চ) এশিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে অবস্থিত যে-কোনো দুটি দ্বীপের নাম করো।

(ছ) ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুসম্পন্ন এশিয়ার যে-কোনো দুটি দেশের নাম করো।

(জ) আর্মেনীয় গ্রন্থি থেকে পূর্বদিকে প্রসারিত দুটি পর্বতমালার নাম করো।

'খ' বিভাগ

২। (ক) **শুদ্ধ** উত্তরটি চিহ্নিত করো :

২.ক ১ সূর্য-কিরণ কর্কট ক্রান্তি রেখার ওপর লম্বভাবে পড়ে : ২২শে জুলাই / ২৩শে সেপ্টেম্বর/ ২১শে জুন।

২.ক ২ মূল মধ্যরেখার ওপর অবস্থিত কোনো স্থানের প্রতিপাদস্থান হবে : ১৮০°পূ: / ১৮০°প: / ১৮০° দ্রাঘিমা রোখায়।

২.ক ৩ চুনাপাথর/ বেলেপাথর/ কাদাপাথরের রূপান্তরিত রূপ হল কোয়ার্টজাইট।

২.ক ৪ আয়তন অনুসারে ভারতের সর্ববৃহৎ রাজ্য হল : মধ্যপ্রদেশ / রাজস্থান / মহারাষ্ট্র।

২.ক ৫ পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প গড়ে উঠেছে : তারাপুর / থানে / ট্রম্বেতে।

২। (খ) নিম্নলিখিত বাক্য **শুদ্ধ** হলে পাশে **'শু'** এবং **অশুদ্ধ** হলে পাশে **'অ'** লেখো : ১×৫=৫

২.খ ১ ২১শে মার্চ পৃথিবীব্যাপি বসন্তকাল।

২.খ ২ 'লু' একটি সাময়িক বায়ু।

২.খ ৩ কুরোশিও স্রোত একটি উষ্ণ সমুদ্রস্রোত ।

২.খ ৪ পর্বত-মধ্যবর্তী মালভূমির একটি উদাহরণ হল দাক্ষিণাত্য মালভূমি।

২.খ ৫ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ হ্রদগুলির মধ্যে কেবলমাত্র মিচিগান সম্পূর্ণভাবে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত।

৩। যে-কোনো **চারটির** ওপর **টীকা** লেখো: ৪×২$\frac{১}{২}$=১০

(ক) জোয়ার ভাটার কারণ

(খ) গ্রিন হাউস প্রভাব

(গ) বালিয়ারি

(ঘ) স্তূপ পর্বত

(ঙ) বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনা

(চ) এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু

(ছ) ভারতে জনবসতি বিস্ফোরণের কারণ

'গ' বিভাগ

(যে- কোনো দুটি) ২×১০=২০

৪। (ক) X এবং Y-এর স্থানীয় সময় যথাক্রমে শনিবার রাত্রি নটা ও রবিবার সকাল তিনটে। X-এর দ্রাঘিমা ৯০° প: । Y-এর দ্রাঘিমা নির্ণয় করো।

(খ) মেরু অঞ্চলে ছমাস দিন ও ছমাস রাত্রি থাকে কেন ?

(গ) ভূগোলের প্রকৃতি ও পরিধি কী ? ৫+৩+২=১০

৫। (ক) পিরামিড চূড়া ও জুলন্ত উপত্যকা কীভাবে সৃষ্টি হয়?
(খ) বায়ু কীভাবে ক্ষয়কার্য সমাধা করে?
(গ) যান্ত্রিক ও রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন কোন্ কোন্ জলবায়ু অঞ্চলে বিশেষভাবে লক্ষণীয়?
৫+৩+২=১০

৬। (ক) বায়ুর চাপের তারতম্যের কারণ উল্লেখ করো।
(খ) পশ্চিমা বায়ুকে কেন প্রবল পশ্চিমা বায়ু বলা হয়?
(গ) বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চল বলতে কী বোঝ? ৫+৩+২=১০

৭। (ক) বায়ুদূষণ বলতে কী বোঝায়?
(খ) তেজী বা ভরা কোটালকে কেন সর্বোচ্চ জোয়ার বলা হয়?
(গ) উপসাগরীয় স্রোত বলতে কী বোঝ? ৫+৩+২=১০

'ঘ' বিভাগ

(যে- কোনো **দুটি**) ২×১০=২০

৮। (ক) বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি ও নদনদীর বর্ণনা দাও।
(খ) ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিদ বলয়ের নাম লেখো।
(গ) মৃত্তিকা ক্ষয়ের কারণ কী? ৫+৩+২=১০

৯। (ক) ভূপ্রকৃতির দিক থেকে হিমাদ্রী হিমালয়ের গুরুত্ব উল্লেখ করো।
(খ) ব্রহ্মপুত্রের গতিপথে নদীটির বিভিন্ন নাম কী কী?
(গ) মেঘালয়ে অতিবৃষ্টির কারণ কী? ৫+৩+২=১০

১০। (ক) ভারতে জনবসতির বৈষম্যের কারণ কী?
(খ) ভারতের পশ্চিম উপকূলের পারধান বন্দরগুলির নাম লেখো।
(গ) হলদিয়া শিল্পাঞ্চলের প্রধান শিল্পগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে লেখো। ৫+৩+২=১০

১১। (ক) জামশেদপুরে লৌহ-ইস্পাত শিল্প গড়ে ওঠার কারণ কী?
(খ) জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে তিনটি অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ উল্লেখ করো।
(গ) ওড়িশায় লৌহ আকরিক উৎপাদনের প্রধান খনিগুলির নাম লেখো। ৫+৩+২=১০

'ঙ' বিভাগ

(যে- কোনো **একটি**) ১×১০=১০

১২। (ক) পামির পর্বত গ্রন্থি থেকে প্রসারিত পর্বতমালা ও পর্বত-মধ্যবর্তী মালভূমির বর্ণনা দাও।
(খ) এশিয়ার নিরক্ষীয় অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিদ সম্বন্ধে সংক্ষেপে লেখো। ৬+৪=১০

১৩। (ক) জাপানে শিল্পোন্নতির কারণ বর্ণনা করো।

(খ) সাংহাই ও ঘাওয়ারের গুরুত্ব উল্লেখ করো। ৬+৪=১০

'চ' বিভাগ

(যে- কোনো **একটি**) ১×১০=১০

১৪। (ক) পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল ও পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি বর্ণনা করো

(খ) পশ্চিমবঙ্গে জোয়ারের জলে পুষ্ট নদীগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে লেখো। ৬+৪=১০

১৫। (ক) নীলনদের গতিপথের বর্ণনা দাও।

(খ) শিকাগোকে পৃথিবীর কসাইখানা বলা হয় কেন? ৬+৪=১০

'ছ' বিভাগ

(বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের জন্য)

১৬। যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর লেখো: ৫×২=১০

(ক) প্লাবনভূমি বলতে কী বোঝ?

(খ) লাভা মালভূমি বলতে কী বোঝ?

(গ) লোয়েস কী?

(ঘ) অ্যানিমোমিটার কাকে বলে?

(ঙ) গঙ্গাকে কেন আদর্শ নদী বলা হয়?

(চ) রবি শস্য বলতে কী বোঝ?

(ছ) পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প তৈল শোধনাগারের কাছে গড়ে ওঠে কেন?

(জ) পশ্চাদ্‌ভূমি বলতে কী বোঝ?



বাংলা ভাষাকে নির্বাসিত করিয়া অন্য যে-কোনো ভাষাকেই আমরা গ্রহণ করি না কেন, তাহাতে আমাদের মনের স্বাতন্ত্র্যকে দুর্বল করা হইবে। সেই দুর্বলতাই যে আমাদের পক্ষে রাষ্ট্রীয় বললাভের প্রধান উপায় হইতে পারে, এ কথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয়। যেখানে আমাদের আত্মপ্রকাশ বাধাহীন সেখানেই আমাদের মুক্তি। বাঙালির চিত্তের আত্মপ্রকাশ একমাত্র বাংলা ভাষায়, এ কথা বলাই বাহুল্য। কোনো বাহ্যিক উদ্দেশ্যের খাতিরে সেই আত্মপ্রকাশের বাহনকে বর্জন করা, আর মাংস সিদ্ধ করার জন্য ঘরে আগুন দেওয়া, একই-জাতীয় মূঢ়তা। বাংলা সাহিত্যের ভিতর দিয়া বাঙালির মন যতই বড়ো হইবে, ভারতের অন্য জাতির সঙ্গে মিলন তাহার পক্ষে ততই সহজ হইবে। আপনাকে ভালো করিয়া প্রকাশ করিতে না পারার দ্বারাই মনের পঙ্গুতা, মনের অপরিণতি ঘটে ; যে অঙ্গ ভালো করিয়া চালনা করিতে পারি না সেই অঙ্গই অসাড় হইয়া পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Printed by : ***Dipti Prakashan,*** *94B, Dr. G. S. Bose Road, Kolkata - 700 039, Phone : 9830314911,9433368938*